কুরআনের আলোয় নারী

মুহাম্মদ জামালুদ্দীন

কুরআনের আলোয় নারী

কুরআনের আলোয় নারী

মুহাম্মদ জামালুদ্দীন

পালক পাবলিশার্স

www.pathagar.com

প্রকাশক
ফোরকান আহমদ, *বি এ অনার্স; এম এ*
স্বত্বাধিকারী, পালক পাবলিশার্স
১৭৯/৩, ফকিরেরপুল, ঢাকা ১০০০
ফোন ঃ ৭১৯২০১৮, মোবাইল ঃ ০১৭২০৩০৮৮৬১
ই-মেইল : palokpublishers2011@gmail.com
palokpublishers@yahoo.com

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪২২
অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৬

প্রচ্ছদ
উমার আবদুল্লাহ

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণ
মাটি আর মানুষ
১১০, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০

মূল্য ঃ তিনশত টাকা

QURANER ALOAY NAREE Written by Muhammad Jamaluddin Published by Forkan Ahmad. Proprietor, Palok Publishers, 179/3 Fakirerpool, Dhaka-1000, Bangladesh. Cover designed by Umar Abdullah First Published in February 2016. Price Tk. 300.00 US$ 20

ISBN 978 984 91373-8-2

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার মা
আমার স্ত্রী
এবং আমার কন্যাকে;
আমার মধ্যে 'বোধ'-এর উন্মেষ এবং বিকাশে
এঁদের প্রত্যেকের কাছে আমার ঋণ অপরিসীম।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে কোন কর্মনিষ্ঠ নর অথবা নারীর কর্ম বিফল করি না; তোমাদের এক অপরের (সমান)।' আলে ইমরানঃ ১৯৫

মুমিন এবং মুমিনা পরস্পরের আউলিয়া। (আত-তাওবাঃ ৭১)

তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ স্বরূপ।
(আল-বাকারাঃ ১৮৭)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উপক্রমণিকা

আলহামদুলিল্লাহ! সকল প্রশংসা আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার জন্য যিনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি দয়াময়, তিনিই করুণার আধার। তিনি মহাপরাক্রমশালী। তিনি সকল অপরাধ, ভুল-ত্রুটি মার্জনাকারী। আমি আন্তরিকভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহতা'য়ালা ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহতা'য়ালার বান্দাহ এবং প্রেরিত রাসূল। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহতা'য়ালার নির্দেশানুযায়ী মানুষের জন্য সঠিক এবং সুন্দরতম জীবন ব্যবস্থা কায়েম করে গিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র প্রতি শত কোটি দরূদ ও সালাম। অপরাপর সকল নবী-রাসূলের প্রতি এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র সকল সাহাবা এবং পুণ্যবান বান্দাহদের প্রতি সালাম।

একেবারে শৈশবেই শুদ্ধভাবে আরবী ভাষায় কুরআন পাঠের হাতেখড়ি হয়েছিল। কিন্তু পঠিত বাণীর মর্মার্থ কিছুই না বুঝে যান্ত্রিকভাবে অনিয়মিতভাবে নামাজ পড়া ব্যতীত ধর্মের অন্য কোন বিষয়ে কোন আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছিলনা। তারুণ্যের শুরুতে ধর্মকর্মে কিছুটা নিয়মিত হওয়ার চেষ্টার প্রাক্কালে সূরা ফাতিহাসহ কিছু কিছু সূরার অর্থ জেনে নিলাম। তখনই আগ্রহ সৃষ্টি হলো, কুরআনের অন্যান্য বাণীর অর্থ জানার। গত শতকের আশির দশকের শুরুতে প্রথমবারের মতো অর্থ বুঝে কুরআন পাঠ করার লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনকৃত অনুবাদটি সংগ্রহ করলাম। কিন্তু প্রতি পদে পদে হোঁচট খাচ্ছিলাম। বুঝতে পারলাম যে, তাফসীর অর্থাৎ কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যা এবং সমসাময়িককালের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ধারণা না থাকলে শুধু অনুবাদ পড়ে কুরআনের মর্ম অনুধাবন কখনোই সম্ভব হবে না। অতঃপর তাফসীর গ্রন্থ সংগ্রহ শুরু করলাম। প্রথম যে গ্রন্থটি সংগ্রহ করলাম, সেটি পড়ে মানসিক তৃপ্তি পাচ্ছিলাম না। বিভিন্ন অভিজ্ঞ বিদগ্ধজনের পরামর্শে পুনরায় দ্বিতীয় আর একটি তাফসীর গ্রন্থ সংগ্রহ করলাম। কিন্তু তাতেও আমার অতৃপ্তি দূর হচ্ছিল না। ফলশ্রুতিতে আশির দশকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আমার সংগ্রহে একাধিক ইংরেজিসহ বাংলায় অনূদিত সকল প্রধান তাফসীর গ্রন্থ, বুখারী ও

www.pathagar.com

মুসলিম শরীফের বঙ্গানুবাদের সকল খণ্ড এবং ইসলামের ইতিহাসের উপর একাধিক বইয়ের এক বিরাট ভাণ্ডার।

বিভিন্ন বিষয়ে অনেক অস্পষ্টতা ক্রমান্বয়ে দূর হয়ে গেলেও একটি বিষয়ে আমি যে ধাঁধার মধ্যে ছিলাম, সেই ধাঁধাতেই রয়ে গেলাম। আমার মায়ের দিকে কল্পনা অথবা বাস্তবে যখন তাকাই তখনই দেখি, সন্তানের কল্যাণের জন্য মায়ের আকুল প্রার্থনা, সন্তানের সুস্থতার জন্য মায়ের আকুতি, সন্তানের শুশ্রূষার জন্য মায়ের ক্লান্তিহীন রাত্রি জাগরণ আর পাশাপাশি পিতার নিরুদ্বেগ নিদ্রা, পিতার সুমতির জন্য, কল্যাণের জন্য মায়ের সকাতর প্রার্থনা। প্রার্থনারত মায়ের শূন্যে প্রসারিত হস্তযুগলে, মায়ের দৃষ্টিতে, মায়ের কথায়-কাজে, সদা-সর্বদাই পরিবারের প্রতিটি মানুষের কল্যাণ-কামনা ছাড়া আর কিছু দেখেছি বলে মনে পড়ে না। জায়নামাজে মা যখন কাতর কণ্ঠে আল্লাহকে ডাকতেন, তখন মনে হতো কেবল মা নয়, আমি নিজেও যেন আল্লাহর অস্তিত্ব অনুভব করছি।

পাশাপাশি আমার পিতাকে দেখেছি ধর্মকর্মে কখনো খুবই উদ্যমী, আবার কখনো একেবারে নিস্পৃহ, সংসারের ব্যাপারে উদাসীন, সন্তানদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত। মনে হতো সবার সকল দায়-দায়িত্ব বুঝি আমার মায়ের একার। দিনে দিনে বড় হয়ে বুঝলাম সব পিতারাই এমন এবং সব মায়েরাও আমার মায়ের মতনই। এমনকি আমার নিজের জীবনে আমাদের এই ষাটোর্ধ্ব বয়সে এসেও আমার স্ত্রীকে দেখে মনে হয়, তিনি যখন আল্লাহকে ডাকেন, তার সেই ডাকার মধ্যে অনেক বেশি আকুলতা, অনেক বেশি একাগ্রতা, অনেক বেশি আন্তরিকতা। পবিত্র কুরআনের যে কোন বাণী একবার হৃদয়ে ধারণ করার পর সেটি অক্ষরে অক্ষরে পালন এবং নিজের জীবনে বাস্তবায়নে তাঁর অধীর আগ্রহের পাশে আমার নিজেকে নিতান্তই তুচ্ছ অভাগা মনে হয়।

কিন্তু পবিত্র কুরআনের নারী বিষয়ক কিছু কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা, বিভিন্ন অনুবাদ-গ্রন্থে একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ এবং সংশ্লিষ্ট অনেকগুলো হাদীস পাঠ শেষে যে ধারণা লাভ করি তা আমাকে প্রায় দিশাহারা-বিভ্রান্ত করে তুললো। দেখলাম আমার অতীত জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে নারী সম্পর্কে যে পবিত্র বিশ্বাস আমার মধ্যে তৈরি হয়েছে, কুরআনের কোন কোন বাণীর ব্যাখ্যার সাথে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। একই সাথে ঈমানের অন্যতম প্রধান শর্ত হিসাবে আমি অন্তরে এ বিশ্বাস দৃঢ়তার সাথে লালন করি এবং করেই যাবো যে, পবিত্র কুরআনের প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাণী মহান আল্লাহতা'য়ালারই বাণী। এ

www.pathagar.com

বাণীসমূহ তিনি তাঁর রাসূল (সাঃ)এর প্রতি পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছেন। এর একটি শব্দও যদি আমার কাছে বোধগম্য না হয়ে থাকে, একটি বাক্যও যদি আমার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকে, তাহলে আমি ধরে নিই যে, সংশ্লিষ্ট বাণীটি হৃদয়াঙ্গম করার জন্য আমার জ্ঞান-বুদ্ধি এখনো যথেষ্ট পরিপক্বতা অর্জন করেনি।

অতঃপর ১৯৮৯ সালের প্রথম দিকে প্রধানতঃ নিজেকে কুরআনের জ্ঞানে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে নারী বিষয়ক নির্দিষ্ট কিছু আয়াত ও তাফসীর গ্রন্থে প্রদত্ত ব্যাখ্যা এবং এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীসগুলো লিখতে শুরু করলাম। এর পরে কুরআন মজীদের অন্যান্য আয়াতের সাথে নারী বিষয়ক আয়াতগুলো এবং প্রদত্ত ব্যাখ্যার তুলনামূলক পর্যালোচনায় মনোনিবেশ করলাম এবং একই সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীসগুলো সংগ্রহ করা শুরু করলাম।

বছর শেষে দেখা গেলো কুরআনের সংগৃহীত বাণী, হাদীস এবং আমার মতামত মিলিয়ে একটি বিশাল বইয়ের আকার ধারণ করেছে। তখন মনে হলো এগুলোকে সুবিন্যস্ত করা হলে সত্যিই একটা গবেষণাধর্মী বই হয়ে যেতে পারে এবং ১৯৯০ সালের মাঝামাঝি সময়ে বর্তমান বইটি সম্পূর্ণ হয়। এটির আকার-আয়তন তখন অবশ্য যথেষ্ট বড় ছিল। আমার এ লেখাটি নিয়ে কী করবো তা নিয়ে খুব দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলাম তখন, সাথে ছিল প্রবল উত্তেজনা।

আরবী ভাষায় ভালো দখল আছে অথচ চিন্তায় আধুনিক এবং জীবন-যাপনে অত্যন্ত ধার্মিক এমন দু'জন সুহৃদকে লেখাটি পড়তে দিলাম, কুরআনের উপর যাদের অগাধ দখল আছে। তারা উভয়ে লেখাটি দ্রুত ছাপাতে বললেন। ইসলামী পণ্ডিত হিসাবে দেশজোড়া সুখ্যাতি আছে, সৌভাগ্যক্রমে এমন দু'জন মনীষীর সান্নিধ্য লাভ করেছিলাম নব্বইয়ের দশকে। দু'জনই এখন মরহুম। তাঁদের দু'জনকেই লেখাটি পড়তে দিলাম। এঁদের একজন লেখাটি যতখানি পছন্দ করলেন, অপরজন ঠিক ততখানি অপছন্দ করলেন। আর তাতেই আমি হতোদ্যম হয়ে গেলাম।

একজন সাংবাদিক বন্ধুর পরামর্শে ১৯৯১ সালের কোন এক সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের তদানীন্তন ডেপুটি গভর্নর, শ্রদ্ধেয় জনাব শাহ আব্দুল হান্নানের নিকট আমার পাণ্ডুলিপিটি পৌঁছিয়ে দিলাম। প্রায় ছ'মাস পর তার সাথে যোগাযোগ করে জানলাম আমার পাণ্ডুলিপিটি তিনি খুব মনোযোগ সহকারে পড়েছেন এবং

www.pathagar.com

এটি দ্রুত বই আকারে প্রকাশের জন্য উৎসাহ দিলেন, তবে প্রচুর কাটাকাটি করে এটির কলেবর তিনি একেবারেই ছোট করে দিয়েছেন। অনেক স্থানে আমার তির্যক মন্তব্য, বাহুল্য মতামত, ইত্যাদি তিনি হয় বাদ দিয়েছেন অথবা কোমল করে দিয়েছেন। কুরআন অধ্যয়নে আমার আগ্রহ দেখে তিনি আমাকে উসূল-আল-ফিকহ্‌র উপর একাধিক বই পড়তে দিলেন এবং আরো বই সংগ্রহ করে পড়ার পরামর্শ দিলেন। এক পর্যায়ে তিনি আমাকে উসূল-আল-ফিকহার উপর ধারাবাহিক পাঠ দান করেছিলেন। এভাবে তিনি আমাকে কুরআনের বাণীর গভীরে প্রবেশের পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানদান করেছেন এবং উৎসাহ যুগিয়ে গেছেন আল্লাহর বাণী নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য। তার কাছে আমার অপরিসীম কৃতজ্ঞতা।

হান্নান ভাই আমার পাণ্ডুলিপি চূড়ান্ত করে দেয়ার পরও আমার মধ্যে একটা দ্বিধা এবং শঙ্কা কাজ করছিল। ফলে নানান বাহানায় লেখাটি প্রকাশে বিলম্ব করছিলাম। ইতোমধ্যে আমি কুরআনে নারী বিষয়ক আরো কিছু বাণী নিয়ে কাজ করতে থাকি। লেখাগুলো ক্রমান্বয়ে কম্পিউটারে কম্পোজ করে হার্ড ডিস্কে জমিয়ে রাখছিলাম।

'*মুসলিম নারীর পোষাক এবং কর্ম*' শিরোনামে একটি বই ১৯৯৮ সালে প্রথমবারের মতো প্রকাশ করি। তারপরেই দাপ্তরিক কাজে এত বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ি যে, দীর্ঘদিন অন্যকোন দিকে মনোনিবেশ করার সময় বা সুযোগ আমার হয়নি। তবে মাঝে মাঝে পুরোনো লেখাগুলো, বিশেষ করে বর্তমান লেখার পাণ্ডুলিপিটি প্রায়ই পড়তাম এবং আমার কেবলই মনে হতো, লেখাটি প্রকাশ করা উচিত। কিন্তু দ্বিধা-আলস্য-সংকোচই বরাবর জয়ী হয়েছে।

২০০৭ সালে চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর মনে হয়েছিল এবার বুঝি কুরআনে পূর্ণ মনোনিবেশের সময় হলো। কিন্তু অচিরেই পেশাগত কাজে জড়িয়ে পড়ায় ২০১২ সাল পর্যন্ত সময় হয়ে উঠলোনা। নতুন করে পবিত্র কুরআনের অন্যান্য কিছু বিষয়ে মনোনিবেশ করে ওগুলোর উপর নোট সংগ্রহ করে যাচ্ছিলাম।

সন্দেহ হচ্ছিল, ইতোমধ্যে আমার পুরোনো লেখাগুলো হয়তো সময়োপযোগিতা হারিয়েছে। এ ভাবনা থেকেই দু'জন সুহৃদকে বর্তমান লেখাটি আবার পড়তে দিলাম। স্নেহভাজন ইকবাল শাহরিয়ার লেখাটি পড়ে মন্তব্য করলো, লেখাটি যেন হুট করে শুরু হয়ে গিয়েছে; প্রথমে ভূমিকা বা এ ধরনের একটা কিছু

www.pathagar.com

সন্নিবেশ করলে এটি একটি সুন্দর বইয়ে পরিণত হবে। আরেকজন অত্যন্ত দ্বীনদার বয়োজ্যেষ্ঠ সুহৃদ বিআইডিএস-এর সাবেক গবেষক কৃষি-অর্থনীতিবিদ ড. মোঃ আবুল কাসেমকে মনে হচ্ছিল লেখাটি পড়া শেষ করে যেন একটু দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছেন। তার আজীবন লালিত ধারণার সাথে সবকিছু যেন মিলছে না। কিন্তু তিনি অর্থনীতির মৌলিক এবং পেশাদার গবেষক। তিনি আমাকে প্রতিনিয়ত চাপ দিতে লাগলেন লেখাটি প্রকাশের জন্য। এমন কি প্রকাশকের সাথে তিনিই আমার যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছেন। আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং শ্রদ্ধেয়জন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)এর সাবেক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নুরুল ইসলামের কথা বিস্মৃত হলে আমি অপরাধী হবো। আমার দেখা শুদ্ধতম মানুষ তিনি। সৌভাগ্যক্রমে ২০০৭ সাল থেকে আজ অবধি আমরা দুজন পেশাগত বা অন্যান্য বিষয়ে যা কিছু লিখেছি, তা অন্য কাউকে পড়তে দেয়ার আগে একের লেখা অন্যে পড়ে নিজেদের সংশোধন করে নিয়েছি। আমার বর্তমান পাণ্ডুলিপি পড়ে তিনি আমাকে এটি দ্রুত প্রকাশের জন্য তাগাদা দিতে থেকেছেন।

ইন্টারনেটের কল্যাণে সারা দুনিয়া এখন মানুষের হাতের মুঠোয় এসে গেছে। দুনিয়ার কোথায় কোন বিষয়ে কে কী কাজ করছেন, কী ভাবছেন, কী লিখছেন সবকিছু অনায়াসে জানা যায়। অনুসন্ধান করে বিস্মিত হলাম, আমি যে বিষয়টি নিয়ে ১৯৯০ সালে কাজ করা শুরু করেছিলাম, সেই একই বিষয়, কুরআনের একই আয়াত নিয়ে এ যাবৎ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গবেষক প্রচুর কাজ করেছেন। বিভিন্ন গবেষণাকর্মের মধ্যে সমসাময়িককালের প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ, ওয়াশিংটনভিত্তিক International Institute of Islamic Thought-এর চেয়ারম্যান, আবদুল হামিদ আবু সুলাইমানের 'MARITAL DISCORD: Recapturing Human Dignity Through the Higher Objectives of Islamic Law' শীর্ষক পুস্তিকাটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী এবং গভীর মননশীলতার ফল। বর্তমান লেখক এবং শায়খ আবু সুলাইমান স্বতন্ত্র উপসংহারে পৌঁছালেও উভয়ের মধ্যে ধারণাগত মতভিন্নতা প্রায় নেই বললেই চলে। পুস্তিকাটির উল্লেখযোগ্য অংশ বর্তমান পুস্তকের শেষে পরিশিষ্ট আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে যাদের কথা স্মরণ না করলে নয়, তাঁরা হচ্ছেন আমার স্ত্রী বদরুন্নেসা ফিরোজা এবং আমার কন্যা এষা রাহনুমা। দু'জনেই সমালোচনার তীর ছুঁড়তে একটুও কুণ্ঠিত হয় না। অবসরপ্রাপ্ত অনুজীব-বিজ্ঞানী

www.pathagar.com

স্ত্রীর মাথায় গবেষণার নতুন নতুন বিষয় নিত্য তৈরি হতে থাকে। তিনি আমার এ লেখার বিষয়বস্তুটি কেবল পছন্দ করেছেন। কিন্তু বিশ্লেষণের ধারাটি তার পছন্দ হয়নি। তার বক্তব্য, যাদের জন্য বইটি লেখা তাদের হাতে এত সময় নেই যে, চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এরকম একটি বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করবে। একেবারে শেষ মুহূর্তে আমার কন্যা অনুমানভিত্তিক কয়েকটি মন্তব্য পরিহারের পরামর্শ দিয়ে আমাকে ভারমুক্ত করেছে। আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান শিল্পগোষ্ঠী কেডিএস গ্রুপের চেয়ারম্যান অগ্রজপ্রতীম জনাব খলিলুর রহমানের প্রতি। তাঁর প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত থেকে দ্রুতগতির ইন্টারনেট ব্যবহারের অবারিত সুযোগ এবং সময় আমার সামনে বিশ্ব-জ্ঞানভাণ্ডারের দরজা খুলে দিয়েছিল।

আমার এ কর্মটিকে গবেষণা-কর্ম বা অনুসন্ধান-কর্ম যা-ই বলা হোক না কেন, আমি বরাবরই কুরআনকেই আমার বক্তব্যের মূল ভিত্তি হিসাবে গ্রহণের চেষ্টা করেছি। হাদীসের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব সহীহ আল-বুখারী এবং সহীহ মুসলিমের বাইরে যাইনি। এতদসত্ত্বেও এ কর্মটিকে ত্রুটিমুক্ত দাবি করার দুঃসাহস আমার নেই। বিনয়ের সাথে আমি স্বীকার করি উসূল-আল-ফিকাহ শাস্ত্রে আমার সীমাবদ্ধতা। এ কর্মে বিদ্যমান যথার্থ কোন ত্রুটি যে কেউ চিহ্নিত করে দিলে পরবর্তী সংস্করণে আমার ভ্রান্তি সংশোধনে দ্বিধান্বিত হবোনা।

পরিশেষে আমার এ ক্ষুদ্র কর্মটিকে পুস্তকাকারে প্রকাশে সম্মত হওয়ায় পালক পাবলিশার্সের স্বত্বাধিকারী জনাব ফোরকান আহমদ-এর প্রতি আমি সহৃদয় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার দরবারে বিনীত এবং কাতর প্রার্থনা, তিনি যেন আমার এ কর্মে যাবতীয় ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেন। আমার এ সামান্য কর্মটিকে তিনি যেন কবুল করেন এবং এটিকে আমার পরকালীন মুক্তির উপায় বানিয়ে দেন। আমীন!!

ঢাকা
জানুয়ারি, ২০১৬

মুহাম্মদ জামালুদ্দীন
mjamaluddin07@gmail.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

১. ভূমিকা ১৫

২. সমকালীন বিশ্বে নারী ২৩

৩. সূরা আন-নিসা: ৩৪ ৩৬
৩.১ বিভ্রান্তি এবং দুর্বোধ্যতা ৩৬
৩.২ আয়াতটির নিরিখে বর্তমান সমাজ ৪৩

৪. কুরআনের আলোকে আয়াতটির পর্যালোচনা ৪৪
৪.১. পুরুষ নারীর ভরণপোষণকারী ৪৪
৪.১.১. শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ-১ ৪৭
৪.১.২. শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ-২ ৫০
৪.১.৩. ভরণপোষণ ও অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পুরুষকে প্রদানের কারণ ৫২

৪.২. অদৃশ্যের হিফাজত: নারীর প্রধান দায়িত্ব ৬২
৪.২.১. সতী নারী বনাম সৎকর্মপরায়ণ নারী ৬৩
৪.২.২. নারীর আনুগত্য কি স্রষ্টার প্রতি না স্বামীর প্রতি? ৬৪
৪.২.৩. অদৃশ্যের হিফাজত ৭২
৪.২.৪. অদৃশ্যের হিফাজতের প্রকৃত তাৎপর্য ৭৫

৪.৩. নারীর নুশূজের আশংকা ও তা দূরীকরণ ৮০
৪.৩.১. প্রচলিত ব্যাখ্যার বিশ্লেষণ ৮১
৪.৩.২. ইসলামে দাম্পত্য জীবনের স্বরূপ ৮৫
৪.৩.৩. 'নুশূজ'-এর স্বরূপ বিশ্লেষণ ৮৯
৪.৩.৪. 'নুশূজ'এর আশংকা দূরীকরণে নির্দেশিত ব্যবস্থা ৯৪

৫. কুরআন এবং নবী (সাঃ)র পারিবারিক জীবন ১০৩
৫.১. নবী (সাঃ) কর্তৃক নিজের জন্য মধু হারাম করে নেয়া সম্পর্কিত ঘটনা ১০৪
৫.২. ইখতিয়ার সম্পর্কিত আয়াত নাযিলের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা ১০৬
৫.৩. সূরা আন-নূর-এ উদ্ধৃত মিথ্যা অপবাদের (ইফক) ঘটনা ১১১
৫.৪. রাসূলুল্লাহ(সাঃ)র জীবনে সংঘটিত তিনটি ঘটনার পর্যালোচনা ১২৫

www.pathagar.com

৬. 'নুশূজ'এর চূড়ান্ত পরিণতি ১৩৪

৭. হাদীসের আলোকে আয়াতটির পর্যালোচনা ১৩৯
৭.১. শানে-নুযূল হিসাবে বর্ণিত হাদীসের পর্যালোচনা ১৩৯
৭.২. একটি বহুল আলোচিত হাদীস ১৪৫
৭.৩. অভিভাবকত্বের ব্যাখ্যায় হাদীস ১৪৬
৭.৪. বিদায়-হজ্জের ভাষণের আলোকে নারী ১৪৮

৮. শেষ কথা ১৫১

পরিশিষ্ট ১৫৯

তথ্যসূত্র ১৭৩

www.pathagar.com

১

ভূমিকা

আল্লাহতা'য়ালার প্রতিটি সৃষ্টির স্বকীয় কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে, যাকে বলা যেতে পারে ঐ সৃষ্টির প্রকৃতি বা স্বভাব। কার্যত এ বৈশিষ্ট্যগুলোই একটি সৃষ্টিকে অন্য সৃষ্টি থেকে আলাদা করে। সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতির তারম্যের কারণেই দুটি আলাদা সৃষ্টি কখনো একই রকম আচরণ করে না। মানুষ আল্লাহর সৃষ্টিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মানুষের এই যে শ্রেষ্ঠত্ব, এটি মূলতঃ জন্মগতভাবে তার মধ্যে প্রোথিত স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতির কারণেই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহতা'য়ালা জানাচ্ছেন, মানুষকে তিনি তাঁর আপন প্রকৃতিতেই সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে সূরা রূম-এর ৩০ আয়াতে আল্লাহতা'য়ালা বলছেন ঃ

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّـهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّـهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে (আল্লাহর) দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি (ফিতরাত)। তুমি আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ করো, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর প্রকৃতির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল ধর্ম; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। আর-রূম: ৩০।

কুরআন মাজীদে আল্লাহতা'য়ালা যে দ্বীন, যে জীবনবিধানের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে তা আল্লাহর নিজের প্রকৃতিরই পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা। ঐ প্রকৃতি বা স্বভাবের উপর ভিত্তি করে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং এ প্রকৃতি বা জীবনবিধান অনুসারে জীবন গঠনের জন্য তিনি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন। যুগে যুগে আল্লাহ নবীদের মাধ্যমে আসমানী গ্রন্থ প্রেরণ করেছেন বস্তুতঃ আল্লাহর নিজের প্রকৃতি, তথা মানুষের নিজের স্বভাবের পরিচয় মানুষকে জানিয়ে দেয়ার জন্য। এখানে খুব সঙ্গতভাবে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, মানুষ স্বভাবগত বা প্রকৃতিগতভাবেই যে আচরণ করার কথা, তা করতে

www.pathagar.com

থাকবে; তার জন্য আবার নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আসমানী গ্রন্থ প্রেরণের প্রয়োজন হবে কেন। এখানেই অন্য সকল সৃষ্টির সাথে মানুষের বিশাল পার্থক্য।

মানুষ ব্যতীত সৃষ্টিজগতের সকল জীব-জন্তুর দিকে তাকালে আমরা তাদের প্রকৃতি বা স্বভাবের মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখতে পাই না। যে প্রাণীর যেভাবে জীবনযাপন করার কথা, কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই সে ঠিক সেভাবেই জীবনযাপন করে। কদাচিৎ এক-একটি প্রাণী তার আপন স্বভাবের পরিবর্তে ভিন্নতর আচরণ করে খবরের শিরোনাম সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে মানুষকে প্রতিনিয়ত দেখা যায়, যা তার করার কথা নয়, যা তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ, তা-ই সে করে চলেছে অবলীলাক্রমে। একজন চোর যখন চুরি করে, তখন সে অন্ধকার সময়টাকেই বেছে নেয় যেন তাকে কেউ না দেখে। আবার একজন ডাকাত সাফল্যের সাথে ডাকাতি করার জন্য মারণাস্ত্র নিয়ে কাজে নামে, যাতে কোন মানুষ ভয়ে তার কাছে ঘেঁষতে না পারে। অনুরূপভাবে একজন খুনির সার্বক্ষণিক প্রয়াস থাকে, সে যে খুনি এটা যেন কেউ না জানে। চুরি, ডাকাতি, খুন ইত্যাদি মানুষের প্রকৃতিগত বা স্বভাবজাত কাজ নয়, বরং প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ। আর তাই এসব যারা করে, তারা সবসময় সচেষ্ট থাকে তাদের কাজগুলো যেন কেউ দেখে না ফেলে। তারা প্রত্যেকেই জানে, তাদের এ কাজগুলোর সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা নেই। বরং একবার যদি লোকসমক্ষে চিহ্নিত হয়ে যায়, তাহলে তারা এটাও জানে যে, তাদেরকে অপরাধী হিসাবে বিচার এবং শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। তারপরেও মানুষ স্বভাববিরুদ্ধ, মানব প্রকৃতিবিরুদ্ধ বিভিন্ন কাজ প্রায়শঃই করে থাকে।

সূরা আর-রূমের উপরোল্লেখিত আয়াতটিতে আল্লাহতা'য়ালা জানাচ্ছেন, তাঁর নিজের যে ফিতরাত বা প্রকৃতি, ঐ একই প্রকৃতিতে তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর প্রকৃতিই সহজ-সরল দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। আল্লাহতা'য়ালা তাঁর নবীর মাধ্যমে সকল মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছেন, যে প্রকৃতির উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তারা যেন সেই প্রকৃতি–সেই দ্বীনেরই অনুসরণ করে। শয়তানের প্ররোচনায় মানুষ যেন কখনোই তার স্বভাববিরুদ্ধ, প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়ে নিজেকে আল্লাহর দ্বীন থেকে, সরল পথ থেকে বিচ্যুত না করে।

উপরোল্লেখিত আয়াতটির ব্যাখ্যায় আমরা স্বয়ং রাসূলুল্লাহর (সাঃ) নিকট থেকে সুন্দর একটি হাদীস পাই।

www.pathagar.com

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "প্রতিটি নবজাতক ফিতরাতে (স্বাভাবিক মানবপ্রকৃতি) জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী বানায়, খ্রিস্টান বানায় বা অগ্নিপূজক বানায়। চতুষ্পদ জন্তু পূর্ণাঙ্গ চতুষ্পদ বাচ্চা প্রসব করে থাকে। আপনারা কখনো সচরাচর তার নাক বা অন্যকোন অঙ্গ কর্তিত দেখেন কী? অতঃপর তিনি (আবু হুরায়রা) কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন, 'আল্লাহর ফিতরাত হচ্ছে তা-ই, যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই।' (আর-রূমঃ ৩০)" সহীহ মুসলিম[১], সহীহ আল-বুখারী[২]।

হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, প্রতিটি মানবশিশু ফিতরাত, তথা ইসলাম ধর্মের উপরই জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার বাবা-মা তাকে ইয়াহুদী, খ্রিস্টান অথবা অন্য যে কোন ধর্মাবলম্বীতে পরিণত করে। অতএব সে এমন সব কাজ করে থাকে যা তার নিজের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। একইভাবে তার পরিবেশ, বিরূপ সংস্কৃতি, ইত্যাদিও তাকে তার আপন স্বভাবের বিরুদ্ধে গিয়ে নানান কাজ করার প্ররোচনা দেয়। বস্তুতঃ এসবই ঘৃণ্য শয়তানের কাজ। মানুষকে তার আপন প্রকৃতি বা স্বভাবের বিরুদ্ধে গিয়ে নানান গর্হিত কাজে প্ররোচনা দানের জন্য শয়তান সদা-সর্বদা নিয়োজিত রয়েছে। শয়তানের কাজই হচ্ছে মানুষকে তার মানবিক গুণাবলীর কথা ভুলিয়ে দিয়ে তাকে প্রবৃত্তির দাসত্ব করার, ভোগ-বিলাসে গা ভাসিয়ে দেয়ার জন্য তার চারদিকে আকর্ষণ তৈরি করে রাখা। মানুষের মধ্যে পাশবিকতা উসকে দিয়ে তাকে রিপু-তাড়িত মানুষে পরিণত করা শয়তানের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

কুরআনের উল্লিখিত বাণী এবং হাদীসটি থেকে আমরা দ্বীন-ইসলামের অপূর্ব একটি সংজ্ঞা লাভ করি। তা হচ্ছে, "আল্লাহতা'য়ালা তাঁর নিজের প্রকৃতি দিয়েই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর নিজের প্রকৃতি হচ্ছে দ্বীন-ইসলাম। আর ইসলামকেই তিনি মানুষের প্রাকৃতিক ধর্ম হিসাবে মনোনীত করেছেন। অতঃপর মানুষকে তিনি তার প্রাকৃতিক ধর্ম তথা আল্লাহতা'য়ালার প্রকৃতি অনুসরণের তাগিদ দিয়েছেন।" আয়াতটি থেকে আমরা আরো একটি সত্য জানতে পারছি, তা হলো, "ইসলাম ধর্ম তথা দ্বীন-ইসলাম কিছু আচার-অনুষ্ঠানের নাম নয়। এটি আল্লাহর নিজের প্রকৃতিরই অপর নাম, যে প্রকৃতি বা স্বভাব দিয়ে তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। এই বিশেষ প্রকৃতি হচ্ছে মানব-সন্তানের সম্পূর্ণ জীবনাচার। যে জীবনাচার মানুষকে পূর্ণাঙ্গ এবং বিশুদ্ধ মানুষে পরিণত করে।"

www.pathagar.com

মুসলিম মা-বাবার ঘরে জন্মগ্রহণ করার সুবাদে মা-বাবার তত্ত্বাবধানে যে মানুষটি একজন প্রকৃত মুসলিম হিসাবে গড়ে উঠে, তারতো আল্লাহর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত এ কারণে যে, সে যে প্রকৃতিতে গড়ে উঠেছে, সেটি স্বয়ং আল্লাহরই প্রকৃতি। একজন মুসলিমের করণীয় হিসাবে সে যা করে, বর্জনীয় হিসাবে যা সে পরিহার করে, হালাল বলে যা সে গ্রহণ করে এবং হারাম বলে যা বর্জন করে, সেগুলি তার স্বভাব-প্রকৃতির মধ্যে আল্লাহ নিজেই অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন। একজন মুসলিম হিসাবে যে পরিবারব্যবস্থা, যে সমাজব্যবস্থা এবং যে জীবনবিধান তার জন্য নির্ধারিত, সেটি তার আপন স্রষ্টা স্বয়ং আল্লাহতা'য়ালা কর্তৃক রচিত। সুতরাং নারী-পুরুষ সবার জন্য এটিই সর্বোত্তম জীবনবিধান। এর চেয়ে উন্নততর বা ভালো ব্যবস্থা আর হতেই পারে না। মুসলিম হিসাবে জন্মগ্রহণ করে অথবা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ইসলামের বিধান অনুযায়ী জীবনযাপন করতে পারা নারী-পুরুষ সবার জন্যই আনন্দের এবং গর্বের বিষয় হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবে কি মুসলিম হওয়ার কারণে নারী-পুরুষ সকলেই নিজেদের জীবনকে সর্বাঙ্গসুন্দর, সবচেয়ে নিরাপদ এবং সবচেয়ে সম্মানজনক বিবেচনা করে থাকে?

এটা প্রায় নিশ্চিত বলা যায় যে, এ বিষয়ে অনুসন্ধান চালানো হলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাবে। একজন পুরুষ হয়তো তার প্রতিক্রিয়ায় জানাবে, "নামাজ পড়ি, রোযা রাখি, সামর্থে কুলালে হজ্জ্ব করি। এর বাইরে ইসলামের আর কী আছে? আল্লাহর বিধান অনুযায়ী আমারতো যথেষ্ট সওয়াব জমা হচ্ছে।" ইসলামে নির্দিষ্ট হালাল-হারাম, করণীয়-বর্জনীয়, পরিবারব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে তার স্বাভাবিক অজ্ঞতার কারণে তার নির্লিপ্ত প্রতিক্রিয়া এরকম হওয়াই যথার্থ। বিশেষ বিশেষ দিনে ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসাবে খুব ফলাও করে বলা হলেও নামাজ-রোজার বাইরে যে এ জীবনবিধানে আর কিছু করণীয় আছে তা সাধারণভাবে কেউই জানে না বললেই চলে।

পক্ষান্তরে একজন মুসলিম নারীর প্রতিক্রিয়া যদি এমন হয় তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই, "নামাজ পড়ি, রোযা রাখি, স্বামীর প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করি। তারপরও অত্যাচার-জুলুম-নির্যাতন-লাঞ্ছনা-গঞ্জনা-বঞ্চনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলাম না। মৃত্যুর আগে হয়তো এ অত্যাচার-জুলুম-নির্যাতন-লাঞ্ছনা-গঞ্জনা-বঞ্চনা থেকে মুক্তির কোন সম্ভাবনা নেই। দুনিয়াতেতো শান্তি পেলাম না পরকালে যদি কিছু পাওয়া যায়, সে আশায় আল্লাহকে

www.pathagar.com

ডাকি।" নারীর জন্য এটাই সত্য। প্রতিনিয়ত সে জুলুম-নির্যাতনের মধ্যে দিনাতিপাত করে এবং এটাকেই সে কখনো ধর্মের বিধান হিসাবে আবার কখনো তার নিয়তি হিসাবে মেনে নেয়। পুরুষ কর্তৃক নারীর উপর এ জুলুম-নির্যাতন এত বেশি ব্যাপক যে, কোথাও জুলুম-নির্যাতন হচ্ছে না শুনলে তখন সেটিকে ব্যতিক্রম বলে মনে হয়। এ নির্যাতন-লাঞ্ছনা-গঞ্জনা-বঞ্চনা সবসময় স্বামী বা তার পরিবারের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তা নয়; বরং নিজের পিতৃ-পরিবার এবং সমাজের পক্ষ থেকেও এ অভিশাপ সমানভাবেই নেমে আসে।

কোন পুরুষ বা নারী তার নিজের বাসনা অনুযায়ী পুরুষ-শিশু বা নারী-শিশু হিসাবে সৃষ্টি হয়ে মায়ের গর্ভে অবস্থান নেয় না। এমন কি পিতা-মাতাও তাদের বাসনা অনুযায়ী পুত্র বা কন্যাসন্তান লাভ করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে সূরা লুকমান ও সূরা আশ-শূরায় আল্লাহতা'য়ালা স্পষ্ট ভাষায় জানাচ্ছেন,

إِنَّ اللَّـهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّـهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

কখন কেয়ামত হবে তা কেবল আল্লাহই জানেন। তিনিই বৃষ্টিবর্ষণ করেন এবং তিনিই জানেন মাতৃগর্ভে যা আছে। কেউ জানে না আগামীকাল সে কী উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন দেশে সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সকল বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। লুকমান: ৩৪

لِّلَّـهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿٤٩﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহ তা'য়ালারই। তিনি যা ইচ্ছা, সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা-সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে

www.pathagar.com

ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশীল। আশ-শূরা: ৪৯-৫০

মাতৃগর্ভে পুত্র-সন্তান না কন্যা-সন্তান লালিত হচ্ছে, অথবা কোন মা আদৌ গর্ভধারণ করতে সক্ষম হবেন কিনা তা আল্লাহই নির্ধারণ করেন। তিনিই কাউকে কেবল পুত্র দেন, আবার কাউকে কন্যা দেন কেবল, আবার কাউকে পুত্র-কন্যা উভয়টিই দেন এবং কাউকে বন্ধ্যা করেন। অননভূত, অদৃশ্য এ ব্যবস্থাপনার ফলেই বিশ্বময় নারী-পুরুষের সংখ্যায় ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। পুত্র-সন্তানের আশায় ব্যাপক হারে কন্যা-শিশুর ভ্রূণ হত্যা করা হলে অথবা যুদ্ধ-বিগ্রহ, দাঙ্গা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদির কারণে অধিকহারে পুরুষের মৃত্যু ঘটলে আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থাটি বিঘ্নিত হয়। ফলে নারী-পুরুষের সংখ্যায় অস্বাভাবিক তারতম্য ঘটে। নারী-পুরুষ সংখ্যার ভারসাম্যহীন অবস্থাকে সাধারণভাবে বলা যায় কৃত্রিম এবং মানবসৃষ্ট। কোন দম্পতি কেবল পুত্রসন্তান লাভ করবে, নাকি কেবল কন্যাসন্তান লাভ করবে, নাকি পুত্র-কন্যা উভয়টিই লাভ করবে, নাকি সন্তানহীন থাকবে, তা নির্ধারণ এককভাবে আল্লাহতা'য়ালার এখতিয়ার। পুরুষ বা নারী হয়ে জন্ম নেয়ার ক্ষেত্রে পিতামাতা বা নির্দিষ্ট ব্যক্তির কোন বাসনা এক্ষেত্রে কোনভাবেই কার্যকর নয়। আল্লাহ তাঁর সূক্ষ্ম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নারী-পুরুষ সংখ্যার ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছেন।

আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় যে মানুষটিকে নারী হিসাবে পৃথিবীতে আনলেন, কেবল নারী হওয়ার কারণেই সে মানুষটি অত্যাচার, জুলুম, নির্যাতনের শিকার হবে কেন? আবার আপন পরিকল্পনা অনুযায়ী যে মানুষটিকে পুরুষ হিসাবে গড়ে তুললেন, সে পুরুষ হওয়ার সুবাদে কেন নারীর উপর জুলুম-নির্যাতন করবে? আজকালকার সমাজে জুলুম-নির্যাতনের ব্যাপকতা থেকে এমন ধারণাও হতে পারে যে, আল্লাহ হয়তো পুরুষের প্রকৃতির মধ্যে জুলুম করার একটি স্বাভাবিক প্রবণতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে আল্লাহতা'য়ালা জুলুম সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে কী বলেছেন তার ব্যাপক অনুসন্ধান আবশ্যক। দেখা যায়, কুরআন মাজীদে তিন শতাধিক আয়াতে জুলুম শব্দটি উদ্ধৃত হয়েছে এবং সবগুলোতেই জুলুমের বিরুদ্ধে বলা হয়েছে, জুলুমকে নিন্দা জানানো হয়েছে, জুলুমকারীকে শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে। নিচে কুরআন পাক থেকে তিনটি আয়াত উল্লেখ করছি।

إِنَّ اللَّـهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَـٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٤﴾

www.pathagar.com

আল্লাহ মানুষের উপর জুলুম করেন না, বরং মানুষ নিজেই নিজের উপর জুলুম করে। ইউনূস: ৪৪

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّـهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে আনা হবে। অতঃপর প্রত্যেককেই তার কর্মফল পুরোপুরি প্রদান করা হবে। আর তাদের উপর কোন প্রকান জুলুম করা হবে না। আল-বাকারা: ২৮১

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّـهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَـٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾

তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না এবং দেখে না তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছে? শক্তিতে তারা ছিল তাদের চাইতে প্রবল। তারা জমিন চাষ করত এবং ওদের চাইতে বেশি আবাদ করত। তাদের কাছে তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল। বস্তুতঃ আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুমকারী ছিলেন না। কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল। আর-রূম: ৯

আয়াত তিনটি পরিষ্কারভাবে আমাদের জানাচ্ছে যে, আল্লাহ কখনো মানুষের উপর জুলুম করেন না। শেষ বিচারের দিন, কাল-কিয়ামতের দিন প্রত্যেক মানুষ যেমন কর্ম নিয়ে উপস্থিত হবে, তেমন কর্মফলই সে লাভ করবে। কারো প্রতি অবিচারের মাধ্যমে কোন প্রকার জুলুম করা হবে না। জুলুম আল্লাহর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তিনি তাঁর নিজের প্রকৃতি দিয়ে যে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, ঐ মানুষের প্রকৃতির মধ্যে জুলুম করার প্রবণতা সৃষ্টি করে দেবেন এটা হতেই পারে না। বরং শয়তানের প্ররোচনায় স্বভাববিরুদ্ধ কাজের প্রতি তার অপার আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে সে জুলুম, নির্যাতন, অত্যাচার ইত্যাদি ঘৃণ্য নিন্দিত কাজের মধ্যে পাশবিক আনন্দ লাভ করছে। যেমন কর্ম তেমন ফল হিসাবেই

www.pathagar.com

মানুষ তার অন্যায়-জুলুম-নির্যাতনের প্রতিফল কিভাবে লাভ করবে তারই বর্ণনা রয়েছে উল্লিখিত শেষোক্ত আয়াত দুটিতে।

সমসাময়িককালের মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত যে পরিবারব্যবস্থা বা সমাজব্যবস্থা, সেখানে কী আমরা উপরোল্লেখিত আল্লাহ রচিত জীবনবিধান, পরিবারব্যবস্থা বা সমাজব্যবস্থার কোন প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই? আল্লাহর নিজের প্রকৃতি দিয়ে যে জীবনবিধান রচনা করে দিয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে সমসাময়িককালের মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে সেটির লেশমাত্র নেই; বরং ইসলামের নামে আছে কিছু আচার-অনুষ্ঠান। আচার-অনুষ্ঠানগুলোকেই জীবনবিধান হিসাবে ভ্রম করার ফলে কার্যত প্রতিটি গৃহ এক-একটি কুরুক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। জুলুম-অত্যাচার-অন্যায়ের সূতিকাগারে পরিণত হয়েছে প্রায় প্রতিটি পরিবার এবং ক্রমান্বয়ে তা পরিবার থেকে সমাজ এবং রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়ছে। পরিবার পর্যায়ে এ জুলুমের প্রথম শিকারে পরিণত হয়ে থাকে সাধারণতঃ নারীরাই।

www.pathagar.com

২

সমকালীন বিশ্বে নারী

'ইসলামে নারীর মর্যাদা' বিষয়ে তথ্য-ভাণ্ডার বিপুলভাবে সমৃদ্ধ। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের পণ্ডিতদের লেখা পর্যালোচনা করলে লক্ষ্য করা যায়, অন্যান্য যে কোন ধর্মের তুলনায় ইসলাম ধর্ম নারীকে সত্যিকার মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। পক্ষান্তরে প্রাচীন ভারত থেকে শুরু করে আজকের আধুনিক ভারতে, প্রাচীন রোম থেকে শুরু করে মধ্য-যুগের ইউরোপ তথা পাশ্চাত্য জুড়ে নারীর কোন মানবিক মর্যাদা ছিল না বললেই চলে। পাশাপাশি এখন থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে ইসলামের আবির্ভাবের পর নারী কী অভাবনীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হলো, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণেরও নজির রয়েছে ভূরি-ভূরি। এসবের পাশাপাশি ইসলামে নারীর মর্যাদা বিষয়ে পবিত্র কুরআনের স্থানে স্থানে দৃপ্ত ঘোষণাতো রয়েছেই।

কিন্তু বই-কিতাবে প্রাপ্ত তথ্যের সাথে বর্তমান বাস্তব চিত্রের তুলনা করতে গেলেই যে গোলমাল লেগে যায়। পত্রিকার পাতা ওল্টালে দেখা যায়, বছরের প্রায় প্রতিটি দিনই নির্যাতিত নারীর সকরুণ কাহিনী ছাপানো হচ্ছে। নারী নির্যাতনের খবর ছাপানো হয়নি এমন একটি দিনও পাওয়া যাবে না। যৌতুকের জন্য নারী নির্যাতন, স্বামীর একাধিক বিয়েতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কারণে নারী নির্যাতন, পরকীয়া প্রেমের কারণে নারী নির্যাতন, পারিবারিক কলহের কারণে নারী নির্যাতন, তরকারিতে লবণ কম-বেশি অথবা ভাত নরম-শক্ত হওয়ার মতো তুচ্ছ কারণে নারী নির্যাতন, অথবা সংসারের অভাব-অনটনের কথা তুলে ধরার কারণে নারী নির্যাতন আমাদের সংবাদপত্রের নিত্য-দিনের খবর। অবস্থাদৃষ্টে এমন ভ্রান্ত ধারণা তৈরি হওয়া মোটেও অস্বাভাবিক নয় যে, পারিবারিক-সামাজিক-রাষ্ট্রিক পর্যায়ে কোথাও নারীর কোন মর্যাদা ইসলাম দেয়নি।

বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ বিধায় নারীর এ গ্লানিকর অবস্থানের সাথে ইসলামের একটি সংশ্লেষ আবিষ্কারের চেষ্টা অনেকে করে থাকেন। হতে পারে

www.pathagar.com

কোন.কোন দেশের চাইতে বাংলাদেশে নারীর পারিবারিক-সামাজিক মর্যাদা নিম্নতর অবস্থানে। বিপরীত দিকে এমন অনেক দেশ আছে, যেখানে নারীর মর্যাদা বাংলাদেশের চাইতেও নিম্নতর পর্যায়ে। কার্যত নারীর পারিবারিক-সামাজিক মর্যাদার এ সংকট একটি বৈশ্বিক সংকট। এটি কোন দেশের একক সমস্যা নয়। অন্য কোন ধর্মের বিশেষ কোন বিধি-বিধানের কারণে আজকের বিশ্বের নারীর মর্যাদাহানি ঘটলেও ঘটতে পারে। তবে এটা অত্যন্ত জোর দিয়েই বলা যায় যে, ইসলামের কোন বিধি-বিধানের কারণে কোনভাবেই নারীর কোন মর্যাদাহানি ঘটছেনা।

Unied Nations Developmen Fund for Women (UNIFEM) কর্তৃক ২০১০ সালে প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে, দেশভেদে ৯ থেকে ৭০ শতাংশ নারী তাদের জীবনকালে স্বামী অথবা নিকটতম সঙ্গী অথবা পরিচিত কোন পুরুষ কর্তৃক শারীরিক বা যৌন-নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকেন। ১৫ থেকে ৪৪ বছর বয়সী নারীদের বিভিন্ন দুরারোগ্য রোগ-ব্যাধি ও দুর্ঘটনা মিলিয়ে মোট যত মৃত্যু হয়, তার চাইতে বেশি মৃত্যু হয় নারীর প্রতি সহিংসতাহেতু। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইসরাইল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খুন হওয়া নারীদের ৪০ থেকে ৭০ শতাংশ নারী খুন হয়ে থাকেন তাদের নিকটতম সঙ্গীর হাতে। ভারতে ২০০৭ সালে প্রতিদিন ২২ জন নারী খুন হয়েছেন যৌতুক বিষয়ক কারণে।[৩]

গর্ভাবস্থায়ও দেশভেদে প্রায় ২৫ শতাংশ নারী নিকটতম সঙ্গী কর্তৃক শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকেন। গর্ভবতী নির্যাতিতা নারীদের প্রায় ৫৩ শতাংশ পেটে লাথির শিকার হওয়ার কারণে গর্ভপাত কিংবা মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে থাকেন। নারীর প্রতি যত যৌন হামলা হয়ে থাকে, তার প্রায় ৫০ শতাংশ হামলার শিকার হয় ১৬ বছরের কম বয়সের কিশোরীরা। ৩০ থেকে ৪৫ শতাংশ নারীর প্রথম যৌন-মিলনের অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে জবরদস্তিমূলক বা ধর্ষণের মাধ্যমে।[৪]

প্রসঙ্গতঃ বিবিসি-র স্বনামধন্য রেডিও এবং টিভি ব্যক্তিত্ব জিমি স্যাবিল-এর কথা স্মরণ করা যেতে পারে। ছয় দশকের কর্ম জীবনে বিপুল জনপ্রিয় রেডিও-টিভি উপস্থাপক এবং দাতব্য কাজের জন্য তহবিল সংগ্রাহক হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। দাতব্য কাজের তহবিল সংগ্রহে অবদানের জন্য তাঁকে নাইটহুড (স্যার উপাধি) প্রদান করা হয়। অক্টোবর ২০১১ সালে ৮৪ বছর বয়সে মৃত্যুর ঠিক এক বছরের মাথায় তাঁর বিরুদ্ধে ৪৫০টি যৌন

www.pathagar.com

নির্যাতন-নিপীড়ন ও ধর্ষণের অভিযোগ নথিবদ্ধ হয়। নির্যাতিতদের বয়সের ব্যাপ্তি ছিল ৮ থেকে ৪৭ বছর; এদের মধ্যে ২৮ জনের বয়স ১০ বছরের নিচে; তার মধ্যে আবার ১০ জন ছিল ৮ বছরের বালক। নির্যাতিত ৬৩ জন ছিল ১৩ থেকে ১৬ বছরের কিশোরী। নির্যাতিতদের তিন-চতুর্থাংশের বয়স ছিল ১৮ বছরের নিচে।[৫] পৃথিবীর আর কোথাও কখনো এমন জঘন্য নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে বা ঘটে থাকলেও প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা যায় না। ঘটনাটি পাশ্চাত্যে নারীর এক অসহায় চিত্র তুলে ধরে। লক্ষণীয়, স্যাবিল-এর জীবদ্দশায় লোকলজ্জার ভয়ে কোন নারী মুখ খোলেননি। স্যাবিল-এর এ ঘটনা এমন একটি ধারণা দেয় যে, শুধু পাশ্চাত্যের সর্বোচ্চ স্বাধীনতা ভোগকারী নারীদের প্রত্যেকেই কখনো না কখনো এক বা একাধিকবার যৌন নিপীড়নের শিকার হয়ে থাকেন তা নয়; বরং এটি বিশ্বের সকল দেশেই নারীর অসহায়ত্বের এক করুণ চিত্র তুলে ধরে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ নারী তাদের কর্মক্ষেত্রে অশ্লীল আচরণ অথবা যৌন নিপীড়নের শিকার হয়ে থাকেন। জাপান, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও ফিলিপাইনে পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে, এশিয়ায় ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ নারী কর্মক্ষেত্রে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। আমেরিকায় ১২ থেকে ১৬ বছর বয়সী স্কুলগামী বালিকাদের ৮৩ শতাংশ কোন না কোন ধরনের যৌন নির্যাতনের মুখোমুখি হতে হয়।[৬]

বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে নারী নির্যাতনের যে সব ঘটনা ঘটে, বাংলাদেশের ঘটনাগুলোর চারিত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার চাইতে ভিন্নতর। বাংলাদেশের দিকে তাকালে যে দৃশ্য দেখা যায়, তা আরো করুণ। এখানে দু'তিন বছরের শিশুও যৌন-নির্যাতন বা ধর্ষণের শিকার হয়; ধর্ষিতা নারীকে অনেকক্ষেত্রেই খুন করা হয়। যৌতুকের জন্য নারী-নির্যাতন এবং খুন পাক-ভারত-বাংলাদেশ অঞ্চলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। 'অধিকার' নামের একটি বেসরকারি মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান প্রাসঙ্গিক বিষয়ে জরিপ চালিয়ে থাকে। তাদের জরিপে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ২০১২ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশে ২৯৯ জন নারী এবং ৪৭৩ জন শিশু (সতের বছরের নিচে যাদের বয়স) ধর্ষণের শিকার হয়েছে। একই সময়ে ৮২২ জন নারী যৌতুকের দাবি পূরণ করতে না পারায় সহিংসতার শিকার হয়েছে; এদের মধ্যে ২৭৩ জনকে হত্যা করা হয়েছে; ১৪ জন নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে এবং ৫৩৫ জন শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে। জরিপ থেকে আরো জানা যায়, উল্লিখিত সময়ে

www.pathagar.com

৭৮ জন নারী এসিড সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে, যার মধ্যে ২০ জন কিশোরী; এসিড নিক্ষেপের মাধ্যমে তাদের শরীর ঝলসে দেয়া হয়েছে। একই সময়ে ৪৭৯ নারীকে নোংরাভাবে উত্যক্ত বা নির্যাতন করা হয়েছিল, যাদের মধ্যে ১৮ জন পরবর্তীতে আত্মহত্যা করে; তিনজনকে হত্যা করা হয়েছিল, ২৪ জনকে আহত করা হয়েছিল, ১৫ জনকে শারীরিকভাবে প্রহার করা হয়েছিল, নয়জনকে অপহরণ করা হয়েছিল, ৬৯ জনকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছিল এবং ৩৫০ জন বিভিন্নভাবে যৌন-হয়রানির শিকার হয়েছিলেন।[৭]

বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (Bangladesh Buruea of Statistics, BBS) জাতিসংঘের অধীনস্থ জাতিসংঘ পপুলেশন ফান্ড-এর (UNFPA) সহযোগিতায় Violence Against: Women Survey ২০১১ শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতিতে এ প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে নারীর উপর সহিংসতার বিভিন্ন দিকের উপর জরিপ চালানো হয়। ডিসেম্বর ২০১৩-তে এ প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতার এক হৃদয়বিদারক করুণ চিত্র প্রকাশ পায়।

প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বাংলাদেশের শতকরা ৮৭ জন, অর্থাৎ প্রতি ১০ জনের মধ্যে প্রায় নয়জন নারী স্বামীর সহিংসতার শিকার হয়ে থাকেন। মানসিক, শারীরিক, আর্থিকসহ সকল প্রকার নির্যাতনই এ সহিংসতার অন্তর্ভুক্ত। শতকরা ৭৭ জন, অর্থাৎ প্রতি ১০ জনের মধ্যে প্রায় ৮ জন নারী জানিয়েছেন, তারা বিগত এক বছরের মধ্যে সহিংসতার শিকার হয়েছেন। যে সমস্ত নারীর একাধিকবার বিয়ে হয়েছে, তাদের শতকরা ৬৬ জন বর্তমান স্বামীর সহিংসতার শিকার হয়েছেন; অপরদিকে প্রায় সকল নারীই (৯৮%) বর্তমান অথবা পূর্ব স্বামীর সহিংসতার শিকার হয়েছেন। শতকরা ৬৫ জন নারী কখনো না কখনো স্বামীর শারীরিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন এবং ৫০ শতাংশ নারী বিগত এক বছরের মধ্যে শারীরিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন।

নারীর প্রতি যৌন সহিংসতার চিত্রটি ভয়াবহ এবং মর্মান্তিক। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী সাধারণভাবে বাংলাদেশের ৪.৪ শতাংশ নারী বলপূর্বক ধর্ষণের শিকার হয়ে থাকে। ধর্ষিতা নারীদের প্রায় ৪২ শতাংশ ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সে, ৩৪ শতাংশ ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সে, ১০ শতাংশ ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সে এবং ৫ শতাংশ ২৫ থেকে ২৯ বছর বয়সে বলপূর্বক ধর্ষণের শিকার হয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে, ধর্ষিতা নারীদের ২ শতাংশ ৫ থেকে ৯ বছর বয়সে অর্থাৎ

www.pathagar.com

শৈশবে ধর্ষণের শিকার হয়েছিল। শহর এলাকার ধর্ষিতা. নারীদের প্রায় ৫০ শতাংশ এবং সারাদেশের প্রায় ৪০ শতাংশ নারী জানিয়েছেন যে, তাদের বয়স ১৪ হওয়ার আগেই তারা বলপূর্বক ধর্ষণের শিকার হয়েছেন।(৮)

জাতিসংঘ পরিচালিত অন্য এক সমীক্ষা থেকে জানা যায়, চিহ্নিত ধর্ষকদের ৬৭ শতাংশ জানিয়েছে তারা মজা করার জন্য ধর্ষণ করেছে; ৮২ শতাংশ জানিয়েছে, পুরুষ হিসাবে তাদের যৌন চাহিদা নিবৃত্তির জন্য তারা ধর্ষণ করেছে। বিস্ময়কর হলো, ৩৪ শতাংশ পুরুষ জানিয়েছে, কৃতকর্মের জন্য তাদের মধ্যে কোন অপরাধবোধ নেই।(৯)

নারীর প্রতি সহিংসতা সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করে দেখা যায়, পাশ্চাত্যে প্রধানতঃ যৌন-নির্যাতনের মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতার রূপটি প্রকাশ পায়। কিন্তু বাংলাদেশ বা এতদঞ্চলের দেশসমূহে যৌন-নির্যাতনের পাশাপাশি, প্রহার, এসিড নিক্ষেপ, আত্মহত্যায় প্ররোচনা, ইত্যাদির মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রকাশ পায়। লক্ষণীয়, নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ক আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কখনো প্রাধান্য পায় না; সেটি হচ্ছে পূর্ণ স্মরণশক্তি তৈরি হওয়ার আগেই প্রায়-দুগ্ধপোষ্য শিশুর উপর যৌন-নির্যাতন। এ নির্যাতন শুরু হয় শিশুর নিজ-গৃহে। প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত একান্নবর্তী পরিবারে ঘটনাগুলো প্রতিনিয়ত ঘটতে থাকে। এধরনের পরিবারগুলোতে অনেক মানুষ একসাথে বসবাস করে, একই সাথে নিকটাত্মীয়-দূরাত্মীয়সহ প্রচুর বহিরাগত নিয়মিত যাতায়াত করতে থাকে; অনেক বহিরাগত প্রায়শঃই রাত্রি-যাপনও করে থাকে। পরিবারগুলোর প্রায়-দুগ্ধপোষ্য শিশুদের যৌনতা সম্পর্কিত কোন ধারণা অর্জন এবং উল্লেখযোগ্য স্মরণশক্তি তৈরি হওয়ার আগেই তিন-চার বছর বয়স থেকে আদর-ভালবাসার নামে আত্মীয় এবং বহিরাগতদের হাতে যৌন নিপীড়ন শুরু হয়ে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মা-বাবারা সরল-বিশ্বাসে বহিরাগত আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে শিশু-সন্তানদের ছেড়ে দেন, বা স্থানাভাবে একসাথে রাত্রিযাপন করতে দেন। মা-বাবারা প্রায়শঃই এধরণের ঘটনার কথা কল্পনাও করেন না। ফলে, তাদের অলক্ষ্যে তাদের সন্তানরা নিয়মিত উৎপীড়নের শিকার হতে থাকে। এ প্রসঙ্গে বিবিসি নিউজে প্রকাশিত ভারতের দিল্লির এক নারীর হৃদয়-বিদারক প্রবন্ধটি দেখা যেতে পারে।(১০)

বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল দেশের জন্য যে বিষয়টি প্রযোজ্য তা হলো, সংখ্যাতাত্ত্বিক উপাত্তের মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতা সংক্রান্ত যে সংখ্যাগুলো পাওয়া যায়, তা কিন্তু প্রকৃত চিত্র নয়। বাস্তব চিত্র প্রকৃতার্থে আরো ভয়াবহ।

www.pathagar.com

বিবিসি-র সাংবাদিক সেবিলের অপকর্মের কথা আবারো স্মরণ করা যেতে পারে। মৃত্যুর পর তার সমস্ত অপকর্মের কথা প্রকাশিত হয়েছে। একটি ঘটনার সূত্র ধরে ক্রমান্বয়ে অনেকগুলো ঘটনার কথা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। প্রথম যে ঘটনাটি প্রকাশিত হয়েছিল, সেটি অপ্রকাশিত থাকলে হয়তো সেবিলের কুকীর্তির কথা কেউ কোনদিন জানতেও পারতো না। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই, সেবিলের সমগোত্রীয়রা বিশ্বের সর্বত্র সকল সামাজিক-ধর্মীয় জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে আছে। কারো ঘটনা সবাই জেনে যাচ্ছে, আবার অনেক ঘটনা কখনোই দিনের আলোর মুখ দেখছে না। বাস্তবে যা প্রকাশিত হচ্ছে তার চাইতে অপ্রকাশিত ঘটনার সংখ্যা বহুগুণ বেশি।

স্পষ্টতঃ জাতি-ধর্ম-দেশ-কাল নির্বিশেষে নারী তার শৈশব থেকে আমৃত্যু জীবনের প্রতি পদে পদে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। কিন্তু আমরা যখন বলি, ইসলাম মানবতার ধর্ম; ইসলাম সর্বকালের সকল মানুষের ধর্ম; ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান; তখনতো নারীর এই নিরাপত্তাহীনতা দূরীকরণে, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ইসলামের অবশ্যই কিছু নির্দেশনা, কিছু বিধান, কিছু করণীয় থাকতেই হয়। সহিংসতা-লাঞ্ছনা-বঞ্চনার মধ্যে নারী দুর্বিষহ জীবন অতিবাহিত করবে অথবা প্রতি মুহূর্তে সহিংসতা-লাঞ্ছনা-বঞ্চনার আশংকার মধ্যে নারী গ্লানিকর জীবন অতিবাহিত করবে, এটাতো ইসলাম কখনোই সমর্থন করতে পারে না। পবিত্র কুরআন মাজীদে আল্লাহতা'য়ালা বলেন,

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ

তোমাদেরকে তিনি (তাঁর দ্বীনের জন্য) মনোনীত করেছেন এবং ধর্মে তোমাদের জন্য কোন কাঠিন্য (কঠিন বিধান) আরোপ করেন নি। আল-হাজ্জ: ৭৮ (অংশ)। আল্লাহতা'য়ালা আরো বলেন,

يُرِيدُ اللَّـهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান; কারণ মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই দুর্বল। আন-নিসা: ২৮। আল্লাহতা'য়ালা আরো বলেন,

لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

আল্লাহ কোন মানুষের উপর এমন বোঝা চাপিয়ে দেন না, যা বহন করার ক্ষমতা তার নেই। আল-বাকারা: ২৮৬ (অংশ)।

www.pathagar.com

প্রায় অনুরূপ কথা বলেছেন সূরা আল-আরাফের ৪২ এবং সূরা আল-মুমিনূনের ৬২ আয়াতে। এছাড়াও আরো কয়েকটি আয়াতে ধর্মে কোন কাঠিন্য আরোপ না করার কথা এবং মানুষের উপর দুর্বহ বোঝা চাপিয়ে না দেয়ার কথা বলেছেন।

কুরআন কেবল কিছু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং তার নিয়ম-কানুন বর্ণনার গ্রন্থ নয়। বরং মানুষকে বিশুদ্ধ মানুষে পরিণত করার জন্য এটিতে রয়েছে বিভিন্ন সামাজিক-পারিবারিক বিধি-বিধান। কুরআনে আল্লাহ যখন বলেন:

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ

অশ্লীলতার কাছেও যেয়ো না, তা প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন অশ্লীলতা; সূরা আল-আন আম: ১৫১ (অংশ)

তখন কুরআনে বিশ্বাসী প্রতিটি মানুষের উপর গোপন এবং প্রকাশ্য সকল অশ্লীলতা পরিহার করা অবশ্য পালনীয় বা ফরয হয়ে দাঁড়ায়। আর এ অশ্লীলতার মধ্যে নারীর প্রতি সহিংসতার যত রূপ আছে তার সবক'টি আপনিই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আল্লাহতা'য়ালা কুরআনে আরো বলেন:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়োনা। নিশ্চয় এটি অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ। বনী ইসরাঈল: ৩২।

ব্যভিচারসহ সকল অশ্লীলতাকে আল্লাহপাক পূর্বোল্লিখিত আল-আন'আমের ১৫১ আয়াতে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়াও আল্লাহতা'য়ালা যখন বলেন,

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ
ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّـهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

মুমিন পুরুষদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাজত করে। এটি তাদের জন্য পবিত্রতর পন্থা। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। আন-নূর: ৩০,

তখন প্রত্যেক মুসলিম পুরুষের জন্য জীবনের সকল অবস্থায়, সকল কাজে দৃষ্টি অবনত রাখা এবং যৌনাঙ্গের হিফাজত করা অবশ্য কর্তব্য অর্থাৎ ফরয হয়ে যায়। আর এতেই প্রকাশ্য এবং গোপন সকল অশ্লীলতার দ্বার অনেকখানি রুদ্ধ

www.pathagar.com

হয়ে যায়। বাকিটুকু রুদ্ধ হয়, আল্লাহর পরবর্তী বাণী অনুসরণের মাধ্যমে। আল্লাহ্ বলেনঃ

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ

মুমিন নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাজত করে। যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তারা যেন তাদের সাজসজ্জা-অলংকারাদি প্রদর্শন না করে এবং মাথার চাদর দিয়ে তারা যেন তাদের বক্ষদেশ ঢেকে রাখে.....। আন-নূর:৩১ (অংশ)।

পূর্ববর্তী আয়াতে পুরুষের দৃষ্টি সংযত রাখার এবং যৌনাঙ্গের হিফাজতের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। বর্তমান আয়াতে একই কথাগুলো বলা হলো নারীর জন্য। একই সাথে নারীর জন্য সৌন্দর্য প্রদর্শন না করার এবং মাথার ওড়না দিয়ে বক্ষদেশ আবৃত করার মতো বাড়তি কিছু নির্দেশনাও দেয়া হলো। ঘরে-বাইরে সর্বত্র নারীকে এভাবেই পোশাক পরিধান করে চলতে হবে, তা কিন্তু নয়। বরং এ নির্দেশনা কার্যতঃ নারী যখন ঘরের বাইরে অবস্থান করবে ঐ সময়ে পালনীয়। পক্ষান্তরে গৃহাভ্যন্তরে যে সমস্ত নিকটাত্মীয়ের সামনে নারীকে নিয়মিত চলাফেরা করতে হয়, তারা এ নির্দেশনার আওতা বহির্ভূত। আয়াতটির পরবর্তী অংশে বারোজন নিকটাত্মীয়ের উল্লেখ করা হয়েছে যাদের সামনে নারীর স্বাভাবিক রূপসজ্জা প্রকাশে কোন বাধা নেই।

আল্লাহর বাণী দুটিতে পুরুষ এবং নারী উভয়ের ক্ষেত্রে দৃষ্টি এবং যৌনাঙ্গ সংযত রাখার নির্দেশ দেয়া হলেও নারীর ক্ষেত্রে সাজসজ্জা-অলংকারাদি প্রদর্শন ও দেহাবয়ব প্রদর্শনের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হলো। আল্লাহতা'য়ালা নারী এবং পুরুষ উভয়েরই স্রষ্টা। তাঁর উভয় সৃষ্টির দেহাবয়ব একরকম নয়, ভিন্নতর। উভয় সৃষ্টির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যও ভিন্নতর। নারী সন্তান ধারণ করে। নারীর দেহ থেকেই উৎপাদিত হয় নবজাতক সন্তানের আহার্য-পানীয়। সন্তানের প্রাথমিক লালন-পালন-পরিচর্যার দায়িত্বও প্রাকৃতিকভাবেই নারীর উপর ন্যস্ত। বস্তুতঃ দেহাবয়বগত ও প্রকৃতিগত তারতম্যের কারণেই নারী এবং পুরুষ উভয়ের স্রষ্টা পার্থিব জীবনযাপনে পোশাক-পরিচ্ছদ ও দেহাবয়ব প্রদর্শনের ক্ষেত্রে নারীর জন্য অতিরিক্ত কিছু নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এ নির্দেশনা কোনোমতেই নারীর মর্যাদাগত অবস্থানের সাথে

www.pathagar.com

সম্পর্কিত নয়। বরং মর্যাদাগত দিক থেকে আল্লাহর কাছে নারী ও পুরুষ উভয়েই সকল বিবেচনায় সমান অবস্থানে বিরাজমান। আল্লাহতা'য়ালার নিম্নোক্ত বাণীটিতে নারী-পুরুষের সার্বিক সাম্যের বিষয়টি বিধৃত হয়েছে:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী, আল্লাহনুগত পুরুষ ও আল্লাহনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সিয়াম পালনকারী পুরুষ ও সিয়াম পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গের হিফাজতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গের হিফাজতকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নারী; তাদের জন্য তো আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন বিপুল ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।" সূরা আল-আহযাব: ৩৫

এই যদি হয় কুরআন তথা আল্লাহর বাণী, তাহলে ইসলামের ছায়াতলে একজন নারী কেন সহিংসতা আর লাঞ্ছনা সহ্য করে দুর্বিষহ জীবনযাপন করবে? নারী কেন প্রতি মুহূর্তে পুরুষের বা পরিবারের সহিংসতা আর লাঞ্ছনার আশংকার মধ্যে দিনাতিপাত করে জীবনটাকে এক দুর্বহ বোঝায় পরিণত করবে? মুসলিম পুরুষের কাছে কেবল মুসলিম নারী নয়, বিশ্বের সকল নারীই নিজেদের নিরাপদ ভাবতে পারার কথা।

কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিশ্বের অন্য সকল স্থানের মতো, অন্য সকল পুরুষের মতো মুসলিম পুরুষরা নারীর প্রতি সহিংসতায়, জুলুমে, অত্যাচারে, নির্যাতনে কারো চাইতে কম যায় না। যেভাবে বাবা-মায়েরা সন্তান-সন্ততিদের তাদের অধীনস্থ এবং অনুগত বিবেচনা করে থাকে, তেমনি ভাবেই জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল স্বামীরাই স্ত্রীদেরকে তাদের অধীনস্থ এবং অনুগত বিবেচনা করে থাকে। এক্ষেত্রে মুসলিম পুরুষরাও মোটেই ব্যতিক্রম নয়। বরং স্ত্রীকে

www.pathagar.com

নিজের অধীনস্থ বিবেচনা করা পুরুষের একটি সহজাত প্রবণতা বলে মনে হতে পারে। নারীকে নিজের অধীনস্থ বিবেচনা করতে পারলে, পুরুষ তার সম্পদের উপর, জীবন-যাপনের উপর, এমনকি ব্যক্তিত্বের উপরও আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ পায়। আর এর ফলে নারীর স্বাভাবিক মানবিক সত্তা পুরুষের অধীনে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর তাই কুরআনে আল্লাহতা'য়ালা এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত কঠোরভাবে বলছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

হে ঈমানদারগণ! জোরপূর্বক নারীদেরকে উত্তরাধিকার গণ্য করা তোমাদের জন্যে হালাল নয়। তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ, তা থেকে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদের উপর জুলুম করো না; তবে তারা যদি কোন প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয় (তবে এ সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম করা যেতে পারে)। নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর। তোমরা যদি তাদের ঘৃণা কর, তবে এমন হতে পারে যে আল্লাহ যার মধ্যে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন, তোমরা তাকে ঘৃণা করছ। আন-নিসা: ১৯।

পুত্র-কন্যারা পিতা-মাতার সম্পদের স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী। ফলে এটা ধরে নেয়া হয় যে পুত্র-কন্যারা স্বাভাবিকভাবেই পিতা-মাতার অধীনস্থ হবে। পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, করণীয়-বর্জনীয় সকল বিষয়ে ভূমিকা রাখবে। স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে ব্যাপারটি ভিন্ন। তাদের যেকোন একজনের মৃত্যুর পর অপরজন মৃতের সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়। কিন্তু জীবিতাবস্থায় তাদের মধ্যে পরস্পরের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার সুযোগ রয়েছে, যা পুত্র-কন্যার ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। আর তাই জোরপূর্বক নারীকে নিজের অধীনস্থ গণ্য করে তার উপর জুলুম-নির্যাতন চালানো এবং তার সম্পদ কুক্ষিগত করার অপপ্রয়াসকে কুরআনে সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। নারীর সম্পদে তার নিজের একক এখতিয়ার। এতে স্বামীর কোন আধিপত্য বা প্রভাব বিস্তারের সুযোগ নেই। নারীকে কল্যাণের আধার হিসাবে চিত্রিত করে আল্লাহতা'য়ালা নারীর সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং একটি ব্যতিক্রম

www.pathagar.com

ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোন কারণে নারীর উপর জুলুম-অত্যাচারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। ব্যতিক্রম ক্ষেত্রটি হচ্ছে– নারীর প্রকাশ্য কোন অশ্লীলতায় লিপ্ত হওয়া; অর্থাৎ কোন অবৈধ যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়া। স্বামী বর্তমান থাকতে নারীর অবৈধ কোন যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়া, কোন গোপন বা প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হওয়া আল্লাহর নিকট গুরুতর অপরাধ হিসাবে বিবেচ্য।

কুরআনের অন্য একটি আয়াতে এরই প্রতিধ্বনি পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহতা'য়ালা বলছেন:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّـهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

হে নবী, মুমিন নারীরা যখন তোমার কাছে আনুগত্যের শপথ করতে এসে বলে, 'তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, যিনা-ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, অপরের ঔরসজাত সন্তানকে স্বামীর ঔরসে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবি করবে না এবং কল্যাণকাজে তোমার অবাধ্যতা করবে না', তখন তাদের আনুগত্য গ্রহণ করো এবং তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল অত্যন্ত দয়ালু। আল-মুমতাহানা: ১২

যারা এ মর্মে প্রতিশ্রুতি দেবে যে আয়াতে উল্লিখিত অপরাধগুলোর কোনটিই তারা কখনোই করবে না, নবীর (সাঃ) কাছে মুসলিম হিসাবে কেবল তাদের আনুগত্যের শপথ (বাইয়াত) গ্রহণযোগ্য হবে বলে স্বয়ং আল্লাহতা'য়ালা জানাচ্ছেন। এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, প্রতিশ্রুতি দেয়ার পর কেউ যদি তা ভেঙে ফেলে, তাহলে সে আনুগত্যের বন্ধন থেকেই বাইরে চলে যায়। অর্থাৎ শপথ ভঙ্গকারী ব্যক্তি কার্যত ইসলাম থেকেই বাইরে চলে যায় এবং বিশুদ্ধ তাওবা করার পরই কেবল পুনরায় সে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

আয়াতটিতে লক্ষণীয়, যে সমস্ত শর্তে নবীর নিকট আনুগত্যের শপথ করার কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে দুটি শর্ত হচ্ছে নারী কোন অবৈধ যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত হবে না এবং অপরের ঔরসজাত সন্তানকে স্বামীর ঔরসে আপন গর্ভজাত বলে দাবি করবে না। এ দু'টি আল্লাহর নিকট অমার্জনীয় অপরাধ। দ্বিতীয় অপরাধটি

www.pathagar.com

কেবল নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও প্রথমটি নিঃসন্দেহে নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আয়াতে যে সমস্ত শর্তে আনুগত্যের শপথ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে, সহীহ মুসলিমে উদ্ধৃত একটি হাদীসে আমরা দেখতে পাই স্বয়ং নবী (সাঃ) প্রায় অনুরূপ শর্তে পুরুষ সাহাবীগণের নিকট থেকে বাইয়াত নিচ্ছেন।

উবাইদা ইবনে সামিত থেকে বর্ণিত। একদা আমরা নবীর (সাঃ) সাথে ছিলাম। তিনি আমাদের বললেন, "আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবেন না, ব্যভিচার করবেন না, চুরি করবেন না, আল্লাহ যে প্রাণ হারাম করেছেন যথাযথ ও সঙ্গত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করবেন না; এ শর্তে আপনারা আমার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করুন। যিনি এ শর্তসমূহ প্রতিপালন করবেন, তাঁর পুরস্কার রয়েছে আল্লাহর নিকট। যদি কেউ অপরাধগুলির কোনটি করার কারণে শাস্তি লাভ করেন, তাহলে সেটি তাঁর অপরাধের কাফফারা হয়ে যাবে। আর কেউ যদি অপরাধগুলির কোনটি করার পর আল্লাহ তা গোপন রাখেন, তাহলে তাঁর বিষয়টি আল্লাহর কাছে ন্যস্ত থাকবে। আল্লাহ চাইলে তাঁকে শাস্তি দেবেন অথবা চাইলে তাঁকে ক্ষমা করেও দিতে পারেন।' সহীহ মুসলিম[১১]।

গোপন-প্রকাশ্য সকল অশ্লীলতা, অবৈধ যৌন-ক্রিয়া, ব্যভিচার আল্লাহতা'য়ালা হারাম ঘোষণা করেছেন। তারপরেও আমাদের সমাজ অশ্লীলতা, ব্যভিচার, ইত্যাদি থেকে মুক্ত নয়। একজন পুরুষ যদি তার স্ত্রীকে অন্য কোন পুরুষের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখতে পায়, তাহলে তার যা প্রতিক্রিয়া হবে, একজন নারী তার স্বামীকে অন্য নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখতে পেলে অনুরূপ প্রতিক্রিয়াইঃ হবে। কিন্তু প্রধানতঃ শারীরিক শক্তির তারতম্যের কারণে প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ ভিন্নতর হবে। স্ত্রীকে অন্য পুরুষের সাথে দেখলে পুরুষের কেমন প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা সহীহ বুখারীর একটি হাদীসে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ

আল-মুগীরা থেকে বর্ণিত। সা'দ ইবনে উবাদা (রাঃ) বলেন, "যদি আমি আমার স্ত্রীর সাথে অন্য কোন পুরুষকে দেখি, তাহলে আমার তরবারির আঘাতে তাকে আমি দ্বিখণ্ডিত করে ফেলবো।" এ কথাটি নবীর (সাঃ) কানে গেলে তিনি বললেন, "আপনারা সা'দের আত্মসম্মানবোধ দেখে অবাক হচ্ছেন। আল্লাহর শপথ! তার চাইতে আমার আত্মসম্মানবোধ বেশি এবং আমার চাইতে আল্লাহর আত্মসম্মানবোধ আরো বেশি। আল্লাহর আত্মসম্মানবোধের কারণে তিনি গোপন এবং প্রকাশ্য সকল অশ্লীলতাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। আল্লাহর চাইতে আর কেউ এত ভালবাসেনা যে, বান্দাহরা আল্লাহর কাছে অনুতপ্ত হবে

www.pathagar.com

এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আর তাই আল্লাহ সাবধানকারী এবং সুসংবাদ প্রদানকারীগণকে (নবী-রাসূল) পৃথিবীতে পাঠাতে থেকেছেন। অন্য কেউ আল্লাহর চাইতে বেশি প্রশংসিত হতে চায় না; আর তাই আল্লাহ (কল্যাণ-কাজে-রতদের) জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।"আবদুল মালেক বলেন, "আল্লাহর চাইতে বেশি আত্মসম্মানবোধ আর কারো নেই।" সহীহ আল-বুখারী[১২]।

এটাই পুরুষের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া; সে হয় ব্যভিচারকারী পুরুষকে অথবা পুরুষ-নারী উভয়কে দ্বিখণ্ডিত করতে চাইবে, হত্যা করতে চাইবে। গোপন-প্রকাশ্য সকল প্রকার অশ্লীলতা, যিনা, ব্যভিচার, ইত্যাদি সমাজে নোংরামি, অশান্তি, খুনোখুনি, আত্মহত্যা, ইত্যাদির প্রসার ঘটায়। আর তাই আল্লাহতা'য়ালা এসব ঘৃণ্য কাজকে শুধু হারাম ঘোষণা করেই থেমে থাকেন নি, বরং সমাজে যেন এধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড কোথাও ঘটার পূর্বে ন্যূনতম আশংকা দেখা দেয়া মাত্রই তা যেন রোধ করা যায়, তার ব্যবস্থাও দিয়েছেন। সূরা আন-নিসার ৩৪ এবং ১২৮ আয়াত তেমনই দুটি আয়াত যেগুলিতে অশ্লীলতা-ব্যভিচারের আশংকা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই তা দমন করার প্রতিবিধান দিয়েছেন আল্লাহতা'য়ালা।

দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে, আয়াত দুটির প্রাপ্ত অনুবাদ এবং ব্যাখ্যাসমূহ এমনই পরস্পর-বিরোধী যে, এগুলি থেকে আয়াত দু'টির প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতে হয়। বর্তমান গ্রন্থে সূরা আন-নিসার ৩৪ আয়াতের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং আয়াতটির প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

৩

সূরা আন-নিসা: ৩৪

আয়াতটিতে আল্লাহ বলছেন:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّـهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّـهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

পুরুষ নারীর ভরণপোষণকারী (অভিভাবক, তত্ত্বাবধায়নকারী), কারণ আল্লাহ তাদের এককে অপরের উপর বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং কারণ পুরুষ তার ধন সম্পদ ব্যয় করে; সুতরাং সাধ্বী স্ত্রীরা অনুগতা হয় এবং যা লোক চক্ষুর অন্তরালে, আল্লাহর হিফাজতে তার হিফাজত করে। (আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন-যাপনের ব্যাপারে) স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার (নুশূজের) আশংকা কর, তাদের সদুপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা বর্জন কর এবং তাদের প্রহার কর। যদি তারা তোমাদের অনুসারী হয়ে যায়, তবে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অন্বেষণ করো না; আল্লাহ মহান, শ্রেষ্ঠ।

৩.১ বিভ্রান্তি এবং দুর্বোধ্যতা

আয়াতটির যত বেশি সংখ্যক অনুবাদ এবং তাফসীর পড়া হয়, তত বেশি দুর্বোধ্যতা ও জটিলতার সৃষ্টি হয়। ফলে আল্লাহতা'য়ালার বাণীর প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন এবং হুকুম নির্ধারণে সমস্যা সৃষ্টি হয়। নিচে সূরা আন-নিসার ৩৪ আয়াতের বিভিন্ন কুরআন বিশেষজ্ঞের সাতটি অনুবাদ তুলে ধরছি। এগুলো পর্যালোচনা করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে বলে আশা করা যায়।

www.pathagar.com

পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ তাহাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন এবং পুরুষ তাহাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। সুতরাং সাধ্বী স্ত্রীরা অনুগতা হয় যাহা লোকচক্ষুর অন্তরালে আল্লাহ সুরক্ষিত রাখিয়াছেন উহারা তাহার হিফাজত করে। স্ত্রীদের মধ্যে যাহাদের অবাধ্যতার আশংকা করো, তাহাদিগকে সদুপদেশ দাও, তারপর তাহাদের শয্যা বর্জন করো, অবশেষে তাহাদিগকে প্রহার করো। যদি তাহারা তোমাদের অনুগত হয়, তবে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অন্বেষণ করিওনা। আল্লাহ মহান, শ্রেষ্ঠ। তাফসীরে ইবনে কাছীর[১৩];

পুরুষরা হইতেছে নারীদিগের সর্বপ্রধান রক্ষণাবেক্ষক, আল্লাহ মানবসমাজের কতককে অন্য কতকের উপর যে শ্রেষ্ঠতা দিয়াছেন তাহার কারণে, -অধিকন্তু পুরুষরা নিজ ধনসম্পত্তি হইতে (স্ত্রীদিগের জন্য) যে ব্যয় বহন করিয়া থাকে, তাহারও কারণে; অতএব সাধু নারীরা (হইতেছে) অনুগতা, (লোক চক্ষুর) অগোচর বিষয়েও আত্মরক্ষাকারিণী--আল্লাহর অবধারিত দায়িত্ব অনুসারে; আর যেসব স্ত্রীর উচ্ছৃঙ্খলতার আশঙ্কা করিবে তোমরা, তাহাদিগকে (প্রথমে) সৎ-উপদেশ দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিবে, এবং (তাহাতে ফল না হইলে) শয়ন গৃহে তাহাদিগকে আলাহিদা করিয়া রাখিবে এবং (সর্বশেষে) তাহাদিগকে প্রহার করিবে, --ফলে স্ত্রীরা যদি অনুগত হইয়া যায়, সে অবস্থায় আর তাহাদিগের বিরুদ্ধে ছিদ্রান্বেষণ করিয়া বেড়াইওনা; নিশ্চয় আল্লাহ হইতেছেন (সামর্থ্যে) শ্রেষ্ঠতম, (ক্ষমায়) সুবিরাট। মোহাম্মদ আকরম খাঁ[১৪];

পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ তাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব (আয়াতের তাফসীরে অবশ্য 'শ্রেষ্ঠত্ব'কে 'বিশেষ বৈশিষ্ট্য' বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে) দান করেছেন এবং এ জন্য যে, পুরুষ নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। কাজেই সতী-সাধ্বি স্ত্রীরা আনুগত্যপরায়ণ হয় এবং পুরুষের অনুপস্থিতিতে আল্লাহর হেফাজতে ও তত্ত্বাবধানে তাদের অধিকার সংরক্ষণ করে থাকে। আর যেসব স্ত্রীদের ব্যাপারে তোমরা অবাধ্যতার আশংকা করো, তাদের বুঝাও, শয়নগৃহে তাদের থেকে আলাদা থাকো এবং তাদেরকে মারধোর কর। তারপর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায় তাহলে অযথা তাদের উপর নির্যাতন চালাবার জন্য বাহানা তালাশ করোনা। নিশ্চিতভাবে আল্লাহ উপরে আছেন, তিনি বড় ও শ্রেষ্ঠ। তাফহীমুল কুরআন[১৫];

www.pathagar.com

Men are the protectors and maintainers of women, because Allah has given the one more (strength) than the other, and because they support them from their means. therefore the righteous women are devoutly obedient, and guard in (the husband's) absence what Allah would have them guard. As to those women on whose part ye fear disloyalty and ill-conduct, admonish them (first), (Next), refuse to share their beds, (And last) beat them (lightly); but if they return to obedience, seek not against them Means (of annoyance)t For Allah is Most High, great (above you all). Abdullah Yususf Ali[১৬];

পুরুষগণ নারীদের শাসনকর্তা, এই নিমিত্তে যে, আল্লাহতা'য়ালা এককে অন্যের উপর মর্যাদা (সোলেমানিয়া বুক হাউস কর্তৃক প্রকাশিত অনুবাদে 'মর্যাদা'র পরিবর্তে 'শ্রেষ্ঠত্ব' লেখা হয়েছে) প্রদান করিয়াছেন, এবং এই নিমিত্তে যে, পুরুষগণ স্বীয় অর্থ ব্যয় করিয়াছে। সুতরাং যে সমস্ত নারী পুণ্যবতী, আনুগত্য করে; পুরুষের অবর্তমানে আল্লাহর হিফাজতে রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং যে সব নারী এরূপ হয় যে, তোমরা ইহাদের অবাধ্যতার আশংকা কর, তবে ইহাদিগকে মৌখিক উপদেশ প্রদান কর এবং ইহাদের শয্যাস্থানে একা পরিত্যাগ কর এবং ইহাদিগকে প্রহার কর। অনন্তর যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করিতে থাকে, তবে ইহাদের প্রতি বাহানা অন্বেষণ করিওনা। নিশ্চয় আল্লাহতা'য়ালা মহীয়ান ও গরীয়ান। আশরাফ আলী থানভী[১৭];

পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল এ জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সেমতে নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগতা এবং আল্লাহ যা হিফাজতযোগ্য করে দিয়েছেন লোক চক্ষুর অন্তরালেও তার হিফাজত করে। আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সবার উপর শ্রেষ্ঠ। হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী[১৮];

Men are the protectors and maintainers of women, because Allah has made one of them to excel the other, and because they spend (to support them) from their means. Therefore the righteous women are devoutly obedient (to Allah and to their

www.pathagar.com

husbands), and guard in the husband's absence what Allah orders them to guard (e.g. their chastity, their husband's property, etc.). As to those women on whose part you see ill-conduct, admonish them (first), (next), refuse to share their beds, (and last) beat them (lightly, if it is useful), but if they return to obedience, seek not against them means (of annoyance). Surely, Allah is Ever Most High, Most Great. মুহাম্মাদ তকী উদ-দ্বীন আল হিলালী ও মুহাম্মাদ মুহসীন খান[১৯];

পুরুষরা হচ্ছে নারীদের (কাজকর্মের) ওপর (তত্ত্বাবধায়ক ও) প্রহরী কারণ, আল্লাহতা'য়ালা এদের একজনকে আরেকজনের ওপর কিছু বিশেষ মর্যাদা প্রদান করেছেন, (পুরুষদের এই মর্যাদার) একটি (বিশেষ) কারণ হচ্ছে এই যে, (প্রধানতঃ) তারাই (দাম্পত্য জীবনের জন্য) নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে, অতএব সতী-সাধ্বী নারী হবে (একান্ত) অনুগত, (পুরুষদের) অনুপস্থিতিতে তারা (স্বয়ং) আল্লাহর তত্ত্বাবধানে (থেকে) নিজেদের (ইযযত-আবরু ও অন্যান্য) অদেখা কিছুর রক্ষণাবেক্ষণ করবে, আর যখন কোন নারীর অবাধ্যতার (ও ঔদ্ধত্যের) ব্যাপারে আশংকা করো, তখন তোমরা তাদের (ভালো কথার) উপদেশ দাও, (তা কার্যকর না হলে) তাদের সাথে একই বিছানায় থাকা ছেড়ে দাও, (তাতেও যদি তারা ভালো না হয়, তাহলে চূড়ান্ত ব্যবস্থা হিসাবে) তাদের প্রহার করো, তবে যদি তারা (এমনিই) অনুগত হয়ে যায়, তাহলে তাদের (খামাখা কষ্ট দেয়ার) জন্য অযুহাত খুঁজে বেড়িওনা, অবশ্যই আল্লাহাতায়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবার চাইতে মহান! সাইয়েদ কুতুব শহীদ[২২]।

উল্লিখিত ছয়টি বাংলা এবং দুটি ইংরেজি অনুবাদে একটি বিষয় লক্ষণীয়। বাংলা তাফসীরগুলোর মধ্যে একমাত্র মাওলানা আকরাম খাঁ প্রণীত *তাফছীরুল কোরআন* মূল বাংলা রচনা। এটিতে কুরআনের মূল আরবীবাণী সরাসরি বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। অপর পাঁচটির মধ্যে তিনটির মূল কাজ হয়েছে উর্দুতে এবং অবশিষ্ট দুটি আরবীতে। কুরআনের উর্দু এবং আরবী অনুবাদ ও তাফসীর থেকে পরবর্তীতে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে ইংরেজি অনুবাদ দু'টি মূল আরবী কুরআন থেকে ইংরেজিতে সরাসরি অনুবাদ করা হয়েছে। অনুবাদগুলো সুক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে উল্লেখযোগ্য বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়, যেমনঃ

www.pathagar.com

১. 'ফাদ দা লাল্লাহু বা'দা হুম 'আলা বা'দিন'- এই বাক্যাংশের অর্থ কখনও করা হয়েছে 'এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব'[১৩], কখনও 'কতককে অপর কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব'[১৪], কখনও 'একজনকে অপর জনের উপর বিশিষ্টতা'[১৫], কখনও 'Given the one more (strength) than the other'[১৬] ইত্যাদি করা হয়েছে। লক্ষণীয় যে, 'শ্রেষ্ঠত্ব' ও 'বৈশিষ্ট্য' এ দুটি সম্পূর্ণ ভিন্নার্থক শব্দ একই মূল আরবী শব্দের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে মূল বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবনে ব্যর্থ হতে হয়।'

২. 'হাফিজাতুল লিল গায়েব', এই বাক্যাংশের অর্থ কোথাও বলা হয়েছে, 'যা লোক চক্ষুর অন্তরালে তার হিফাজতকারিণী' (১৩), কোথাও 'অদৃশ্যের সংরক্ষণকারিণী স্ত্রীলোক' (১৭), 'স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার অধিকার সংরক্ষণকারিণী' (১৫), 'Guard in (the Husband's) absence' (১৪) ইত্যাদি বলা হয়েছে।

৩. 'নুশূজ' শব্দটি দ্বারা কেউ বুঝেছেন নারীর 'অবাধ্যতা'(১৮), আবার কেউ 'ঔদ্ধত্য'(১৫), 'বিদ্রোহাত্মক আচরণ' (১৭), 'Disloyality and ill-conduct'(১৬), ইত্যাদি বুঝেছেন। আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে কেবল নারীর নুশূজের ক্ষেত্রে উপরোক্ত শব্দসমূহ প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু পুরুষ বা স্বামী যখন নুশূজ আচরণ করে, তখন শব্দটির অর্থ অন্য কিছু হয়ে যায় (সূরা আন-নিসার ১২৮ আয়াত দ্রষ্টব্য)।

৪. আয়াতে বলা হয়েছে, 'ওযাদরিবূহুন্না' অর্থাৎ 'তাদের প্রহার কর'। কিন্তু স্ত্রীর কোন্ বিশেষ অপরাধের কারণে স্বামী তাকে প্রহার করতে পারবে, তার কোন ব্যাখ্যা সাধারণতঃ দেখা যায়না। ফলে শিক্ষিত-অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত মুসলিম জনগোষ্ঠীর অনেকের গৃহ এক একটি বিচারালয়ে পরিণত হয়ে যায়। সেখানে একাধারে বাদী এবং বিচারক স্বয়ং স্বামী। পক্ষান্তরে স্ত্রী হচ্ছে একমাত্র অপরাধী যার আত্মপক্ষ সমর্থনেরও কোন সুযোগ নেই।

৫. 'নুশূজ' এর আশংকা সৃষ্টি হলে আয়াতে সর্বশেষ ব্যবস্থা উল্লিখিত প্রহারসহ ধারাবাহিকভাবে তিনটি ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কোন অপরাধ সংঘটনের পূর্বে কেবল আশংকা দেখা দিলে সন্দেহভুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদানের বিষয়টি ইসলাম সমর্থন করে কি

www.pathagar.com

না, সে ব্যাপারে কোন বক্তব্য কোন অনুবাদ বা তাফসীর-গ্রন্থে দেখা যায় না।

যে পাঁচটি তাফসীর গ্রন্থ থেকে সূরা আন-নিসার ৩৪ আয়াতের উপরোক্ত বাংলা অনুবাদসমূহ উদ্ধৃত হয়েছে, তার প্রত্যেকটির মূল গ্রন্থসমূহ বিখ্যাত মুফাসসীরবৃন্দ (কুরআন ব্যাখ্যাকার) কর্তৃক প্রণীত। মূল গ্রন্থ প্রণেতারা যেমন তাঁদের নিজ নিজ দেশে বিখ্যাত ছিলেন, বাংলাদেশেও তাঁরা একইভাবে বিখ্যাত এবং গভীর শ্রদ্ধার সাথে তাঁদের গ্রন্থ অধ্যয়ন করা হয়ে থাকে। আবার মূল গ্রন্থ থেকে যাঁরা ঐসব বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী মানুষের জন্য কুরআন জানার, বুঝার এবং মান্য করার কাজটি সহজ করে দিয়েছেন, তাঁরাও প্রত্যেকে বাংলাদেশে স্বনামখ্যাত কুরআন বিশেষজ্ঞ হিসাবে পরিচিত। মাতৃভাষায় কুরআনকে উপলব্ধি করার জন্য যে শ্রম ও মেধা তাঁরা দিয়েছেন, তাঁর জন্য তাঁরা রোজ কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত আল্লাহর নিকট থেকে বিনিময় পেতে থাকবেন। কিন্তু একই শব্দের অনুবাদে যখন ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বা ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়, তখন মনের মধ্যে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে।

পাশাপাশি যদি কিছু ইংরেজি অনুবাদ পর্যালোচনা করা হয়, তাহলে ভিন্ন একটি চিত্র দেখা যায়। উপরে যে কয়েকটি বাক্যাংশ এবং শব্দের অনুবাদের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, ঐ বাক্যাংশ এবং শব্দগুলো ইংরেজি অনুবাদকেরা কীভাবে অনুবাদ করেছেন তার একটি তুলনামূলক চিত্র নিচে দেয়া হলো। উল্লেখ্য, বন্ধনীর মধ্যে অনুবাদক কুরআন বিশেষজ্ঞের নাম উদ্ধৃত হয়েছে। Saheeh International কর্তৃক সম্পাদিত অনুবাদ কর্মটি বস্তুতঃ তিনজন আমেরিকান নারী নওমুসলিম কর্তৃক প্রণীত। ইসলাম গ্রহণের পরপরই আরবী ভাষায় দখল অর্জনের জন্য তাঁরা কঠোর পরিশ্রম করেন এবং তিনজনই বিভিন্ন সময়ে সৌদী-আরবের জেদ্দায় দীর্ঘ সময় অবস্থান করে ইসলামকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার লক্ষ্যে প্রয়াসী হন। একজনতো স্থায়ীভাবেই তথায় বসবাস করছেন।

'ফাদ.দা.লাল্লাহু বা'দা.হুম আলা বা'দিন'- এই বাক্যাংশের আটটি ইংরেজি অনুবাদে কুরআন বিশেষজ্ঞগণ এ কথাগুলো বলেছেন, 'because Allah hath made the one of them to excel the other' (Muhammad Marmaduke Pikthal), 'because Allah has given the one more (strength) than the other' (Abdullah Yusuf Ali), 'because Allah has made some of them to excel others', (M. H. Shakir), 'what Allah has given one over the other' (Saheeh International), 'because of the

www.pathagar.com

greater preference that God has given to some of them', (Mohammad Sarwar), 'because Allah has made one of them to excel the other', (Dr. Muhammad Taqi-ud-Din al-Hilali and Dr. Muhammad Mohsin Khan), 'for that God has preferred in bounty one of them over another' (Arthur J. Arberry) and 'with the bounties which God has bestowed more abundantly on the former than on the latter' (Muhammad Asad).

'হাফিজাতুল লিল গায়েব', এই বাক্যাংশের অনুবাদে উল্লিখিত বিশেষজ্ঞগণ যথাক্রমে লিখছেন, 'guarding in secret that which Allah hath guarded', 'guard in (the husband's) absence what Allah would have them guard', 'guarding the unseen as Allah has guarded', 'guarding in [the husband's] absence what Allah would have them guard', 'dependable in keeping the secrets that God has protected', 'guard in the husband's absence what Allah orders them to guard (e.g. their chastity, their husband's property, etc.)', 'guarding the secret for God's guarding' and 'who guard the intimacy which God has [ordained to be] guarded'.

এবং 'নুশূজের আশংকার' অনুবাদে যথাক্রমে লেখা হচ্ছে, 'ye fear rebellion', 'ye fear disloyalty and ill conduct', 'you fear desertion', 'you fear arrogance', 'who disobey (God's laws)', 'you see ill-conduct', 'you fear may be rebellious' and 'ill-will you have reason to fear'.

'ফাদ.দা.লাল্লাহু বা'দা.হুম 'আলা বা'দিন'- এই বাক্যাংশটির বাংলা অনুবাদে আমরা দেখেছি, অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ (অনুবাদক) নারীর তুলনায় পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলেছেন। একজন কেবল পুরুষের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। কিন্তু আটটি ইংরেজি অনুবাদের কোনটিতেই নারীর তুলনায় পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা হয় নি। আবার 'হাফিজাতুল লিল গায়েব', এই বাক্যাংশের অনুবাদে কোন বিশেষজ্ঞ স্বামীর সম্পদের হিফাজতের কথা বলেন নি। একজন বিশেষজ্ঞ কেবল বন্ধনীভুক্ত বক্তব্যের মধ্যে স্ত্রীর নিজের সতীত্বের হিফাজতের সাথে সাথে স্বামীর সম্পদ হিফাজতের কথা বলেছেন (উল্লেখ আবশ্যক, অনুবাদকদ্বয়ের একজন, মুহসীন খান, পাকিস্তানের নাগরিক)।

আমরা দেখছি সবসময় না হলেও কিছু কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে কুরআনের বাণীর বাংলা এবং ইংরেজি অনুবাদে দৃশ্যমান পার্থক্য বিদ্যমান। কুরআনের বাণী

www.pathagar.com

অনুধাবন এবং অনুবাদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মনীষীর আদর্শগত অবস্থান, সামাজিক, পারিপার্শ্বিক, গোষ্ঠীগত এবং জাতিগত ধ্যান-ধারণা, সংস্কার, ইত্যাদি হয়তো অনেকখানি ভূমিকা থাকতে পারে। তাছাড়া নির্দিষ্ট মনীষীর কুরআন গবেষণার স্থান এবং সময়কালও উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করার সম্ভাবনা বিদ্যমান। উল্লেখ্য, ইংরেজি অনুবাদগুলোর তুলনায় বাংলা অনুবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট মূল উর্দু রচনাগুলো অনেক আগে রচিত এবং ইবনে কাছীর ব্যতীত অবশিষ্ট সকল বিশেষজ্ঞগণ উপমহাদেশেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

৩.২ আয়াতটির নিরিখে বর্তমান সমাজ

কোন রকম অহেতুক বিতর্কে না গিয়ে আজকের মুসলমানদের মধ্যে আয়াতটির প্রায়োগিক অবস্থা নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে পর্যালোচনা করলে করুণ হতাশাব্যঞ্জক একটি চিত্র ফুটে উঠে। মুসলিম নামে পরিচিত যে কোন ব্যক্তি, ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান থাকুক বা নাই থাকুক, অবশ্যই জানে যে ইসলাম স্ত্রীকে প্রহারের অনুমতি দেয়, স্ত্রীকে প্রহারের জন্য কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। স্বামী অনায়াসে স্ত্রীর বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে। স্বামী তথা বিচারক তার বিবেচনায় যে অপরাধের জন্য স্ত্রীকে শাস্তিস্বরূপ প্রহার করে, সে অপরাধটি আদৌ প্রহারযোগ্য কিনা, কিংবা কুরআন মাজীদে স্ত্রীকে প্রহারের বিধান দানের পূর্বে আরো দুটি বিকল্প বিধান যে দেয়া হয়েছে, তা হয়তো সে জানেই না। বাস্তবে এমন স্বামী কখনই পাওয়া যাবে না, যে আল্লাহতা'য়ালার বিধান অনুসরণ করে স্ত্রীকে প্রহারের বিকল্প হিসাবে প্রাথমিক দুটি বিধান প্রয়োগ করেছে, বরং প্রায় সকল স্বামীই কুরআনের কোন জ্ঞান ছাড়াই, নিজের শারীরিক শক্তি, আর্থিক ক্ষমতা ইত্যাদির বলে অসহায় নারীকে অকারণে প্রহার করে থাকে।

এটি দুঃখজনক যে, নারীর প্রতি এ অকারণ অত্যাচার-নির্যাতনের সামাজিক বা রাষ্ট্রিক কোন প্রতিবিধান দেখা যায় না। এটি এমনই এক পরিস্থিতি যেখানে নারীর কোন আশ্রয় থাকে না, কোন সহায় থাকে না, তার জন্য কোন সহানুভূতি থাকে না। প্রতিবিধান করতে গেলে হয় নারীর ঘর ভাঙে নয়তো অত্যাচার-নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এমনকি সচেতনতা সৃষ্টির কোন সামাজিক, রাষ্ট্রিক, গোষ্ঠীগত বা সম্প্রদায়গত উদ্যোগও দেখা যায় না। এক্ষেত্রে পত্র-পত্রিকার শিরোনাম এবং মহলবিশেষের সমালোচনা ছাড়া প্রতিবিধানের কার্যকর কোন উদ্যোগ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

www.pathagar.com

৪

কুরআনের আলোকে আয়াতটির পর্যালোচনা

কুরআনের আলোকে আয়াতটির সার্বিক বক্তব্য অনুধাবনের জন্য সর্বপ্রথম যেটি প্রয়োজন, সেটি হলো ঈমান এবং কুরআনের আলোকে আপন অন্তরকে আলোকিত করা। কোন প্রকার পূর্ব-ধারণার বশবর্তী হয়ে, শুধু বর্তমান আয়াত নয়, কুরআনের যে কোন বাণী অনুধাবনের চেষ্টা করলে, এমন কোন মরীচিকার সন্ধান হয়তো পাওয়া যেতে পারে, যা সত্যের বিপরীতে পরিচালিত করে। লব্ধ সিদ্ধান্ত তখন কুরআনের আয়াতের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করবে অথবা কুরআনের বাণীকে অর্থহীন প্রমাণ করবে। এই সূরা আন-নিসাতেই আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা বলেন:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّـهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾

তবে কি তারা কুরআন অনুধাবন করে না? এ গ্রন্থ যদি আল্লাহ ব্যতীত আর কারো নিকট থেকে আসত, তবে এতে অনেক বৈপরীত্য পাওয়া যেত ৪:৮২।

অতএব এমন দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যাখ্যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য, যা কুরআন তথা সত্যের বিপরীত।

৪.১. পুরুষ নারীর ভরণপোষণকারী

আয়াতটির প্রথম অংশে আল্লাহ বলছেন:

'পুরুষ নারীর ভরণপোষণকারী (অভিভাবক), কারণ আল্লাহ তাদের এককে অপরের উপর বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং কারণ পুরুষ তার ধন সম্পদ ব্যয় করে।' কাউয়ামূন শব্দের ভরণপোষণকারী এবং অভিভাবক অর্থটি আল্লামা ইউসুফ আলীর[১৬] অনুবাদ গ্রন্থ the Holy Qur'an এবং মুহাম্মাদ তকী উদ-

www.pathagar.com

দ্বীন আল হিলালী ও মুহাম্মাদ মুহসীন খান[১৯]-এর অনুবাদ গ্রন্থ কিং ফাহ্দ কমপ্লেক্স, মদীনা থেকে প্রকাশিত The Noble Qur'an এবং the Vocabulary of the Holy Quran[২০] গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যান্য অনুবাদ গ্রন্থসমূহে শব্দটির অর্থ ব্যবস্থাপক, পরিচালক, রক্ষণাবেক্ষণকারী, কর্তৃত্বশীল, ইত্যাদি করা হয়েছে, যা কুরআনে উল্লেখিত শব্দের যথার্থ অর্থ প্রকাশ করে না বলেই প্রতীয়মান।

আমরা দেখেছি 'ফাদ্দালাল্লাহু বা'দাহুম 'আলা বা'দিন' বাক্যাংশটির অনুবাদ বা ব্যাখ্যায় এক এক গ্রন্থে এক এক রকম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সবাই একের উপর অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব বা বিশিষ্টতা বলতে নারীর উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব বা বৈশিষ্ট্য বুঝেছেন। আবু বকর আল জাসসাস (রহঃ)[২১] তাঁর *আহকামুল কুরআন* গ্রন্থে বাক্যাংশটি অর্থ করেছেন, 'কতককে অপর *'কতকের উপর অধিক মর্যাদা দিয়েছেন'* অনুরূপভাবে সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ[২২] তাফসীর ফী যিলালিল কুরআনে 'একজনকে আরেকজনের উপর বিশেষ মর্যাদা (বৈশিষ্ট্য)'র কথা বলেছেন।

'নারীর তুলনায় পুরুষ শ্রেষ্ঠ'-এ বক্তব্য যদি প্রতিষ্ঠিত সত্য বলে ধরে নেয়া হয়, তাহলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় যে, নারীর যা আছে তার সবই পুরুষেরও আছে। পক্ষান্তরে পুরুষের এমন বিশেষ কিছু আছে যা নারীর নেই। বিপরীতভাবে বলা যায় নারীর মধ্যে এমন কিছু নেই যা পুরুষের নেই। নারী যা করতে পারে তা সবই পুরুষও করতে পারে, বরং পুরুষ আরো অনেক কিছু করতে পারে যা নারী করতে পারে না। অর্থাৎ পুরুষের উপর নারীর কোন শ্রেষ্ঠত্ব বা বৈশিষ্ট্য নেই।

কিন্তু এমন একটি সিদ্ধান্ত দৃশ্যমান সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ নারী সন্তান ধারণ ও সন্তানকে স্তন্য দান করতে পারে, কিন্তু পুরুষ তা পারে না। আবার নারী যে কোমল অন্তকরণ দিয়ে সন্তান লালন-পালন করে, পুরুষের পক্ষে তা কখনই সম্ভব নয়। পুরুষ অবলীলাক্রমে স্ত্রী-সন্তান সবাইকে পরিত্যক্ত করে হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে পারে। পক্ষান্তরে নারীকে দেখা যায় নিজেকে অভুক্ত রেখে সন্তানের আহার্যের সংস্থান করতে। নিজেকে বঞ্চিত করে সন্তানের বস্ত্রের আয়োজন করতে। এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব বা বিশিষ্টতা যা-ই হোকনা কেন, তা একান্তভাবেই নারীর এবং এটাই বাস্তবতা।

তাছাড়া শ্রেষ্ঠত্ব বা বৈশিষ্ট্য শব্দ দু'টিকে সমার্থবোধক মনে করে ব্যবহার করাটাও বিভ্রান্তিকর। দু'টি পরস্পর তুলনীয় বস্তু বা গুণের মধ্যে কোনটির

www.pathagar.com

তুলনায় কোনটি শ্রেয়তর তা যে কোন নিরপেক্ষ বিচারক অনায়াসে বলতে পারেন। কিন্তু দু'টি আলাদা বৈশিষ্ট্য কখনও পরস্পর তুলনীয় হতে পারে না। কারণ, প্রতিটি আলাদা বৈশিষ্ট্যই ভিন্ন ভিন্ন ফল উৎপন্ন করে। উদাহরণস্বরূপঃ দু'জন মুফাসসিরের (কুরআন বিশেষজ্ঞ, ব্যাখ্যাকার) মধ্যে কে শ্রেয়তর, তা একজন নিরপেক্ষ ও বোদ্ধা পাঠক মাত্রই অনুধাবন করতে পারবেন। কিন্তু একজন মুফাসসির ও একজন মুহাদ্দিসের (হাদীস বিশেষজ্ঞ) মধ্যে পরস্পরের উপর শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্নটি কখনই উত্থাপিত হতে পারে না। কারণ, এক্ষেত্রে দু'জন সম্পূর্ণ দুটি আলাদা বৈশিষ্ট্য ধারণ করছেন। আর দু'টি আলাদা বৈশিষ্ট্য কখনই পরস্পর তুলনীয় হতে পারে না।

কথিত বাক্যাংশ দ্বারা আমরা যদি বুঝি আল্লাহ পুরুষকে নারীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, তাহলে আমাদের এক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি বা মানসিকতার সৃষ্টি হবে। পক্ষান্তরে যদি আমরা বুঝি, আল্লাহ নারী ও পুরুষ পরস্পরকে পরস্পরের উপর বিশিষ্টতা দান করেছেন, তাহলে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার সৃষ্টি হবে। দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি আমাদেরকে সত্যের দিকে পরিচালিত করবে। অপরদিকে প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি শুধু যে বর্তমান আয়াতের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি করবে তা নয়, কুরআনের আরও অনেক আয়াতের ব্যাখ্যায় দুর্বোধ্যতার জন্ম দেবে। আল্লাহ বলেনঃ

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ

নারীদের তেমন ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের; কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের একমাত্রা মর্যাদা বেশি আছে। ২:২২৮ (অংশ)। *নারীর তুলনায় পুরুষ শ্রেষ্ঠ* এবং *নারী ও পুরুষের অধিকার সমান* দুটি বক্তব্য সমার্থক নয় এবং আল্লাহর কালাম অবশ্যই এই বৈপরীত্য থেকে মুক্ত। আল্লাহ আরও বলেনঃ

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۖ

অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, 'আমি তোমাদের মধ্যে কোন কর্মে-নিষ্ঠ নর অথবা নারীর কর্ম বিফল করি না; তোমাদের একে অপরের সমান' ৩:১৯৫(অংশ)।

www.pathagar.com

পুরুষ নারীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ এবং পুরুষ ও নারী একে অপরের সমান– এদু'টি বিপরীতার্থক কথা একই গ্রন্থ আল-কুরআনে সহাবস্থান একেবারেই অসম্ভব। আল্লাহ পাক অন্যত্র আরো বলেন:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ

মুমিন এবং মুমিনা (ঈমানদার নারী ও পুরুষ) পরস্পরের আউলিয়া (বন্ধু, পৃষ্ঠপোষক)। ৯:৭১(অংশ)

কিন্তু এ ধারণা যদি আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, আল্লাহ নারীর উপর পুরুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, তাহলে নারী ও পুরুষ পরস্পরের আউলিয়া হবে কেমন করে? যে শ্রেয়তর, সে নিশ্চয় নিকৃষ্টতরকে আউলিয়া হিসাবে গ্রহণ করতে রাজি হবে না।

এখন দু'টি আয়াত পর্যালোচনা করা যাক, যেখানে 'ফাদ.দালাল্লাহু বা'দাহুম 'আলা বা'দিন' এ আয়াতাংশটির শব্দসমূহ প্রায় হুবহু ব্যবহার করা হয়েছে।

৪.১.১. শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ-১

পবিত্র কুরআনে আল্লাহতা'য়ালা বলছেন:

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۘ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّـهُ ۖ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ

এই রাসূলগণ, তাদের মধ্যে কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব (বৈশিষ্ট্য) দিয়েছি; তাদের মধ্যে এমন কেহ আছেন, যাঁর সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন, আবার কাউকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন; মারিয়াম তনয় ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করেছি ও পবিত্র আত্মা দ্বারা শক্তিশালী করেছি। ২:২৫৩ (অংশ)

দেখা যাচ্ছে ই.ফা.বা. প্রকাশিত 'কুরআনুল করীম'[২৩]-এ কথিত বাক্যাংশের অর্থ উপরোক্ত অনুবাদেও 'কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব' করা হয়েছে। শুধু এ অনুবাদে নয়, অপরাপর বেশ কয়েকটি অনুবাদ এবং ব্যাখ্যায় 'ফাদ.দাল' শব্দটি দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব বা মর্যাদা (তাফহীমুল কুরআন, মারেফুল কোরআন দ্রষ্টব্য)

www.pathagar.com

বোঝানো হয়েছে। অথচ উপরোক্ত আয়াতাংশে আল্লাহতা'য়ালা দু'জন রাসূলের মধ্যে কাকে কোন্ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে পাঠিয়েছেন, তা স্পষ্টভাষায় বর্ণিত রয়েছে। তা সত্ত্বেও যদি কেউ বলেন একজন রাসূলের তুলনায় অপরজন শ্রেয়তর, তাহলে কার তুলনায় কে শ্রেয়তর সে তথ্যও কুরআন মাজীদ থেকে দলিল সহকারে তুলে ধরা আবশ্যক। তাহলে সন্দেহাতীতভাবে জানা যাবে আল্লাহতা'য়ালা কথা বলার মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোন রাসূলকে অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। অথবা পবিত্র আত্মা দিয়ে শক্তিশালী করার মাধ্যমে ঈসা(আঃ)কে অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে রাসূলদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব বা মর্যাদার পরিমাপ করা মানবীয় ক্ষমতার অতীত। এমন কি একজন রাসূলের সাথে আল্লাহর কথা বলা এবং অপরজনকে পবিত্র আত্মা দিয়ে শক্তিশালী করার এ দু'টি ক্রিয়ার মধ্যে কোনটি অধিক মর্যাদা বা শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক তা নির্ণয়ও মানবীয় সাধ্যের অতীত। সত্য কথা এই যে, আল্লাহর এসব দানের কোনটিই শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন নয়, বরং বিভিন্ন রাসূলকে প্রদত্ত বিশেষ বৈশিষ্ট্য মাত্র। এ কারণেই রাসূলদের মধ্যে তারতম্য না করার জন্য স্বয়ং আল্লাহতা'য়ালা বলছেনঃ

كُلٌّ آمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ

সবাই ঈমান আনে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলদের উপর। তারা বলে, 'আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য (ফারাক) করি না।' ২:২৮৫(অংশ)

এছাড়াও কুরআন মজীদের আরও তিনটি স্থানে আল-বাকারাঃ ১৩৬, আলে-ইমরানঃ৮৪ ও আন-নিসাঃ ১৫২ আয়াতে, রাসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ নির্দেশের মুকাবিলায় কুরআন মাজীদে এমন একটি বাণীও নেই যার দ্বারা কোন একজন নবী-রাসূলকে অন্য নবী-রাসূলের চাইতে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করা যায়। সহীহ আল-বুখারীর[২৪] কিতাবুল আম্বিয়াতে অন্ততপক্ষে ষোলটি হাদীস রয়েছে, যেগুলোতে ইব্রাহীম (আঃ), ইউসুফ (আঃ), ইউনূস (আঃ) ও মূসা (আঃ)কে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর নিজের উপর স্থান দিয়েছেন এবং কেউ যেন এঁদেরকে তাঁর নিচে স্থান না দেয় সে ব্যাপারে বিশেষ তাগিদ দিয়েছেন। হতে পারে যে, এটি আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)এর বিনয়। প্রকৃত শ্রেষ্ঠ যিনি, তিনিই বিনয় দেখাতে পারেন। কিন্তু এটিই আমাদের

www.pathagar.com

নবীর শিক্ষা, শ্রেষ্ঠত্ববোধের অহংকার প্রদর্শন করা চলবে না। বরং অহংকারবর্জিত বিনয়ী বিনম্র মানুষে পরিণত হতে হবে। প্রাসঙ্গিক একটি হাদীস এখানে উদ্ধৃত হলো:

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "এক ইয়াহুদী নিজস্ব কিছু মাল সামগ্রী বিক্রি করছিলেন। বিনিময়ে তাঁকে এমন দাম দেয়া হচ্ছিল, যা তিনি পছন্দ করলেন না। তিনি বললেন, 'না, ঐ সত্তার কসম, যিনি মূসাকে সমগ্র মানবজাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।" এ কথাটি একজন আনসার শুনলেন। তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাঁর মুখের উপর এক চড় মারলেন। অতঃপর বললেন, 'আপনি বলছেন, ঐ সত্তার কসম, যিনি মূসাকে মানবজাতির উপর মর্যাদা দান করেছেন। অথচ, নবী (সাঃ) আমাদের সামনে বিদ্যমান।' ইয়াহুদী লোকটি নবী (সাঃ)এর খিদমতে আসলেন এবং বললেন, 'হে আবুল কাসেম! নিশ্চয়ই আমার জন্য নিরাপত্তা ও ফরমান রয়েছে (অর্থাৎ আমি একজন জিম্মি)? সুতরাং অমুক ব্যক্তির কি হলো, কি কারণে তিনি আমার মুখে চড় মেরেছেন?' তখন নবী (সাঃ) (তাকে) জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন আপনি তাঁর মুখে চড় মারলেন' তিনি ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। (তা শুনে) নবী (সাঃ) খুব অসন্তুষ্ট হলেন। এমনকি তাঁর চেহারায় তা প্রকাশ পেল। তারপর তিনি (সাঃ) বললেন, 'আল্লাহর নবীগণের মাঝে কাউকে কারো উপর মর্যাদা দান করবেন না। কেননা, (কিয়ামাতের দিনে) যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন আল্লাহ যাকে চাইবেন, সে ব্যতীত আসমান-জমিনের আর সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে। পুনরায় তাতে দ্বিতীয়বার ফুঁক দেয়া হবে। তখন সর্বপ্রথম আমাকেই উঠানো হবে। আমি (উঠেই) দেখবো, মূসা(আঃ) আরশ ধরে রয়েছেন। আমি বলতে পারবো না, কোহে তূরের (ঘটনার) দিন তিনি বেহুঁশ হয়েছিলেন, এটা কি তারই বিনিময়, না আমারই আগে তাঁকে উঠানো হয়েছে। আর আমি এ কথাও বলি না যে, কোন ব্যক্তি ইউনূস ইবনে মাত্তার চেয়ে অধিক মর্যাদাবান।'" সহীহ আল-বুখারী[২৫]।

সূরা আল-বাকারার ২৫৩ আয়াতে 'শ্রেষ্ঠত্ব' শব্দটির পরিবর্তে যদি 'বিশিষ্টতা' বা 'বৈশিষ্ট' ব্যবহার করা হয়, তাহলে মুহূর্তেই সব স্ববিরোধিতা ও জটিলতার অবসান ঘটে এবং দৃষ্টিভঙ্গিও পরিবর্তীত হয়ে যায়। 'ফাদদাল' শব্দটি মূল আরবী শব্দ 'ফাদ্.ল্' থেকে উৎপন্ন। আর এই 'ফাদ্.ল্' শব্দটি আমরা বাংলায় প্রায়শঃই 'ফজল' বলে ব্যবহার করে থাকি। যেমন বলি 'আল্লাহর ফজলে' বা 'খোদার ফজলে' অর্থাৎ 'আল্লাহর অনুগ্রহে'। অর্থাৎ 'ফাদ্.ল্' শব্দটির প্রকৃত অর্থ

www.pathagar.com

অনুগ্রহ। আর 'ফাদ্‌ল্' থেকে যখন ফাদ্‌ দাল হয়, তখন এর অর্থ দাঁড়ায় 'বিশেষ অনুগ্রহ'। একইভাবে 'ফাদ্‌ দালাল্লাহু' অর্থ দাঁড়ায় 'আল্লাহ বিশেষভাবে অনুগ্রহ করেছেন' এবং 'ফাদ্‌ দালালনা' অর্থ 'আমরা বিশেষভাবে অনুগ্রহ করেছি'। মূল আরবী শব্দের সূত্র ধরে এগিয়ে গেলে আমরা দেখতে পাই আল্লাহ এক একজন নবীকে এক একটি বিশেষ অনুগ্রহে ধন্য করেছেন, যেমন কারো সাথে কথা বলেছেন, কাউকে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন, কাউকে পবিত্র আত্মা দিয়ে শক্তিশালী করেছেন। অনুরূপভাবে আল্লাহতা'য়ালা পুরুষকে দান করেছেন এক বিশেষ অনুগ্রহ এবং নারীকে এক বিশেষ অনুগ্রহ। এটা খুব সহজেই অনুধাবন করা যায় যে বস্তুতঃ আল্লাহর একটি বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করা মানেই একটি বিশিষ্টতা অর্জন করা বা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়া। পুরুষ এবং নারীর প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ অনুগ্রহের অদৃশ্য কোন তাৎপর্য হয়তো থাকতে পারে, তবে দৃশ্যতঃ পুরুষের শারীরিক শক্তি এবং নারীর কোমল অন্তকরণ ও মাতৃত্ব যে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

৪.১.২. শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ-২

সূরা আন-নিসার ৩২ আয়াতে আল্লাহতা'য়ালা বলছেন:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّـهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّـهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

যদ্বারা আল্লাহ তোমাদের কাউকে কারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব (বৈশিষ্ট্য) দান করেছেন, তোমরা তার লালসা করো না। পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ। আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহাত'য়ালা সকল বিষয় অবগত। ৪:৩২

এ অনুবাদটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ কর্তৃক অনূদিত 'কুরআনুল করীম'[২৬]-এর এবং এখানে 'ফাদ্‌ দাল' শব্দটির অর্থ শ্রেষ্ঠত্ব করা হয়েছে। অপরাপর আরো কয়েকটি অনুবাদ এবং ব্যাখ্যায় শব্দটির অর্থ শ্রেষ্ঠত্ব (মারেফুল কোরআন[১৮], ইবনে কাছীর[১৩] দ্রষ্টব্য) বলে বোঝাবার প্রয়াস দেখা যায়। আর

www.pathagar.com

এ শ্রেষ্ঠত্ব যে নারীর উপর পুরুষের তার সপক্ষেও যুক্তি পেশ করা হয়। কিন্তু এ ধরনের অর্থ বা ব্যাখ্যা অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর।

ইতোপূর্বে উল্লেখিত আল-বাকারা:২২৮, আলে-ইমরান:১৯৫ ও আত-তাওবা: ৭১ এ আয়াত তিনটির প্রতি আর একবার দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, আল্লাহতা'য়ালা পৌনঃপুনিকভাবে ঘোষণা করেছেন যে পুরুষ এবং নারীর মধ্যে কার্যত কোন ভেদাভেদ নাই। আল্লাহপাক আরও বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّـهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّـهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

হে মানুষ, আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে। পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক তাকওয়াসম্পন্ন (আল্লাহভীরু) ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানিত। ৪৯:১৩

একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকেই পৃথিবীর তাবৎ মানুষের সৃষ্টি। এ কথাটি কুরআন পাকে বারে বারে বলা হয়েছে। আর এ বলার অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে এটিও একটি যে কেউ যেন এমন ধারণা কখনও পোষণ না করে, পুরুষ নারীর তুলনায় শ্রেয়তর। আল্লাহপাক কাউকে নারী করেছেন, কাউকে পুরুষ করেছেন; আবার কাউকে সাদা করেছেন, কাউকে কালো করেছেন; কাউকে ধনী করেছেন, কাউকে দরিদ্র করেছেন এবং মানুষকে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে দিয়েছেন। এখানে মানুষের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের কোন সুযোগ নেই, সব কিছু স্বয়ং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার একান্ত ইচ্ছাতেই ঘটে থাকে। কিন্তু নারী-পুরুষ, সাদা-কালো, ধনী-দরিদ্র, ইত্যাকার সকল অবস্থাতেই মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ বিরাজমান। কেউ সাদা কিংবা পুরুষ কিংবা ধনী বলে যে আল্লাহর নৈকট্য বা বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করবে, তা কখনই নয়। বরং আল্লাহভীতি তথা তাকওয়া অন্তরে জাগ্রত রেখে, আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহের সর্বাধিক এবং যৌক্তিক ব্যবহারই আল্লাহর নৈকট্য এবং সন্তুষ্টি লাভের একমাত্র উপায়। বস্তুতঃ তাকওয়াই হচ্ছে আল্লাহর নিকট শ্রেষ্ঠত্ব বা মর্যাদার একমাত্র নির্ণায়ক।

এই ব্যাখ্যার আলোকে 'ফাদ্.ল্' শব্দটির অর্থ শ্রেষ্ঠত্ব না বলে (যেমন ই.ফা.বা. অনূদিত কুরআনুল করীম এবং অপরাপর অনুবাদে করা হয়েছে) যদি বিশেষ

www.pathagar.com

অনুগ্রহ বা বৈশিষ্ট্য বলা হয়, তাহলে আন-নিসা: ৩২ আয়াতটির অর্থ দাঁড়াবে: *'যদ্বারা আল্লাহ তোমাদের কারো উপর অন্য কাউকে বিশেষ অনুগ্রহ (বা বৈশিষ্ট্য) দান করেছেন, তোমরা তার লালসা করো না।'* আল্লাহর এই বিশেষ অনুগ্রহের সর্বোচ্চ ব্যবহার দ্বারা পুরুষ অথবা নারী অথবা যে কোন ব্যক্তিই যা অর্জন করবে তা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে নির্দিষ্ট ব্যক্তিরই প্রাপ্য। নারী বা পুরুষ হওয়ার কারণে বা সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা হেতু ইবাদাত-আমল বা অন্য কোন উপার্জনের ক্ষেত্রে কোন তারতম্য হবে না। নারী যখন তার নারীত্বকে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ হিসাবে দেখবে তখন তার পুরুষ হয়ে জন্ম গ্রহণ করার বা পুরুষের কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য কিংবা অধিকার অর্জনের লালসা করবে না। অনুরূপভাবে পুরুষ যদি তার পুরুষত্বকে আল্লাহর একটি বিশেষ অনুগ্রহ হিসাবে দেখে তাহলে নারীত্বের প্রতি বা নারীর কোন অধিকার কিংবা বৈশিষ্ট্যের প্রতি তার ঈর্ষার দৃষ্টি পতিত হবে না; এমনকি তার পৌরুষ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে নারীর উপর অকারণ জুলুমও করবে না।

দেখা গেলো দৃষ্টিভঙ্গিটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নারীকে যে শুধু হীনম্মন্যতাবোধের গ্লানি দিচ্ছে তা নয়, বা পুরুষকে অহমবোধের অর্থহীন গৌরব দিচ্ছে তাও নয়, বরং আল্লাহর কালাম কুরআনপাকের বাণীর মধ্যেও বৈপরীত্য আরোপ করছে। অপরদিকে ভিন্ন একটি দৃষ্টিভঙ্গি দিচ্ছে মানুষে মানুষে ভেদাভেদহীনতার এবং আল্লাহু সুবহানাহু তা'য়ালার শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা।

এই ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমরা যদি সূরা আন-নিসার আলোচ্য আয়াতের প্রথমাংশটি আবার অনুধাবনের চেষ্টা করি তাহলে দেখতে পাই, আল্লাহ বলছেন:

> *পুরুষ নারীর ভরণপোষণকারী (অভিভাবক, তত্ত্বাবধায়ক)। কারণ আল্লাহ তাদের পরস্পরকে পরস্পরের উপর বিশেষ অনুগ্রহ (বৈশিষ্ট্য) দান করেছেন এবং কারণ পুরুষ তার ধন সম্পদ ব্যয় করে।*

৪.১.৩. ভরণপোষণ ও অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পুরুষকে প্রদানের কারণ

আল্লাহ পুরুষকে পরিবার তথা নারীসহ অপরাপর সদস্যদের ভরণপোষণ এবং অভিভাবকত্বের দায়িত্ব প্রদানের দু'টি কারণ জানাচ্ছেন। একটি কারণ হলো পুরুষকে প্রদত্ত আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ বা বৈশিষ্ট্য, যেটি এ কাজের জন্য উপযুক্ত। আল্লাহ মহাজ্ঞানী; পুরুষকে প্রদত্ত আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের ব্যাপারে তিনিই সমধিক জ্ঞাত, তবে দৃশ্যতঃ সেটি পুরুষের শারীরিক শক্তি বলেই প্রত্যয়

www.pathagar.com

হয়। অভিভাবকত্ব প্রদানের দ্বিতীয় কারণ- পুরুষ তার পরিবারের জন্য অর্থাৎ নারীসহ অপরাপার সকল সদস্যের জন্যও ব্যয় করে। অর্থাৎ ভরণপোষণ ও অভিভাবকত্ব গ্রহণের উপযুক্ত করে পুরুষকে শারীরিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, অভিভাবকত্ব করার জন্য শক্তিশালী হওয়া এবং অর্থনৈতিক দায়িত্বই কি যথেষ্ট? আজকের দুনিয়ার বাস্তবতার দিকে তাকালে দেখা যাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সারা দুনিয়ার উপর অভিভাবকত্ব-কর্তৃত্ব চালিয়ে যাচ্ছে কেবলমাত্র তার সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তির বলে। কিন্তু ঈমান ও তাকওয়াবিহীন অভিভাবকত্ব নিতান্তই শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে পর্যবসিত হয়। ফলে তখন অধীনস্থদেরকে অন্যায় আদেশ পালনের মাধ্যমে অনুগত হতে বাধ্য করা হয় এবং বশংবদদের দ্বারা অন্যায়কে ন্যায় বলে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। বস্তুতঃ ইসলাম পুরুষকে উপরোক্ত দুটি বৈশিষ্ট্য প্রদানকরতঃ ঈমান ও তাকওয়া সম্বলিত অভিভাবকত্বের দায়িত্ব দিচ্ছে। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ববোধপ্রসূত অহংকারের সুযোগ দেয় না, কারণ এটি ঈমান এবং তাকওয়ার পরিপন্থী।

তাছাড়া অভিভাবকত্ব নিতান্তই একটি দায়িত্ব মাত্র। অপরদিকে শ্রেষ্ঠত্ববোধ থেকে জন্ম নেয় প্রভুত্ববোধ, অহংকার ইত্যাদি। এ শ্রেষ্ঠত্ববোধ থেকে মানুষে মানুষে প্রভু-ভৃত্য, রাজা-প্রজা, দেবতা-ভক্ত, পূজ্য-পূজারী, ইত্যাদি সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। এতে ক্ষুণ্ন হয় সামাজিক সাম্য এবং মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ববোধ। অতঃপর শুরু হয় দলে-উপদলে বিভক্তি এবং বিভিন্ন মত ও পথের সৃষ্টি। শ্রেষ্ঠত্ববোধে আদৌ কোন কল্যাণ নেই। ইসলাম বলে এক রাব্বুল আলামীন আল্লাহ ছাড়া মানুষের আর কোন প্রভু নেই। অতএব, আল্লাহর সৃষ্টি কোন মানুষ অপর কোন পুরুষ বা নারীর তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব এবং তদর্থে প্রভুত্ব দাবি করতে পারে না। দেখা যাচ্ছে, আল্লাহতা'য়ালা পুরুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটির তথা স্ত্রীর উপর প্রভুত্ব দান করেন নি, বরং তাকে যথাযথ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং উপযুক্ত অনুগ্রহ প্রদান করে এ প্রতিষ্ঠানের অভিভাবকত্ব এবং সদস্যদের ভরণপোষণের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

অতঃপর সঙ্গতভাবেই পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটিতে নারীর মর্যাদা এবং ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রথমতঃ পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে নারীর মর্যাদার ব্যাপারে কুরআন মাজীদের বক্তব্য দিবালোকের মত স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন। নিম্নোক্ত আয়াত কারীমাসমূহে (পূর্বোল্লেখিত) আল্লাহতা'য়ালা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, মর্যাদার দিক থেকে নারী এবং পুরুষ সকল

www.pathagar.com

বিবেচনায় একে অপরের সমান। সুতরাং এ ব্যাপারে অধিক ব্যাখ্যা অর্থহীন। *মুমিন এবং মুমিনা পরস্পরের আউলিয়া।* (আত-তাওবা:৭১); *তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদস্বরূপ।* (আল-বাকারা:১৮৭); *আমি তোমাদের মধ্যে কর্মনিষ্ঠ কোন নর অথবা নারীর কর্ম বিফল করি না, তোমরা একে অপরের সমান।* (আলে-ইমরান:১৯৫) *নারীদের তেমন ন্যায় সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের, কিন্তু তাদের উপর পুরুষদের একমাত্রা মর্যাদা বেশি আছে।* (আল-বাকারা:২২৮)।

দ্বিতীয়তঃ পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানে নারীর ভূমিকা কি বা তার অবস্থান কোথায়? নারী কি পরিবারের ভরণপোষণ বা অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালন করতে পারে না? অথবা নারী এবং পুরুষ উভয়ে কি যৌথভাবে পরিবারের ভরণপোষণ এবং অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালন করতে পারে না? এসব প্রশ্ন অত্যন্ত সঙ্গত এবং এগুলি উত্থাপন অত্যন্ত স্বাভাবিক।

এসব প্রশ্নের জবাব অনুসন্ধানের পূর্বে পরিবারের চাইতে বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানগুলির দিকে একবার দৃষ্টি দেয়া যাক। গোষ্ঠীবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরিবার হচ্ছে ক্ষুদ্রতম। বিশ্বজুড়ে প্রতিটি সমাজ এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন আকার-আয়তনের প্রতিষ্ঠান বিরাজমান। এসব প্রতিষ্ঠানের প্রতিটিরই এক-একটি পরিচালনা পরিষদ থাকে। পরিচালনা পরিষদের নেতৃত্বে থাকে প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী। প্রধান নির্বাহীর নেতৃত্বে পরিষদ এবং পুরো প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয়।

একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান কখনো দু'জন ব্যক্তি হয় না। অথবা পরিচালনা পরিষদের একই পদে কখনো দু'জন ব্যক্তিকে নির্বাচিত করা হয় না। একটি রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কিংবা প্রধানমন্ত্রী কখনো একই সাথে দু'জন ব্যক্তি হয় না। যদি কখনো তেমন হয়, তাহলে সংঘাত সেখানে অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে। প্রতি পদে, প্রতিক্ষণে সংঘাত হবে ব্যক্তিত্বের, নেতৃত্বের এবং শ্রেষ্ঠত্বের। ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্টদের স্বার্থ পদে পদে ক্ষুণ্ন হবে এবং জীবন বিপর্যস্ত হবে। আবার রাষ্ট্র কিংবা কোন প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব প্রদান বা পরিচালনার জন্য নির্বাচিত ব্যক্তি যে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিকেই হতে হবে তাও কিন্তু নয়। বরং নির্বাচকেরা যার মধ্যে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার বা নেতৃত্ব প্রদানের সর্বাধিক গুণাবলী রয়েছে বলে বিবেচনা করে, তাকেই নির্বাচন করে থাকে। আবার নির্বাচিত নেতা বা পরিচালকের থাকে এক বা একাধিক সহযোগী। যেমন প্রেসিডেন্টের সহযোগী ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রীর সহযোগী

www.pathagar.com

মন্ত্রী পরিষদের অপরাপর সদস্যগণ। প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা-শান্তি-সুখ-সমৃদ্ধি তখনই কেবল নিশ্চিত হতে পারে, যখন যোগ্যতম প্রধান-নির্বাহী নির্বাচিত হয় এবং সকল সহযোগীসহ প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরের সদস্যরা নির্বাচিত নেতার নেতৃত্ব নির্দ্বিধায় মেনে নেয়।

অভিভাকত্ব বা নেতৃত্বের ব্যাপারে ইসলামের সিদ্ধান্তও অভিন্ন। প্রতিষ্ঠান ছোট বা বড় যেমনই হোক না কেন, এর একজন প্রধান নির্বাহী থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে সুন্দর কয়েকটি হাদীস পাওয়া যায়।

১. *ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'এক রাতে আমি আমার খালা নবীর (সাঃ) স্ত্রী মায়মুনা বিনতে হারিসের ঘরে শুয়েছিলাম। আর ঐ রাতে নবী (সাঃ)ও তাঁর কাছে ছিলেন। নবী (সাঃ) ইশার সালাত শেষে তাঁর ঘরে গেলেন এবং সেখানে চার রাকাত সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি ঘুমালেন। এরপর তিনি উঠে বললেন, 'বাচ্চাটা (বা ঐরূপ কোন শব্দ) ঘুমিয়ে পড়েছে।' তারপর তিনি সালাত কায়েমের জন্য দাঁড়ালেন। আমি তাঁর বামদিকে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে তাঁর ডানদিকে সরিয়ে এনে পাঁচ রাকাআত সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি ঘুমালেন। এমনকি আমি তাঁর নাকডাকা শুনতে পেলাম। তারপর তিনি ফযরের সালাতের জন্য বের হয়ে গেলেন।' সহীহ আল-বুখারী*[২৭]

২. *আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সাঃ) বলেছেন, 'আপনারা শ্রবণ করুন এবং আনুগত্য করুন; যদিও আপনাদের উপর কোন হাবশী ক্রীতদাসকেও আমীর নিযুক্ত করা হয় এবং তার মাথা দেখতে আঙ্গুরের মত ক্ষুদ্রও হয় (যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আল্লাহর আনুগত্যের বরখেলাফ কোন নির্দেশ দেয়।)' সহীহ আল-বুখারী সূত্রে রিয়াদুস সালেহীন*[২৮]

৩. *আবু সাঈদ আল খুদরী (রাঃ) ও আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে ভিন্ন ভিন্ন সনদে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, 'যখন তিন ব্যক্তি কোথাও সফরে বের হয়, তখন তারা তাদের মধ্য থেকে একজনকে যেন আমীর (নেতা) মনোনীত করে নেয়।' আবু দাউদ*[২৯]

প্রথম হাদীসটিতে আমরা জানতে পারি যে, মাত্র দু'জনে মিলে সালাত কায়েম করতে দাঁড়ালেও একজনকে ইমাম বা নেতা বানিয়ে নেয়া কর্তব্য। অর্থাৎ যে কাজ দলবদ্ধভাবে সমাধা করতে হয়, তা একজনের নেতৃত্বে সম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয় হাদীসটি আমাদের জানাচ্ছে, নেতা যে-ই হোক না কেন, তার নেতৃত্ব মেনে নেয়া অপর সকলের একান্ত কর্তব্য। তৃতীয় হাদীসটিতে

www.pathagar.com

তিনজনের দলের কথা বলা হলেও প্রকৃত পক্ষে হাদীসটির অন্তর্নিহিত বক্তব্য এটিই যে, একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত দলে একজন নেতা থাকতেই হবে।

ইসলামের এটিই সিদ্ধান্ত, দল বা গোষ্ঠীতে একাধিক সদস্য থাকলে তার একজন নেতা থাকবে। নেতা যে-ই হোক, অন্যরা তার নেতৃত্ব বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে বাধ্য থাকবে। একটি পরিবারের সার্বিক কর্মকাণ্ড কেবল একজন ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। এখানে বিভিন্ন সদস্য বিভিন্নভাবে নিজ নিজ ভূমিকা রাখে। সবার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে তখনই, যখন একজনের অভিভাবকত্বে বা নেতৃত্বে পরিবারটির কার্যাবলী পরিচালিত হয়। সুতরাং পরিবারে একাধিক সদস্য থাকলে সেখানে একজন নেতা বা অভিভাবক থাকবে, এটাই আল্লাহপাকের নির্দেশ।

অতঃপর প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, পরিবারের ভরণপোষণ বা অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পুরুষকে দেয়া হলো কেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী পদে কখনো কখনো নারীকে অধিষ্ঠিত দেখা যায়। অনেক রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী; বিভিন্ন সংস্থার প্রধান নির্বাহী পদে নারীকে আজকাল প্রায়শঃই দেখা যায়। সুতরাং পরিবারের প্রধান নির্বাহী নারীর হতে আপত্তি কোথায়? রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের প্রতিদিনের প্রত্যেক বেলার অন্ন ও পরিধানের বস্ত্র সংস্থান কিংবা মাথা গোঁজার ঠাঁই এবং অসুস্থতায় চিকিৎসার দায়িত্ব রাষ্ট্রপ্রধানের উপর আক্ষরিক অর্থে বর্তায় না। যদিও অন্ন-বস্ত্র-আবাস-চিকিৎসা ইত্যাদির আয়োজনে রাষ্ট্র দায়িত্বশীল, তবু সে দায়িত্ব সরাসরি একজন ব্যক্তির উপর বর্তায় না। বরং একটি সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থার মাধ্যমে সে দায়িত্ব প্রতিপালিত হয়। একই বক্তব্য অপরাপর সকল প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার ক্ষেত্রে সমধিক প্রযোজ্য।

কিন্তু পরিবারের ভরণপোষণ বা অভিভাবকত্বের দায়িত্বে যে নিয়োজিত, তাকে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের প্রতিদিনের অন্নের সংস্থান তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত করতে হয়। এছাড়াও পরিবারের প্রতিটি সদস্যের বাসস্থান-বস্ত্র-চিকিৎসা-শিক্ষা-নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান আমৃত্যু করে যেতে হয়। এটি খুব সহজেই অনুধাবনযোগ্য যে, একজন নারীর পক্ষে সর্বাবস্থায় সকল পরিবেশে বিরামহীনভাবে পরিবারের সকল সদস্যের চাহিদাসমূহ পূরণ করে যাওয়া সম্ভব নয়। সন্তান-ধারণ, সন্তান-প্রসব এবং জন্মের পর সন্তান লালন-পালনের প্রাথমিক দায়িত্ব প্রাকৃতিকভাবেই নারীর উপর ন্যস্ত। এটি নারীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য, আল্লাহতা'য়ালা এটি কেবল নারীকেই দিয়েছেন, পুরুষকে দেননি। এ প্রক্রিয়াটি এমন যে, প্রত্যেক সন্তানের ক্ষেত্রে চার-পাঁচ বছর, কখনোবা তার

www.pathagar.com

চাইতে বেশি সময় নারীর স্বাভাবিক জীবনযাপন পদ্ধতির উপর সীমাবদ্ধতা নেমে আসে। ফলে পরিবর্তন আসে নারীর শারীরিক সক্ষমতা এবং ভাবাবেগজনিত বহিঃপ্রকাশে। এ সময়ে নারী বিশেষভাবে শ্রম-নির্ভর কাজে সক্ষম থাকে না। ফলে অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পরিবারের সকল সদস্যের অন্ন-বস্ত্র-চিকিৎসা-নিরাপত্তাসংশ্লিষ্ট নিত্যনৈমিত্তিক সকল চাহিদা তাৎক্ষণিকভাবে পূরণ করা সকল নারীর পক্ষে সম্ভব হবে না। এতদসত্ত্বেও পরিবারের অভিভাবক হিসাবে এটি নারীর সীমাবদ্ধতা হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, তার অযোগ্যতা নয় কোনমতেই।

অপরদিকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ইসলাম নারীর উপর কোন বাধা নিষেধ আরোপ করেনি। অর্থোপার্জনের লক্ষ্যে যে কোন বৈধ পেশা নির্বাচন এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নারী সম্পূর্ণ স্বাধীন। সূরা আন-নিসার ৪, ১১, ১২, ৩২ এবং আত-তাওবার ৭১ আয়াত এ ব্যাপারে কুরআন মাজীদের দ্ব্যর্থহীন দলিল। আয়াতসমূহ থেকে প্রসঙ্গক্রমে একটি এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ

তোমাদের স্ত্রীরা যদি নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে তাদের ছেড়ে যাওয়া সম্পত্তির অর্ধেক হবে তোমাদের। যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে তাদের ছেড়ে যাওয়া সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ হবে তোমাদের। (এ বিলি বন্টন হবে) ওসিয়াতের পর যা তারা করে এবং ঋণ (যদি থাকে, তা) পরিশোধের পর। আর তোমাদের ছেড়ে যাওয়া সম্পত্তির এক চতুর্থাংশের অধিকারিণী হবে তোমাদের স্ত্রীরা, যদি তোমরা নিঃসন্তান হও। আর তোমাদের সন্তান থাকলে তারা পাবে আট ভাগের এক ভাগ। (এ বিলি বন্টন হবে) ওসিয়াতের পর যা তোমরা করেছো এবং ঋণ (যদি থাকে, তা) পরিশোধের পর। আন-নিসা:১২ (অংশ)

এ আয়াত থেকে আমরা জানতে পারছি একজন নারী এককভাবে সম্পত্তির অধিকারী হতে পারেন। তার নিজস্ব অর্থনৈতিক প্রয়োজনে তিনি ঋণও গ্রহণ

www.pathagar.com

করতে পারেন। এমনকি উত্তরাধিকারীদের জন্য সমস্ত সম্পদ রেখে না দিয়ে তিনি তার সম্পদ বিধিমোতাবেক এবং আপন সিদ্ধান্তানুযায়ী ওসিয়াত করে যেতে পারেন। অর্থাৎ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে নারী পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেন।

এতদসত্ত্বেও পরিবারের ভরণপোষণ ও অভিভাবকত্বের দায়িত্ব আল্লাহতা'য়ালা পুরুষকে দিয়েছেন। কারণ, আল্লাহতা'য়ালা নিজেই জানাচ্ছেন যে, প্রথমতঃ পুরুষকে তিনি একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যা নারীকে দেননি এবং দ্বিতীয়তঃ পুরুষকে পরিবারের যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের জন্য (ভরণপোষণ) দায়িত্বশীল করে দিয়েছেন। নারীর যত অর্থ-সম্পদ বা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকুক না কেন, পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব থেকে আল্লাহতা'য়ালা নারীকে অব্যাহতি দিয়েছেন।

সৃষ্টিজগতের যাবতীয় প্রাণীকুলের দিকে তাকালে দেখা যাবে মাতৃত্ব নারীর এবং পেশীশক্তি নরের একক সাধারণ বৈশিষ্ট্য। মাতৃত্ব যে নারীর একক বৈশিষ্ট্য, তা নিয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। তবে প্রাণীকুলের মধ্যে পেশীশক্তি সাধারণভাবে নরের একক বৈশিষ্ট্য হলেও ক্ষেত্র বিশেষে ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এমনকি মনুষ্য প্রজাতির মধ্যেও সাধারণতঃ নরের যে দৈহিক শক্তি অধিক হলেও কদাচিৎ ব্যতিক্রম দৃষ্টিগোচর হতেই পারে। পেশীশক্তির সাথে কর্তৃত্বের একটি স্বাভাবিক এবং অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। ইতোপূর্বে বলা হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেবল সামরিক এবং অর্থনৈতিক শক্তির জোরেই সমস্ত বিশ্বের উপর মোড়লগিরি করে চলেছে।

অমুসলিম পাশ্চাত্যের আধুনিকতম পরিবারগুলিতেও, নেতৃত্ব প্রদান বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অর্থের ভূমিকা খোলা চোখে দৃশ্যমান না হলেও পেশীশক্তির ভূমিকা প্রকটভাবে দৃশ্যমান। সেখানে অনেক ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই অর্থোপার্জন করে এবং পরিবারের জন্য ব্যয় করে থাকে। তা সত্ত্বেও পারিবারিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বা দায়িত্ব পালনে পুরুষই অলিখিতভাবে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। অনেকে এটাকে পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি বলে দাবি করতে পারে। আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার সৃষ্টি জগতে এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম, এটাই বাস্তবতা এবং এটাই আল্লাহর বিধান। আল্লাহর বিধান এবং প্রাকৃতিক নিয়মের বৈশিষ্ট্যই এমন যে, লিখিতভাবে বলে না দিলেও এটি বিশ্বাসী-অবিশ্বাসীসহ সৃষ্টিকুলের সকলের মধ্যে আপনিই কার্যকর হতে থাকে।

www.pathagar.com

পেশীশক্তি দ্বারা পুরুষকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে দিয়ে আল্লাহতা'য়ালা বলেননি যে, কেবল এ বৈশিষ্ট্যের কারণেরই পুরুষ পরিবারের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে যাবে। বরং একই সাথে তার উপর আরো দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, সে পরিবারের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবে। এটা আল্লাহতা'য়ালারই সিদ্ধান্ত, পরিবারের অভিভাবকত্ব যার উপর ন্যস্ত থাকবে, সে পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালনেও বাধ্য থাকবে। এ সিদ্ধান্তকে অযৌক্তিক বা অকারণ বলার কোন সুযোগ নেই। শুধু শারীরিক শক্তি বা বাহুবল দিয়ে অভিভাবকত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস বস্তুতঃ দস্যুবৃত্তি বা স্বেচ্ছাচারিতারই নামান্তর। আবার কেবল অর্থনৈতিক সক্ষমতা দিয়েও অভিভাবকত্ব প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। সেক্ষেত্রে দেখা যাবে, পরিবারের পেশীশক্তিসম্পন্ন সদস্য দুর্বত্তের রূপ ধরে প্রায়শঃই হানা দিচ্ছে অথবা কখনো সে অভিভাবকের অভিভাবকত্বই অস্বীকার করছে। অর্থাৎ এককভাবে বাহুবল বা অর্থনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে পরিবারে অভিভাবকত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সার্বিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা বিদ্যমান।

সুতরাং প্রকৃত ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা কেবল সেটিই যেটি আল্লাহতা'য়ালা নির্দেশ করেছেন। পেশীশক্তির প্রাধান্যের কারণে যাবতীয় অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্বসহ পুরুষকে পরিবারের অভিভাবকত্ব ও ভরণপোষণের দায়িত্ব প্রদানের এ নির্দেশটি সাধারণ নির্দেশ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। কখনো যে এর কোন ব্যতিক্রম হতে পারবে না তা কিন্তু নয়। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সময়ে আমরা নারীকে পরিবারের জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে দেখি।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী যয়নব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'একদা আমি মসজিদে নববীতে ছিলাম। তখন আমি নবী(সাঃ)কে দেখলাম যে, তিনি (নারীদের লক্ষ্য করে) বললেন, 'আপনারা আপনাদের অলংকারাদি হলেও দান করুন।' আর যয়নব (তার স্বামী) আবদুল্লাহ এবং যেসব ইয়াতীম তার কোলে ছিল তাদের জন্য ব্যয় করতেন (অর্থাৎ তাদের ভরণপোষণ করতেন)। তিনি (যয়নব) আবদুল্লাহকে (ইবনে মাসউদ) বললেন, 'আপনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে জিজ্ঞেস করুন, আমি যে আপনার এবং যে ইয়াতীমরা আমার কোলে রয়েছে তাদের জন্য ব্যয় করছি, তা কি দান হিসাবে আমার জন্য যথেষ্ট হবে?' তিনি (আবদুল্লাহ) বললেন, 'আপনি (যয়নব) গিয়েই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে জিজ্ঞেস করুন।' তখন আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর নিকট গমন করলাম এবং দরজার নিকট জনৈকা আনসার রমণীকে দেখতে পেলাম। তার প্রয়োজনটাও ছিল আমার প্রয়োজনের মতই। তখন বিলাল (রাঃ) আমাদের নিকট দিয়ে

www.pathagar.com

যাচ্ছিলেন। আমরা তাকে বললাম, 'আপনি নবী (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করুন, আমি যে আমার স্বামী ও যে ইয়াতীমরা আমার কোলে রয়েছে, তাদের জন্য সাদাকা (ব্যয়) করছি তা কি (দান হিসাবে) আমার পক্ষে যথেষ্ট হবে?' এবং আমরা তাকে আরো বললাম, 'নবীর (সাঃ) নিকট) আমাদের নাম বলবেননা।' তখন বিলাল (রাঃ) নবী (সাঃ) এর নিকট গেলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, 'ঐ মহিলা দু'জন কে কে?' বিলাল (রাঃ) বললেন, 'যয়নব।' তিনি (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন যয়নব?' বিলাল (রাঃ) বললেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর স্ত্রী।' তিনি (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ, তার দ্বিগুণ পুণ্য হবে। আত্মীয়তার (হক আদায় করার) পুণ্য এবং সাদাকার পুণ্য।' " সহীহ আল-বুখারী[৩০] ও সহীহ মুসলিম[৩১]।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর ঘনিষ্টতম সাহাবীদের অন্যতম। তিনি প্রায় সার্বক্ষণিকভাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর সাথে ছায়ার মতো থাকতেন। ফলে পরিবার পরিজনের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না। তাঁর স্ত্রী হযরত যয়নব (রাঃ) আপন হস্তে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করে সেগুলি বাজারে বিক্রি করে পরিবারের ভরণপোষণ করতেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদুন নববীতে নারীদের লক্ষ্য করে দান-সাদাকা করার জন্য উপদেশ দিলে যয়নব (রাঃ) বিচলিত হয়ে পড়েন। কারণ, তাঁর সামান্য যেটুকু রোজগার তা পরিবারের ভরণপোষণেই ব্যয় হয়ে যায়। অতঃপর বাড়ি ফিরে তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট থেকে সমাধান জেনে আসার জন্য স্বামীকে অনুরোধ জানালেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর দূরদৃষ্টি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এক্ষেত্রে লক্ষ্য করার মতো। স্ত্রীর অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি নিজে না গিয়ে স্ত্রীকেই বললেন নবীজী (সাঃ)এর নিকট থেকে প্রকৃত তথ্য জেনে আসতে। কারণ, বিষয়টি নারীদের দান-সাদাকা সম্পর্কিত। সুতরাং একজন নারীই যদি সরাসরি শরিয়াত-বাহকের কাছ থেকে এতদ সম্পর্কিত নির্দেশ জেনে নেন, তাহলে সেটিই হবে সবচেয়ে ফলপ্রসূ।

হাদীসটিতে আরো লক্ষণীয়, যয়নব (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর কাছে প্রকৃত তথ্য জানতে গেলেন, তখন তিনি সেখানে আরো একজন মদীনাবাসী নারীকে দেখলেন। ঐ নারীটিও একই উদ্দেশ্যে অর্থাৎ নারীদের দান-সাদাকা সম্পর্কিত সঠিক তথ্য জানার জন্য এসেছিলেন। এখন থেকে ১৪০০ বছর আগে দু'জন অর্থোপার্জনকারী নারী একই উদ্দেশ্যে একই সময়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর গৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন সম্পূর্ণ কাকতালীয়ভাবে। এ ঘটনাটি থেকে

www.pathagar.com

আরো প্রমাণিত হয়, নির্দিষ্ট ঐ সময়ে যয়নব (রাঃ) এবং মদীনাবাসী নারীটি ছাড়াও আরো অনেক নারীই স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জনে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁদের উপার্জিত অর্থ তাঁরা পরিবারের জন্যও ব্যয় করতেন।

যয়নব (রাঃ)এর জিজ্ঞাসার জবাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জানালেন, যে নারী পরিবারের ভরণপোষণের জন্য ব্যয় করে তার দু'টি পুণ্য হবে। একটি আত্মীয়তার হক আদায়ের এবং অন্যটি সাদাকার পূণ্য। অর্থাৎ যে নারী পরিবারের জন্য ব্যয় করে, তার ব্যয় সাদাকা হিসাবে গণ্য হবে। তাকে আলাদা করে দীন-দুঃখীদের মধ্যে সাদাকা করতে হবে না। কারণ, সে পরিবারের ভরণপোষণের মাধ্যমেই তার দায়িত্বের অতিরিক্ত কাজ সমাধা করছে। সুতরাং এই অতিরিক্ত কাজটিই সাদাকা হিসাবে আল্লাহতা'য়ালার নিকট গৃহীত হবে।

একই হাদীসে আমরা আরো দেখি, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) যদিও পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব সার্বিকভাবে পালন করছিলেন না, তথাপি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকাই মুখ্য ছিল। যয়নব (রাঃ) প্রথমে স্বামীকে বলেছিলেন রাসূলুল্লাহ (রাঃ)এর কাছে গিয়ে পরিবারের ভরণপোষণকারী নারীর দান-সাদাকা সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে আসতে। স্ত্রীর অনুরোধ রক্ষা না করে তিনি বরং স্ত্রীকেই পরামর্শ দিলেন নবীজী (সাঃ)এর কাছে গিয়ে বিস্তারিত জেনে আসার জন্য। কারণ প্রথমতঃ যয়নব (রাঃ) নিজেই মসজিদুন নববীতে নবীজী (সাঃ)এর প্রথম নির্দেশ শুনেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ যয়নব (রাঃ)এর প্রশ্নটি অর্থোপার্জনকারী নারীর দান-সাদাকা সম্পর্কিত। সুতরাং যয়নব (রাঃ)এর উচিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র কাছে নিজে গিয়েই বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে আসা। আমরা ঘটনার পূর্বাপর বিশ্লেষণ করে ধরে নিচ্ছি, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এসব বিষয় বিবেচনা করে স্ত্রীকে পরামর্শ দিলেন যেন তিনি নিজেই নবীজী (সাঃ)এর কাছে যান। কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা হচ্ছে যে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিলেন এবং যয়নব (রাঃ) দ্বিধাহীন চিত্তে তা গ্রহণ করলেন।

প্রসঙ্গক্রমে একটি বিষয় উল্লেখ আবশ্যক। পাশ্চাত্যের নারী বিয়ের পূর্বে তার নামের সাথে পিতৃবংশের উপাধি ধারণ করে। বিয়ের পর পিতার পারিবারিক উপাধি বর্জনকরতঃ স্বামীর পারিবারিক উপাধি ধারণ করে। নারীর নিজস্ব কোন পরিচয় বা স্বাতন্ত্র্য পাশ্চাত্যে স্বীকৃত নয়। এমনকি জীবনে নারীর কোন ভূমিকাকেও তারা স্বীকৃতি দেয় না। কিন্তু ইসলাম এ ধারণা সমর্থন করে না। ইসলাম নারী বা পুরুষ কারো জন্যই জাত-বংশ নিয়ে গর্ব করার লক্ষ্যে নামের

www.pathagar.com

সাথে কোন উপাধি ধারণ করা সমর্থন করে না। বিয়ের পর নারীর পিতৃ-পরিচয় ঘুচিয়ে দিয়ে স্বামীর পারিবারিক উপাধি বা স্বামীর নামের অংশবিশেষ নারীর নামের সাথে ধারণের জন্যও উৎসাহিত করে না। মুসলিম নারী বিয়ের পরও তার নামের সাথে সগর্বে তার পিতৃ-পরিচয় ধারণ করতে পারে। কুরআন আমাদের এ শিক্ষাই দেয় যে, সামাজিক পরিচয়ের জন্য নারী-পুরুষ উভয়েরই কেবল পিতৃপরিচয়ই যথেষ্ট (আল-আহযাব:৫)। কিন্তু একজন মানুষের আসল পরিচয় তার কর্মে, ঈমানের দৃঢ়তায় এবং তাকওয়ার গভীরতায়। এ প্রসঙ্গে সূরা হুজুরাতের ৪৯ আয়াতটি আর একবার স্মরণ করা যেতে পারে:

"হে মানুষ, আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে। পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক তাকওয়াসম্পন্ন আল্লাহভীরু ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানিত।" আয়াতটি সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণ করে যে, আল্লাহতা'য়ালার নিকট নারী বা পুরুষের সৃষ্টিগতভাবে আলাদা কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আল্লাহনুগত্য তথা তাকওয়াই হচ্ছে শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি। তবে গোষ্ঠীবদ্ধ বা সংঘবদ্ধভাবে সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করতে হলে একজনকে অভিভাবকত্ব বা ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতেই হয়। এ দায়িত্ব কোনভাবেই শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন নয়।

৪.২. অদৃশ্যের হিফাজত : নারীর প্রধান দায়িত্ব

আয়াতটির পরবর্তী অংশে আল্লাহ বলছেন:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّـهُ ۚ

এ আয়াতাংশটির ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রায় সব ব্যাখ্যাকারগণ অভিন্ন মত পোষণ করলেও এটির দুটি লক্ষণীয় অনুবাদ দেখা যায়।

(১) সুতরাং সাধ্বী স্ত্রীরা অনুগতা হয় এবং আল্লাহর হিফাজতে অদৃশ্যের হিফাজত করে।

(২) সুতরাং সাধ্বী অনুগতা স্ত্রীরা আল্লাহর হিফাজতে অদৃশ্যের হিফাজত করে।

সব অনুবাদেই 'সালিহাত' বলতে সতী নারীকে বোঝানো হয়েছে। একমাত্র আল্লামা আবু বকর আল-জাসসাস (রহঃ) ছাড়া অন্য সব ব্যাখ্যাকারগণ 'কানিতাত' শব্দ দ্বারা স্বামীর প্রতি নিরংকুশ আনুগত্য বুঝিয়েছেন। আল

www.pathagar.com

জাসসাস[৩২] তাঁর *'আহকামুল কুরআন'* গ্রন্থে শব্দটির অর্থ আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বললেও, একই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় অন্য এক স্থানে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আনুগত্য বাধ্যতামূলক বলে জানিয়েছেন। অপরদিকে অদৃশ্যের হিফাজত বলতে প্রায় সকল ব্যাখ্যাকার স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রীর নিজের সতীত্ব এবং স্বামীর সম্পত্তির হিফাজত বুঝিয়েছেন।

উপরোক্ত অনুবাদ দু'টিতে ব্যবহৃত শব্দসমূহের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, প্রথম অনুবাদটি একটি বিশেষ গুণসম্পন্ন নারীর উপর দুটি দায়িত্ব আরোপ করে; সাধ্বী নারীর দায়িত্ব হলো আনুগত্য করা এবং অদৃশ্যের হিফাজত করা। অপরদিকে দ্বিতীয় অনুবাদটি দুটি বিশেষ গুণসম্পন্ন নারীর উপর একটি বিশেষ দায়িত্ব আরোপ করে; সাধ্বী এবং অনুগতা নারীর দায়িত্ব হলো অদৃশ্যের হিফাজত করা। প্রথম অনুবাদটি থেকে ধারণা হতে পারে যে উল্লিখিত 'আনুগত্য' একান্তভাবে স্বামীর প্রতি। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় অনুবাদ ধারণা দিতে পারে যে, আল্লাহনুগত স্ত্রীরা অদৃশ্যের হিফাজত করে থাকে। অধিকাংশ তাফসীরকার (মুফতি শফি, মুহাম্মাদ আসাদ, খান ও হিলালি, গরীবুল্লাহ ও দারবিশ, প্রমুখ) প্রথম অনুবাদটি গ্রহণ করেছেন। এতে 'কানিতাত' শব্দটি দ্বারা যে আনুগত্যের কথা বলা হয়, তা স্রষ্টার প্রতি না-কি কোন সৃষ্টির প্রতি, তা অস্পষ্ট হয়ে পড়ে।

অনুবাদ দু'টিতে সাধ্বী স্ত্রী বলতে ঠিক কোন্ নারীকে বুঝানো হচ্ছে, যে আনুগত্যের কথা আয়াতে বলা হয়েছে তা কি স্রষ্টার প্রতি না কি কোন সৃষ্টি তথা স্বামীর প্রতি এবং অদৃশ্যের হিফাজতের সঠিক তাৎপর্য উপলব্ধি করার জন্য আয়াতটির বিশদ বিশ্লেষণ আবশ্যক।

৪.২.১. সতী নারী বনাম সৎকর্মপরায়ণ নারী

প্রথমতঃ আয়াতাংশে 'সালিহাতু' শব্দটির অর্থ করা হয়ে থাকে সতী-সাধ্বী স্ত্রীলোক। ভাষার কারণে বা অন্য যেকোন কারণেই হোক একজন নারীকে যখন অসতী বলা হয়, তখন প্রায় অবধারিতভাবে এ ধারণাটি জন্মে যে, নারীটি স্বামীর প্রতি অবিশ্বস্ত এবং দুশ্চরিত্রা অথবা নারীটি যৌনাঙ্গের হিফাজতকারিণী নয়। পক্ষান্তরে একজন পুরুষকে যখন অসৎ বলা হয়, তখন এ ধরনের কোন ধারণা প্রথমেই জন্মায় না। অর্থাৎ 'সালিহাতু' শব্দটির অনুবাদে সতী সাধ্বী নারী বলা হলে মূল শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ না পেয়ে পক্ষপাতদুষ্ট একটি অর্থ প্রকাশ পাওয়ার আশংকা বর্তমান থাকে। পবিত্র কুরআনে *'আল্লাযীনা আমানু*

www.pathagar.com

ওয়া আমালুস সালিহাত' এ বাক্যাংশটি প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে। এটির অর্থ করা হয়– *'যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে।'* যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আল্লাহতা'য়ালা তাদের কখনও মহাপুরস্কারের, কখনও জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন পৌনঃপুনিকভাবে। বর্তমান আলোচ্য আয়াতাংশে 'সালিহাত' শব্দ দ্বারা সৎকর্মপরায়ণ মানুষকেই বুঝানো হয়েছে। মূল শব্দ 'সুলহ'এর একাধিক অর্থ বর্তমান থাকলেও উল্লিখিত উভয় ক্ষেত্রে 'সালিহাত' শব্দটি সৎকর্মপরায়ণ বুঝানোর জন্যই যে ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিতর্কের খাতিরে যদিও এটা বলা যায় যে 'সতী-সাধ্বী নারী' ও 'সৎকর্মপরায়ণ নারী' এ দু'টি কথার অর্থ একই, তবুও এটি অনস্বীকার্য যে দু'টি কথা পাঠকের মনে একই অনুভূতির সৃষ্টি করে না। বস্তুতঃ আল্লাহর বাণীর প্রকৃত তাৎপর্য পাঠকের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে, নারীকেও আশরাফুল মাখলুকাত-এর অংশ হিসেবে প্রমাণ করার লক্ষ্যে, আলোচ্য আয়াতাংশে 'সালিহাতু' শব্দের অর্থ 'সতী-সাধ্বী নারী' না করে 'সৎকর্মপরায়ণ নারী' করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

তাছাড়াও আমরা দেখেছি আয়াতের প্রথমাংশে আল্লাহতা'য়ালা পুরুষকে দু'টি বিশেষ কারণে অর্থাৎ দু'টি বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রদান করে নারীর অভিভাবকত্ব ও ভরণপোষণের গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। পুরুষ তার বৈশিষ্ট্যের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে অভিভাবকত্বের গুরুদায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারলেই একটি বিশেষ ক্ষেত্রে, অর্থাৎ পারিবারিক ক্ষেত্রে 'সালিহাত' তথা সৎকর্মপরায়ণ বলে প্রমাণিত হবে। পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটির অপর সম্পূরক একজন নারী। পুরুষের প্রতি আল্লাহপাক যেমন একটি দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তেমনি নারীর প্রতিও একটি দায়িত্ব অর্পণ করা হবে এটাই স্বাভাবিক। আর এ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের মাধ্যমে নারী হয়ে উঠবে সংসারের এই বিশেষ ক্ষেত্রে 'সালিহাতু' অর্থাৎ সৎকর্মপরায়ণ নারী। দায়িত্বের কথা বর্ণনার আগে দায়িত্ব পালনই যে সৎকর্মপরায়ণতার পরিচায়ক, সে কথাটি বুঝানোর জন্যই দ্বিতীয় আয়াতাংশের শুরুতে 'ফাসসালিহাতু....' অর্থাৎ 'অতএব সৎকর্মপরায়ণ নারীরা...' বলে বাক্য শুরু করা হয়েছে।

৪.২.২. নারীর আনুগত্য কি স্রষ্টার প্রতি না স্বামীর প্রতি?

আয়াতাংশের দ্বিতীয় শব্দ 'কানিতাতুন'। এটির অনুবাদ করা হয়েছে 'আনুগত্যশীল'। প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারই আনুগত্য বলতে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর

www.pathagar.com

আনুগত্য বলে বুঝাবার প্রয়াস পেয়েছেন। স্পষ্টতঃ আয়াতে আনুগত্যের কোন সীমা চিহ্নিত করে দেয়া হয় নি। তাহলে ধরে নিতে হয় স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আনুগত্য বলতে সীমাহীন আনুগত্যের কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু এ ধরনের সীমাহীন আনুগত্য কি পবিত্র কুরআনের অন্যান্য বাণীর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ? আল্লাহ একস্থানে বললেন, নারী আর পুরুষ পরস্পর সমানাধিকারসম্পন্ন (২:২২৮); একস্থানে বললেন, নারী আর পুরুষ একে অপরের সমান (৩:১৯৫); আবার অন্যস্থানে বললেন, মুমিন এবং মুমিনা পরস্পরের আউলিয়া (৯:৭১)। অতঃপর যদি আল্লাহ বলেন যে পুরুষ নারীর নিরংকুশ আনুগত্যের দাবিদার, তাহলে আল্লাহর বাণীতেই বৈপরীত্য আরোপ করা হয় না কি? প্রকৃতপক্ষে 'কানিতাত' শব্দটির আসল অর্থ অনুধাবন করতে পারলে মূল সত্যটি যেমন জানা যাবে, তেমনি আল্লাহর বাণীতে আরোপিত এই বৈপরীত্যও বিদূরীত হবে বলে আশা করা যায়। এই সূরা আন-নিসাতে আল্লাহতা'য়ালা বলছেন:

يُرِيدُ اللَّـهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

মানুষকে অনেক দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। ৪:২৮ (অংশ)

এটা কি করে সম্ভব যে, আল্লাহতা'য়ালা যে মানুষকে অনেক দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন, সে মানুষেরই এক দলকে অপর দলের উপর অপরিসীম কর্তৃত্ব দেবেন এবং আরেক দলকে সীমাহীন আনুগত্যের নির্দেশ দেবেন? এটা কেবল তখনই সম্ভব, যখন বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্বলতার কারণে আল্লাহপ্রদত্ত বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে শ্রেষ্ঠত্ব বলে ভ্রম হয়। আর শ্রেষ্ঠত্ববোধের অহংকারের ফলশ্রুতিতে অর্পিত অভিভাবকত্বের দায়িত্বকে মনে হয় কর্তৃত্ব বলে। বস্তুতঃ এই শ্রেষ্ঠত্ববোধই মানুষকে তাকওয়াবিহীন, নিষ্ঠুর, নির্দয়, কর্তৃত্বপরায়ণ করে তোলে। শ্রেষ্ঠত্ববোধের অহংকার আর কর্তৃত্বপরায়ণতার দম্ভ থেকেই পরবর্তীতে আনুগত্য লাভের মোহ মানুষকে পেয়ে বসে। প্রকৃতপক্ষে কোন মানুষ অপর কোন মানুষের এমনকি প্রভু তার দাসেরও নিরংকুশ আনুগত্য দাবি করতে পারে না।

আমরা দেখেছি 'কানিতাত' শব্দটির অর্থ যদি স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আনুগত্য অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তাহলে স্বামীর ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সৎকর্ম-অসৎকর্ম সর্ববিষয়ে আনুগত্য করা স্ত্রীর জন্য ওয়াযিব বা ফরয হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, আয়াতে আনুগত্যের কোন সীমা চিহ্নিত করে দেয়া হয় নি। ফলে সৃষ্টি হয় এক

www.pathagar.com

বিপজ্জনক পরিস্থিতির। স্ত্রীরা স্বামী নামক প্রভুর আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারলেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হবে- এ ধরনের এক মানসিকতার উদ্ভব ঘটে। সীমা-সংজ্ঞাবিহীন আনুগত্যের এটাই হয়ে দাঁড়ায় প্রকৃত ব্যাখ্যা। কিন্তু এ ধরনের ব্যাখ্যা কুরআন তথা ইসলামের মূলনীতির পরিপন্থী।

এ আয়াতাংশের প্রচলিত ব্যাখ্যার সুবাদে বা অন্য যে কোন কারণেই হোক আজকের দিনের অধিকাংশ মুসলিম নারী, বিশেষ করে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত মুসলিম নারীরা তাদের স্বামীদেরকে আল্লাহর প্রায় কাছাকাছি আসনে বসিয়ে থাকে। ক্ষেত্রবিশেষে আল্লাহর হুকুমের চাইতে স্বামী নামক প্রভুর হুকুমই শিরোধার্য অবশ্য পালনীয় হয়ে পড়ে। আর স্বামীরাও নিজেদেরকে মহাপ্রভুর আসনে বসিয়ে অহংকারের পংকে ডুবতে থাকে। কিন্তু 'কানিতাত' শব্দটি না পুরুষকে সীমাহীন কর্তৃত্বপরায়ণতার সুযোগ দিয়ে মহাপ্রভুর আসনে বসায়, আর না নারীকে নিঃশর্ত আনুগত্যের নির্দেশ দিয়ে নিম্ন শ্রেণির সৃষ্টিতে পরিণত করে। আবু বকর আল জাসসাস (রহঃ) এর *আহকামুল কুরআন*[৩৩] গ্রন্থে সংক্ষিপ্তভাবে এবং তাফসীরে ইবনে কাছীর[৩৪] এ মোটামুটি বিশদভাবে 'কানিতাত' শব্দটির উপর আলোচনা করা হয়েছে। আহকামুল কুরআনে আয়াতাংশটির অনুবাদে লেখা হয়েছে - 'নেক চরিত্রবতী স্ত্রীরা আল্লাহনুগত, আল্লাহর সংরক্ষণের অধীনে স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজের সার্বিক সংরক্ষণকারিণী।' লক্ষণীয় যে এখানে 'কানিতাত' শব্দের অর্থ 'আল্লাহনুগত' লেখা হয়েছে। অতঃপর শব্দটির ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছে - *'কানিতাত এর অর্থ কাতাদাহ বলেছেন অনুগত, আল্লাহর এবং তাদের স্বামীর। এর মূল 'কুনূত' এর আসল অর্থ স্থায়ী আনুগত্যশীলতা। বেতের-এর নামাযে যে কুনূতের দোয়া পড়া হয়, তাকে কুনূতের দোয়া বলা হয়, এজন্য যে, তা পড়ার জন্য দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পড়তে হয়।'* আহকামুল কুরআনের এ ব্যাখ্যা থেকে 'কানিতাত' বা এর মূল শব্দ 'কু.নূত' এর তিনটি অর্থ পাওয়া যায় (১) আল্লাহর প্রতি, স্বামীর প্রতি অথবা যে কারো প্রতি আনুগত্য, (২) স্থায়ী আনুগত্যশীলতা অর্থাৎ নিঃশর্ত, সার্বিক ও নিরংকুশ আনুগত্যশীলতা এবং (৩) নির্দেশ পালনের জন্য অথবা হুকুম গ্রহণ করার জন্য অথবা আবেদন-নিবেদন পেশ করার জন্য বিনয়াবনত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। এ অর্থ তিনটির কোনটি অধিকতর যুক্তিসঙ্গত তা আমরা পরবর্তীতে দেখবো।

www.pathagar.com

'কুনূত' থেকে উদ্ভূত 'কানিতূন' শব্দটি সূরা আল-বাকারার ১১৬ আয়াতের কুরআন মাজিদে প্রথম উদ্ধৃত হয়। তাফসীরে ইবনে কাছীরে আয়াতটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'কানিতূন' শব্দটির উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আয়াতটির শেষ অংশটি হলো:

بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ ﴿١١٦﴾

.....বরং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যকার সব কিছুই তাঁর; সকল কিছুই তাঁর অনুগত।' ২:১১৬ (অংশ)।

অনুবাদে 'কানিতূন' শব্দের অর্থ অনুগত লেখা হয়েছে। অতঃপর বিভিন্ন সাহাবা এবং ব্যাখ্যাকার 'কুল্লুল লাহু কানিতূন', এ আয়াতাংশটির, বিশেষ করে 'কানিতূন' শব্দটির কি ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তার একটি বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। আয়াতাংশটির অর্থ:

(১) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) সূত্রে ইমাম আবু হাতিম বলেন, 'সকলেই তাঁহার নিকট দোআ করে।'

(২) ইকরামা এবং আবু মালিক বলেন, 'সকলেই তাঁহার দাসত্ব স্বীকার করে।'

(৩) সাঈদ ইবনে জুবাইর বলেন, 'সকলেই একমাত্র তাঁহাকেই ইবাদাত করে।'

(৪) রবী ইবনে আনাস বলেন, 'কিয়ামতের দিন সকলেই বিনীতভাবে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে।'

(৫) সুদ্দী বলেন, 'সকলেই কিয়ামতের দিনে অনুগত হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবে।'

(৬) মুজাহিদ থেকে খসীফ বর্ণনা করেন, 'সকলেই তাঁহার নির্দেশের প্রতি অনুগত।'

(৭) মুজাহিদ থেকে ইবনে নাজীহ বলেন, 'সকলেই তাঁহার প্রতি অনুগত।'

তাফসীরে ইবনে কাছীরে উপরোক্ত সাতটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যার উল্লেখ ছাড়াও 'কুনূত' শব্দটির ব্যাখ্যায় একটি দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য হাদীসের উল্লেখ রয়েছে। অবশ্যি ইবনে কাছীর (রহঃ) নিজেই বলেছেন হাদীসটি কোন সাহাবী বা তন্নিম্নস্থ ব্যক্তির নিজস্ব উক্তি। *হযরত আবু সাঈদ খুদরীর (রাঃ) বর্ণনা - "নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, কুরআন মজীদের যে কোন স্থানেই কুনূত শব্দটি উল্লেখিত হউকনা কেন, উহার অর্থ হইবে আনুগত্য (তাআতা)।"* তাফসীরে ইবনে কাছীরের উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে মূল শব্দ 'কুনূত' এর যেসব অর্থ

www.pathagar.com

পাওয়া যায় তা হলো (১) দোয়া করা অর্থাৎ বিনীতভাবে আবেদন-নিবেদন পেশ করা, (২) ইবাদাত করা বা দাসত্ব করা, (৩) বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হয়ে থাকা এবং (৪) নিঃশর্ত, নিরংকুশ আনুগত্য।

'কুনূত' শব্দটির অর্থের উপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে অতি সঙ্গতভাবে এ প্রশ্নটি আসবে কুরআন মজীদের আর কোন্ কোন্ স্থানে, কি কি অর্থে 'কুনূত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। দেখা যায় আল-বাকারা: ১১৬ ও ২৩৮, আলে-ইমরান: ১৭ ও ৪৩, আন-নিসা: ৩৪, আন-নাহল: ১২০, আর-রূম: ২৬, আহযাব: ৩১ ও ৩৫, যুমার: ৯, তাহরীম: ৫ ও ১২টি আয়াতে 'কুনূত' শব্দটি মোঁ ১৩ বার (আল-আহযাবের ৩৫ আয়াতে দু'বার) ব্যবহৃত হয়েছে। উপরের ব্যাখ্যা থেকে শব্দটির অর্থ 'আনুগত্য', 'দাসত্ব', 'দণ্ডায়মান' বা 'দোয়া', যা-ই গ্রহণ করা হোক না কেন, একটি মাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া, অবশিষ্ট সকল ক্ষেত্রে এটি আল্লাহর জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। শুধুমাত্র সূরা আহযাবের ৩১ আয়াতে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি আনুগত্য করার নির্দেশ দিতে গিয়ে 'কুনূত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আয়াতটিতে আল্লাহ বলছেন:

وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّـهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا م
رَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾

(হে নবী-পত্নীগণ) তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অনুগত হবে ও সৎকার্য করবে, তাকে আমি পুরস্কার দেব দুবার এবং তার জন্য আমি রেখেছি সম্মানজনক জীবিকা।' আল-আহযাব: ৩১

এ আয়াতটি এবং এর পূর্বের আয়াতটি উম্মুল-মুমিনীন অর্থাৎ নবী-পত্নীদের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে। বলা হয়েছে যে তাঁদের পাপ-কর্মের জন্য যেমন তাঁদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি পেতে হবে, তেমনি তাদের পুণ্যকর্ম ও আনুগত্যের জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার প্রদান করা হবে। আয়াতে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি আনুগত্যের (ইয়ুকনুত) কথা বলা হয়েছে, বলা হয়নি তাঁদের স্বামীর প্রতি আনুগত্যের কথা। আর মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)কে যখন বলা হয় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন তিনি কোন সাধারণ ব্যক্তি বা কোন নারীর স্বামী নন, বরং তখন তিনি আল্লাহর হুকুম কায়েম করার জন্য, আল্লাহর নির্বাচিত এবং প্রেরিত প্রতিনিধি। আর সেজন্যই সূরা আন-নিসার ৮০ আয়াতে বলা হয়েছে:

www.pathagar.com

مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّـهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٨٠﴾

কেউ রাসূলের আনুগত্য করলে সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, হে নবী! তোমাকে তাদের পাহারাদার হিসাবে পাঠাইনি। ৪:৮০(অংশ)

অতএব উম্মুল-মুমিনীনদেরকে 'কুনূত' শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সাঃ) আনুগত্যের যে নির্দেশ সূরা আহযাব-এর ৩১ আয়াতে দেয়া হয়েছে, তা নিশ্চিতভাবে কোন ব্যক্তিকে অপর কোন ব্যক্তির প্রতি কিংবা কোন নারীকে তার স্বামীর প্রতি আনুগত্যের নির্দেশ হিসাবে দেয়া হয়নি; বরং সর্বতোভাবে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সাঃ) প্রতি আনুগত্যের জন্য দেয়া হয়েছে।

উম্মুল-মুমিনীনদের উদ্দেশ্য করে বলা আরো একটি আয়াতে 'কুনূত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আয়াতটি এখানে তুলে ধরা প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। আয়াতটিতে আল্লাহ বলছেন:

عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا ﴿٥﴾

যদি নবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করেন, তবে তাঁর প্রতিপালক তোমাদের পরিবর্তে সম্ভবতঃ তাকে দেবেন তোমাদের চাইতে উৎকৃষ্টতর স্ত্রী, যারা হবে, আত্মসমর্পণকারী (মুসলিমা), বিশ্বাসী (মু'মিনা), আনুগত্যশীল (কানিতাত), তাওবাকারিণী, ইবাদাতকারিণী, সওমপালনকারিণী, কুমারী ও অকুমারী। তাহরীম:৫

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একজন উম্মুল মু'মিনীনের গৃহে অবস্থানকালে মধুর তৈরি শরবত পান করার নিমিত্তে বেশ দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করতেন। এতে অন্য কয়েকজন উম্মুল-মু'মিনীন ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়েন। এর ফলশ্রুতিতে নবী (সাঃ) মধুকে নিজের জন্য হারাম করে নেয়ার প্রতিজ্ঞা করেন এবং যে উম্মুল-মু'মিনীনের সামনে এ প্রতিজ্ঞাটি করেছিলেন, তাঁকে প্রতিজ্ঞার বিষয় প্রকাশ না করার জন্য বলেছিলেন। কিন্তু ঐ উম্মুল-মু'মিনীন তা অপর একজনের কাছে

www.pathagar.com

প্রকাশ করে দেন। কথিত আছে, এ ঘটনারই পরিপ্রেক্ষিতে সূরা তাহরীমের প্রথম কয়টি আয়াত নাযিল হয়।

ঘটনা যাই হোকনা কেন, তাহরীমের ৫ আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট যে, আল্লাহতা'য়ালা সাময়িকভাবে উম্মুল-মু'মিনীনদের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাঁদের প্রতি ভর্ৎসনার সূরাটি আয়াতে স্পষ্ট। উৎকৃষ্টতর স্ত্রীর ছয়-ছয়টি গুণাবলীর উল্লেখ উক্ত আয়াতে দেখা যায়। লক্ষণীয় যে উল্লিখিত ছয়টি গুণের প্রত্যেকটিই কেবলমাত্র আল্লাহর প্রতি প্রযোজ্য। অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করতে হবে আল্লাহর প্রতি, বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে আল্লাহর প্রতি, আনুগত্যশীল হতে হবে আল্লাহর প্রতি, তাওবা করতে হবে আল্লাহর কাছেই, ইবাদত বা দাসত্ব করতে হবে আল্লাহরই, সওম পালন করতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই। কোন কোন ব্যাখ্যাকার (তাফহীমুল কুরআন) অবশ্য আনুগত্যশীলতা ব্যক্তির প্রতিও আরোপ করার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু এ ধরনের ব্যাখ্যা পুরো আয়াতের ভাবগাম্ভীর্য শুধু নষ্ট করে দেয় তা নয়, অন্যান্য গুণাবলী ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য হবে কিনা, সে প্রশ্ন উত্থাপনেরও সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। মোটকথা আয়াত থেকে অত্যন্ত স্পষ্ট যে, অন্যান্য সব গুণাবলীর মতো আনুগত্যশীলতা ও আল্লাহর প্রতিই প্রযোজ্য।

সূরা আহযাব: ৩১ ও তাহরীমের:৫ আয়াতে 'কুনূত' শব্দটি দ্বারা আনুগত্য আল্লাহর প্রতি না ব্যক্তির প্রতি তা নিয়ে কিঞ্চিৎ অস্পষ্টতার অবকাশ ছিল বলে আমরা আয়াত দুটি উল্লেখপূর্বক মোটামুটি সবিস্তার আলোচনার মাধ্যমে এটাই প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পেয়েছি যে উভয় আয়াতেই আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বুঝানোর জন্য শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, কোন ব্যক্তির প্রতি কখনোই নয়। এছাড়া কুরআন মজীদের অপরাপর যে সব স্থানে 'কুনূত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তা দ্ব্যর্থহীনভাবে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

আনুগত্য অর্থে কুরআন মজীদে আরো একাধিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 'ইত'আত' শব্দটি আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এবং নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যের জন্য সূরা আন-নিসা:৫৯ আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। আর আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের প্রতি আনুগত্য করার জন্য এ শব্দটি কুরআন পাকে সর্বাধিক ব্যবহৃত। অপরদিকে মাতা-পিতার প্রতি আনুগত্য করার নির্দেশ দিতে গিয়ে সূরা মারিয়াম: ১৪ ও ৩২ আয়াতে 'বাররান' (বিররুন) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়াও আনুগত্য করা অর্থে বা অনুসরণ করা বুঝানোর জন্য প্রায়ই 'এত্তেবা' (যুমার: ৫৫, যুখরুফ: ৬১) শব্দটিও কুরআন মাজীদে ব্যবহৃত

www.pathagar.com

হয়েছে। কুরআন মজীদে বিভিন্ন প্রকার আনুগত্য বুঝাবার জন্য বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু কখনই কোথাও কোন মানুষকে অন্য কোন মানুষের প্রতি আনুগত্য দেখানোর কোন নির্দেশ দেয়া হয় নি। এমনকি গোলামকেও তার মনিবের প্রতি নিরংকুশ আনুগত্য দেখাতে বলা হয়নি। 'বিররুন' শব্দ ব্যবহার করে মাতা-পিতার প্রতি যে আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে, তার আসল অর্থ খিদমত করা, সেবা করা, মনে আঘাত না দেয়া, সদাচরণ করা ইত্যাদি।

'আনুগত্য' শব্দটির উপর আলোচনা অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে গেলেও, কুরআনের আলোকে আমরা এ সত্যে উপনীত হতে চেষ্টা করেছি যে, প্রকৃত পক্ষে সার্বিক এবং নিঃশর্ত আনুগত্যের দাবিদার স্বয়ং মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা। কোন ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি সার্বিক আনুগত্য প্রদর্শনে অবহেলা করছে কিনা, বা আনুগত্যের নির্ধারিত সীমা লংঘন করছে কিনা, তা তদারক করার দায়িত্ব অপর কোন ব্যক্তি (রাষ্ট্রপ্রধান, সমাজপতি, বিচারক, ইমাম, নেতা, পণ্ডিত ইত্যাদি) নিতে পারে, কিন্তু কখনই এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সার্বিক আনুগত্যের দাবি করতে পারে না। এমনকি স্বামীও পারে না স্ত্রীর সার্বিক আনুগত্য দাবি করতে। তা যদি পারতো অথবা আল্লাহতা'য়ালার তথা প্রাকৃতিক বিধান যদি তাই হতো, তাহলে সর্বকালের নিকৃষ্টতম কাফের ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া (আঃ) আল্লাহর সর্বাধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত দুজন নারীর একজন হতে পারতেন না (আত-তাহরীম:১১)। অথবা হযরত লূত (আঃ)এর স্ত্রী শাস্তিপ্রাপ্তদের দলভুক্ত জাহান্নামের অধিবাসী হতো না (আত-তাহরীম:১০)। ফিরাউনের স্ত্রী তাঁর কাফের স্বামীর আনুগত্য না করে আল্লাহর আনুগত্য করেছিলেন বলে আল্লাহর নৈকট লাভ করেছিলেন। পক্ষান্তরে আল্লাহর নবী হযরত লূত (আঃ)এর স্ত্রী নবীর নির্দেশ পালনের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য করেনি বলে জাহান্নামের জন্য নির্বাচিত হয়ে গিয়েছিল।

আসিয়ার (আঃ) উদাহরণটির পরও এ কথা বলার অবকাশ থাকে যে, স্ত্রী স্বামীর সকল হুকুম বা বিষয়ে আনুগত্য করবে না বরং স্ত্রী কেবল ন্যায়ানুগ, কল্যাণকর বিষয়েই স্বামীর আনুগত্য করবে। এ ধরনের প্রস্তাবনা কার্যত হাস্যকর এবং অর্থহীন। কারণ, স্বামীই যদি হয় আনুগত্যের দাবিদার বা হুকুমদাতা, তাহলে অনুগতজন তথা স্ত্রীর কোন ক্ষমতাই থাকে না বিষয়ের ভালো-মন্দ নির্বাচনের। স্ত্রীর একমাত্র দায়িত্বই হয়ে দাঁড়ায় হুকুমদাতার নিরংকুশ আনুগত্য। অতএব এটা স্পষ্ট যে, 'কানিতাতুন' শব্দটি দ্বারা স্বামীর

www.pathagar.com

প্রতি স্ত্রীর নয় বরং আল্লাহতা'য়ালার প্রতি নারীর নিরংকুশ আনুগত্য বুঝানো হয়েছে।

অতঃপর আহকামুল কুরআন ও তাফছীরে ইবনে কাছীরে 'কুনূত' শব্দের প্রদত্ত ব্যাখ্যা থেকে এর মর্ম উদ্ধারের চেষ্টা করে আমরা পাই, "আনুগত্য প্রদর্শন করা, দোয়া পেশ করা, আবেদন-নিবেদন পেশ করা, দাসত্ব করা, আদেশ-হুকুম পাওয়া মাত্র তা নির্দ্বিধায় পালন করার জন্য বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হয়ে থাকার নামই 'কুনূত'।" নিঃসন্দেহে 'কুনূত' শব্দের এটিই অতি সঙ্গত ব্যাখ্যা। আল্লাহর দাস মানুষ তার স্রষ্টা-প্রতিপালক-প্রভুর প্রতি নিরংকুশ আনুগত্য প্রকাশের লক্ষ্যে অন্তরে-বাইরে সদা-সর্বদা বিনীতভাবে দণ্ডায়মান থাকতে পারে। কোন সৃষ্টি অন্য কোন সৃষ্টির কাছ থেকে এমনটি আশা করতে পারে না।

অতএব সূরা আন-নিসার আলোচ্য আয়াতাংশে ব্যবহৃত 'কানিতাতুন' শব্দটিকে কুরআনের আলোকে বিস্তারিত বিশ্লেষণ শেষে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে এখানে শব্দটি দ্বারা আল্লাহতা'য়ালার প্রতি অনুগত নারীর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। *'সৎ-কর্মপরায়ণ নারী আল্লাহর প্রতি সদা আনুগত্যশীল থাকে'*, এটাই এ আয়াতাংশের মূল বক্তব্য। আয়াতাংশে স্বামীর প্রতি নিরংকুশ আনুগত্যের কথা আদৌ বলা হয় নি।

৪.২.৩. অদৃশ্যের হিফাজত

'হাফিজাতুল লিল গায়বি বিমা হাফিজাল্লাহ' অর্থাৎ 'আল্লাহর হিফাজতে অদৃশ্যের হিফাজতকারিণী'। সকল ব্যাখ্যাকার এ বাক্যাংশটিতে উল্লেখিত অদৃশ্যের হিফাজতের অর্থ করেছেন যে নারী তার স্বামীর অবর্তমানে নিজের সতীত্ব এবং স্বামীর সম্পত্তির হিফাজত করবে। *আহকামুল কুরআন*[৩৫] গ্রন্থে আল-জাসসাস (রহঃ) স্ত্রীর উপর আরও বাড়তি দায়িত্ব হিসেবে *'স্বামীর বীর্য স্ত্রীদের জরায়ুতে সংরক্ষণ'*- এর কথাও বলেছেন। তিনি যে সময়ে কুরআনের বাণীর ব্যাখ্যা করেছেন, সে সময়ে হয়তো এ ধারণাই প্রচলিত ছিল যে শুধু পুরুষের শুক্রাণু থেকেই সন্তানের জন্ম হয়। অথবা যে সমস্ত দম্পতির সন্তান হয় না, ঐ সমস্ত দম্পতির নারী সদস্য তার জরায়ুতে স্বামীর শুক্রাণু যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেন না বলেই তাদের সন্তান হয় না। তা যদি না হয়, তিনি তাহলে নিশ্চয় এমন একটি অসম্ভব দায়িত্ব নারীর উপর অর্পণ করার কথা ভাবতেন না।

www.pathagar.com

আমরা দেখেছি আয়াতের প্রথমাংশে পুরুষকে নারীর উপর 'কাউয়ামূন' বলে পরিবারের অভিভাবকত্ব এবং ভরণপোষণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এ শব্দটির ব্যাখ্যায় বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেছেন, যেমন - সুপ্রতিষ্ঠিত, অটলভাবে দণ্ডায়মান, তত্ত্বাবধায়ক, প্রভু, প্রতিপালক, সংরক্ষক ইত্যাদি। একই আয়াতের প্রথমাংশে বলা হলো পুরুষ নারীর অভিভাবক, পরিচালক, পৃষ্ঠপোষক, সংরক্ষক অথবা তত্ত্বাবধায়ক ইত্যাদি। অতঃপর দ্বিতীয়াংশে যদি বলা হয়, 'অতএব নারী তার নিজের সতীত্ব এবং স্বামীর সম্পত্তির হিফাজত করবে', তাহলে এটা অবশ্যই স্ববিরোধী হবে। যে রক্ষক সে রক্ষা করবে না। বরং যাকে রক্ষা করা হয়, সে নিজেই নিজেকে এবং রক্ষকের সম্পত্তি হিফাজত করবে, এটা কেমন করে সম্ভব? এমন কোন উদাহরণ কখনই পাওয়া যাবে না যে, কোন দুর্বৃত্তের আক্রমণকালে নারী আত্মহত্যা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে তার নিজের সতীত্ব রক্ষা করতে পেরেছে।

আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় গায়েব অর্থাৎ অদৃশ্যের হিফাজতের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এর একটি অর্থ করা হয় যে স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্বামীর সম্পত্তির হিফাজত। স্বামীর অনুপস্থিতি মানে যদি হতো মৃত স্বামী, তাহলেও অন্তত স্বামী প্রকৃত অর্থেই গায়েব বলে বিশ্বাস করা যেতে পারে। কিন্তু কর্মোব্যপদেশে গৃহের বাইরে অবস্থানকারী স্বামীকে কোনভাবেই অদৃশ্য বলা যায় না। গায়েব বা অদৃশ্য বলতে কেবল অস্তিত্ববিহীন জিনিসকেই বুঝায়। কিন্তু গৃহের বাইরে অবস্থানকারী স্বামীকে আপাতদৃষ্টে গায়েব বা অদৃশ্য বলে মেনে নেয়া গেলেও, গায়েব স্বামীর হিফাজতের দায়িত্ব গৃহবাসী স্ত্রী নেবে কেমন করে? বলা হয়েছে অদৃশ্যের হিফাজত মানে অদৃশ্য স্বামীর হিফাজত নয়, বরং অদৃশ্য স্বামীর সম্পত্তির হিফাজত। কিন্তু সেক্ষেত্রে গায়েবের হিফাজত হলো কেমন করে, স্বামী সাময়িকভাবে গায়েব হলেও তার সম্পত্তিতো সম্পূর্ণরূপে বস্তুগত-দৃশ্যমান জিনিস। আল্লাহর বাণীর এ কেমন ব্যাখ্যা? অদৃশ্যের হিফাজত বলতে অদৃশ্য স্বামীর সম্পূর্ণ দৃশ্যমান সম্পত্তির হিফাজত হয় কেমন করে?

এ ব্যাখ্যা সঠিক বলে গ্রহণ করার পরও প্রশ্ন থেকে যায়। নারী প্রকৃতিগতভাবে এবং শারীরিকভাবে দুর্বল। শারীরিক দুর্বলতার কারণেই নারী চোর ডাকাতের হাত থেকে স্বামীর সম্পত্তির হিফাজতে অক্ষম। তাছাড়া আমরা জানি আল্লাহপাকের বিধান, *'চোর পুরুষ বা নারী যে-ই হোক, তার হাত কেটে দিতে হবে'; আল-মায়িদাহ-৩৮*। এ বিধানটি যেখানে প্রচলিত আছে, সেখানে কার্যত চোর-ডাকাতের উপদ্রব নেই বললেই চলে। সুতরাং যেখানে প্রকৃত

www.pathagar.com

মুসলমানদের বাস, সেখানে চোর-ডাকাতের হাত থেকে স্বামীর সম্পত্তির হিফাজতের ভার নারীর উপর অর্পণ নিতান্তই অর্থহীন। তাছাড়াও পরিবারের সব সদস্য পুরুষের তথা স্বামীর কর্তৃত্ব নির্দ্বিধায় মেনে নিলেও স্ত্রীর কর্তৃত্ব সর্বাবস্থায় মানতে বাধ্য থাকবেনা। অতএব স্বামীর সম্পত্তি পরিবারের অপরাপর সদস্যদের অপব্যবহার বা অন্য কোন উপায়ে বিনষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা বা হিফাজতের পূর্ণ ক্ষমতা স্ত্রীর কখনই থাকতে পারে না। পরিশেষে স্ত্রী নিজেই স্বামীর সম্পত্তি চুরি অথবা অপব্যবহার অথবা অন্য কোন উপায়ে নষ্ট করার বিষয়টি আসে। এ প্রসংগে পাক-কুরআনে আল্লাহপাক বলছেন:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য; দুশ্চরিত্রা পুরুষ দুশ্চরিত্র নারীর জন্য; সচ্চরিত্র নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্র নারীর জন্য; এদের সম্বন্ধে লোকে যা বলে, এরা তা থেকে পবিত্র। - আন-নূর: ২৬ (অংশ)।

এ আয়াতটির মর্মার্থ সুগভীর। যে ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন, চিন্তায়-কর্মে যে পরিপূর্ণরূপে আল্লাহরই উপর নির্ভরশীল, আল্লাহ তাকে কখনই তার নিয়তের অথবা চরিত্রের বিপরীত স্ত্রীর (অথবা স্বামীর) সাথে জীবন-যাপনের মতো অবস্থার সৃষ্টি করবেন না, এটা আল্লাহরই ওয়াদা।

নারী যখন একজন পুরুষের স্ত্রী হয়ে দাম্পত্য জীবন শুরু করে, তখন অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মে লিখিত এবং অলিখিত অনেক দায়িত্ব উভয়ের উপর এসে পড়ে। কিন্তু যখন কুরআনের বিধানের দোহাই দিয়ে নারীর উপর নিজের সতীত্ব এবং স্বামীর সম্পত্তির হিফাজতের দায়িত্ব অর্পিত হয়, তখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, তাহলে অন্যান্য সকল লিখিত এবং অলিখিত দায়িত্ব যা নারী জীবন-পদ্ধতির অংশ হিসাবে নিত্যদিন পালন করে থাকে, সেগুলি থেকে কি তাকে অব্যাহতি দেয়া হলো?

যে কোন যুগে, যে কোন সভ্যতায়, ঘর-কন্নার যাবতীয় কার্যাবলী সাধারণভাবে নারীর দ্বারাই সম্পাদিত হয়ে আসছে। সন্তান লালন-পালন এবং সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষাদান তথা সন্তানের আশরাফুল মাখলুকাত হিসাবে গড়ে ওঠার

www.pathagar.com

প্রাথমিক ভিত্তিটা নারী অর্থাৎ মা-ই রচনা করে থাকেন। স্বামীর সম্পত্তির হিফাজত কি এসব দায়িত্বগুলির তুলনায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ যে, আল্লাহর কালামে এগুলির ব্যাপারে কোন গুরুত্বারোপ না করে শুধু স্বামীর সম্পত্তির হিফাজতের কথাই বলা হয়েছে? নিঃসন্দেহে নারী কর্তৃক সম্পাদিত অন্যান্য দায়িত্বগুলির তুলনায় স্বামীর সম্পত্তির হিফাজত শুধু তুচ্ছতর নয় হাস্যকরও বটে।

শুধু স্বামী-স্ত্রী নয়, যে কোন লিঙ্গের দু'জন ব্যক্তি যখন পাশাপাশি অবস্থান করে, তাদের মধ্যে এমন পরিস্থিতি কখনই সৃষ্টি হয় না যে কেবল একজন সমস্ত কার্যাদি করে যায়, আর অপরজন শুধু ফলটা ভোগ করবে। বরং অলিখিতভাবে ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও সাধ্যানুসারে নিজেরাই বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়, এর জন্য কোন আইনের দরকার পড়ে না। আর স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে স্বয়ং আল্লাহতায়ালা সূরা রূমের ২১ আয়াতে বলছেন:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন: তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গী/সঙ্গিনীদের (আযওয়ায শব্দের অর্থ: স্বামীর জন্য স্ত্রী এবং স্ত্রীর জন্য স্বামী) যাতে তোমরা পরস্পরের কাছে শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। - আর-রূম: ২১

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আল্লাহর সৃষ্ট পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও দয়া-ভালবাসাই নারীকে সংসারের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে উদ্বুদ্ধ করবে; অতুলনীয় মাতৃস্নেহে সন্তান লালন-পালনে এবং সন্তানকে সুশিক্ষা দানে উদ্বুদ্ধ করবে; এমনকি স্বামীর অবর্তমানে স্বামীর সম্পত্তির হিফাজতেও উদ্বুদ্ধ করবে। এর জন্য আল্লাহর বিধানের দোহাই দিলে অকারণ জটিলতারই সৃষ্টি হয়।

৪.২.৪. অদৃশ্যের হিফাজতের প্রকৃত তাৎপর্য

জ্ঞানী-মূর্খ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, মুসলমান-অমুসলমান যে কোন ব্যক্তিকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, পরিবারের প্রধান হিসাবে এবং একজন নারীর স্বামী হিসাবে পুরুষের প্রধান দায়িত্ব কি, তাহলে সর্বাবস্থাতেই এ জবাবই পাওয়া যাবে যে,

www.pathagar.com

স্ত্রী এবং পরিবারের অপরাপর সদস্যবৃন্দের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান নিশ্চিত করা এবং তাদের নিরাপত্তা বিধান করাই পুরুষের প্রধান দায়িত্ব। বস্তুতঃ এটাই প্রকৃতির ধর্ম, বিবেকের রায় এবং এটাই ইসলামের বিধান। এ আয়াতের প্রথমাংশে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঠিক এ দায়িত্বটিই পুরুষের উপর ন্যস্ত করেছেন। অতঃপর প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারেঃ পরিবারের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসাবে নারীর দায়িত্ব কি? এ ব্যাপারে প্রকৃতির বিধান বা বিবেকের রায় কি? এটা কি শুধু সম্পত্তির হিফাজতের দায়িত্ব? অথবা দু'মুঠো অন্নের বিনিময়ে সংসারে ঘর-কন্নার গৃহস্থালী কাজ করার মধ্যে কি নারীর দায়িত্ব সীমাবদ্ধ?

একজোড়া নারী-পুরুষ স্বামী-স্ত্রীতে পরিণত হওয়ার পেছনে যে কয়টি উদ্দেশ্য সক্রিয় থাকে, তার মধ্যে অন্যতম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যটি হচ্ছে সন্তানের পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব অর্জন। এ বিশেষ উদ্দেশ্যটিতে উভয়ের সমান অবদান, অথচ নারীর ভূমিকা মুখ্য। আর তাই এ উদ্দেশ্যটির প্রতি বিশ্বস্ত থাকাই নারীর প্রধান দায়িত্ব। আল্লাহু সুবহানাহু তা'য়ালা জানাচ্ছেন যে এটিই অদৃশ্যের হিফাজত এবং পরিবারের অন্যতম সদস্য হিসাবে নারীর প্রধান দায়িত্ব। স্বামীর সম্পত্তির হিফাজতের মতো তুচ্ছ কর্ম কখনই অদৃশ্যের হিফাজত হতে পারে না।

আল্লাহ বলছেন, নারী আল্লাহর হিফাজতের অধীনে অদৃশ্যের হিফাজত করবে। নারী দুর্বল বলেই কি এক্ষেত্রে আল্লাহর হিফাজতের কথাটি আসছে? পুরুষকে যখন পরিবারের অভিভাবকত্ব দেয়া হলো, তখনতো কই বলা হয়নি আল্লাহর হিফাজতে বা অভিভাবকত্বের অধীনে পুরুষ অভিভাবকত্ব বা ভরণপোষণ করবে। পুরুষের ক্ষেত্রে আল্লাহর সহায়তা কি এতই অপ্রয়োজনীয়? তা নিশ্চয় নয়; আল্লাহর সাহায্য সবারই সমানভাবে প্রয়োজন এবং তা অনন্ত ফল্গুধারার মতো অবিরাম নেমে আসছে।

আল্লাহর হিফাজতের অধীনে অদৃশ্যের হিফাজতের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে হলে প্রথমে ইসলামে বিয়ে বলতে কি বোঝায় তা বুঝতে হবে। ইসলামের বিয়ে একজন কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে দায়মুক্ত করা নয়, বা একজন অসহায় নারীর সহায় হওয়া নয় বা একজন দুঃখিনীর দুঃখমোচন নয় বা একজন অন্ন-বস্ত্রহীন নারীর অন্ন-বস্ত্রের আয়োজন করা নয় বা একজন পতিতা নারীকে সামাজিক মর্যাদা দান নয়। ইসলামের বিয়েতে করুণার কোন স্থান নেই যে, কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ একপক্ষকে অপরপক্ষের দাসের মতো চির-অনুগত হয়ে থাকতে বাধ্য হতে হবে। বরং ইসলামের বিয়ে একজন মুমিনের সাথে মুমিনার, মুসলিমের সাথে মুসলিমার, সচ্চরিত্রের সাথে সচ্চরিত্রার এবং সমঅধিকারসম্পন্ন একজন

www.pathagar.com

মানবের সাথে মানবীর বিয়ে। এ প্রসঙ্গে সূরা আর-রূম-এর পূর্বোক্ত আয়াতটি স্মরণ করা যেতে পারে:

'এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন: তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গী/সঙ্গিনীদের যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।'

আল্লাহপাক জানাচ্ছেন যে, তিনি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও দয়া সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এরই ফলে তারা পরস্পরের নিকট থেকে সুমধুর প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা ও অনুপম শান্তি লাভ করবে। এটি আল্লাহতা'য়ালারই সৃষ্ট বিধান। সুতরাং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক দাতা-গ্রহীতা, প্রভু-ভৃত্য, মনিব-দাস, ইত্যাদি সম্পর্কের মতো হতে পারে না।

মুসলমানের বিয়েতে এই সূরা আন-নিসারই প্রথম আয়াতটি খুৎবা হিসেবে পঠিত হয়। এই আয়াতের মধ্যেই ইসলামের বিয়ের তাৎপর্য নিহিত আছে। আয়াতটিতে আল্লাহ বলছেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ

হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সংগিনীকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি তাদের দু'জন থেকে বহু নর-নারী পৃথিবীতে বিস্তার করেছেন। এবং আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট (আপন অধিকার দাবি) যাচঞা কর এবং ভয় কর জ্ঞাতি-বন্ধন (জরায়ু বন্ধন) ছিন্ন করাকে। - আন নিসা:১ (অংশ)

এ আয়াত আমাদেরকে জানায় যে, দু'জন নারী-পুরুষের বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্য কোন প্রকার দয়া-করুণা নয়। বরং সমানাধিকারসম্পন্ন দু'জন নারী-পুরুষ আল্লাহর সৃষ্টিধারাকে অক্ষুণ্ন এবং চলমান রাখার উদ্দেশ্যেই বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বস্তুতঃ এটিই বিবাহের মৌলিক উদ্দেশ্য।

আল্লাহতা'য়ালার এই সৃষ্টিধারা, অর্থাৎ আশরাফুল মাখলুকাত নাম-পরিচয়-গোত্রবিহীন হবে না। পৃথিবীর অতীত এবং বর্তমান প্রতিটি মানুষের একটি

www.pathagar.com

নাম-পরিচয় বর্তমান। সাধারণভাবে পিতৃপরিচয়েই মানুষ পরিচিত হয়। এটি আল্লাহতা'য়ালারই নির্দেশ (আল-আহযাব:৫) এবং এ নির্দেশ অকারণ নয়। যেহেতু বিশেষ মায়ের গর্ভে বিশেষ সন্তানের জন্মের বিষয়ে পুরো পৃথিবীই সাক্ষী থাকে, সেহেতু মানুষের মাতৃপরিচয়টা গৌণ। কিন্তু বিশেষ পিতার ঔরসেই যে বিশেষ সন্তানের জন্ম, তার প্রমাণ কি, সাক্ষীই বা কে? সাক্ষী এবং প্রমাণ দু'টি এবং কেবলমাত্র দু'টি সত্তা; এক- স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা এবং দুই- সন্তানের গর্ভধারিণী জননী। কেবল এই দুটি সত্তাই জানে, মাতৃগর্ভে যে শিশুটি ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে, তার সঠিক পিতৃ-পরিচয়।

এক জোড়া বিবাহিত দম্পতি যখন একটি সন্তান লাভ করে, তখন সবাই ধরে নেয় যে, নির্দিষ্ট ব্যক্তির ঔরসে সন্তানটি জন্মলাভ করেছে। অতঃপর ঐ ব্যক্তিটির পিতৃত্বের পরিচয়ে শিশুটি বড় হয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু প্রকৃতই নির্দিষ্ট ব্যক্তিটির ঔরসে শিশুটি জন্মলাভ করেছে কিনা, তা নিশ্চিতভাবে জানেন কেবল আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা এবং শিশুটির গর্ভধারণী জননী। সুতরাং একটি শিশুকে নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তির পিতৃত্বে পরিচিত করার অর্থ নারী কর্তৃক শিশুটির পিতৃত্ব সম্পর্কিত সম্পূর্ণ অদৃশ্য-অজ্ঞাত একটি বিষয়ে সাক্ষ্য দান। এ সাক্ষ্যের সাথে নারীর সততা, নৈতিকতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা সব কিছুই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অতএব যে কোন মাপকাঠিতে এটাই হচ্ছে প্রকৃত অদৃশ্যের হিফাজত। অদৃশ্যের হিফাজতের অর্থ অদৃশ্য স্বামীর অসম্ভব হিফাজত অথবা অনুপস্থিত অদৃশ্য স্বামীর দৃশ্যমান সম্পত্তির হিফাজত নয় কোন মতেই।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির কল্যাণে বর্তমানে ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে যে কোন মানুষেরই পিতৃত্ব নির্ণয় করা সম্ভব। সাধারণভাবে ডিএনএ পরীক্ষার প্রশ্নটি তখনই আসে যখন নারীর সততা প্রশ্নবিদ্ধ হয়; অথবা পিতা সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করে। কিন্তু এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া মোটেই অসম্ভব নয় যে, নারীর সততা প্রশ্নবিদ্ধ হলো না; কিন্তু নারীটি বাস্তবে অসৎ। অথবা এমনও হতে পারে যে, পিতা সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করলো না; কিন্তু সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেই অন্যের ঔরসজাত সন্তানকে নিজের সন্তান পরিচয়ে বড় করে তুলতে লাগলো।

যে নারী স্বামী ভিন্ন অন্য কারো ঔরসের সন্তান নিজ গর্ভে ধারণ করলো এবং সন্তানের প্রকৃত পিতৃ-পরিচয় গোপন করলো, সে নারী অদৃশ্যের হিফাজতের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলো, সে আর 'কানিতাত' তথা আল্লাহর হুকুমের প্রতি অনুগত থাকলো না। অর্থাৎ অবৈধ যৌনক্রিয়া এবং অশ্লীলতা থেকে নিজেকে

www.pathagar.com

সে বিরত রেখে আল্লাহর আনুগত্য করে নি। কিন্তু এক্ষেত্রে আল্লাহর যা হিফাজত করার (অর্থাৎ প্রকৃত সত্য), তা তিনি ঠিকই হিফাজত করে রেখেছেন এবং রোজ কিয়ামতের দিন পর্যন্ত এ তথ্য সুরক্ষিত থাকবে। আয়াতের শুরুতে আমরা দেখেছিলাম, আল্লাহতা'য়ালা পুরুষকে যথাযথ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব দিয়েছেন। নিরহংকার-চিত্তে অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে পুরুষ আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের পরিচয় দিয়ে মুমিন হয়ে উঠে। অনুরূপভাবে নারীও সংসার ক্ষেত্রে স্বামী ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের সন্তান নিজ গর্ভে ধারণ না করার মাধ্যমে, তথা আপন জরায়ুর সতীত্বের হিফাজতের মাধ্যমে মুমিনা হয়ে উঠে। এটাই নারী কর্তৃক অদৃশ্যের হিফাজত। এতেই পরিচয় পাওয়া যায় নারীর আল্লাহনুগাত্যের এবং এতেই নারী কানিতাত হয়ে উঠে। সূরা আল-মুমতাহিনার ১২ আয়াতে আমাদের এ বক্তব্যের পক্ষে সুস্পষ্ট দলিল বর্তমান। আল্লাহ বলছেন:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّـهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ۙ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّـهَ ۖ إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

'হে নবী! বিশ্বাসী (মুমিনা) নারীগণ যখন তোমার নিকট আনুগত্যের শপথ (বাইয়াত) করতে এসে বলে যে, 'তারা আল্লাহর সাথে কোন শরীক স্থির করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, অপরের সন্তানকে স্বামীর ঔরসে আপন গর্ভজাত বলে মিথ্যা দাবি করবে না, এবং সৎকার্যে তোমাকে অমান্য করবে না,' তখন তাদের আনুগত্য (বাইয়াত) গ্রহণ করো এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। আল্লাহতো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।' আল-মুমতাহিনা: ১২।

মৌখিকভাবে ঈমান আনার পর, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র নিকট নারীরা যখন আনুগত্য প্রকাশ করার জন্য আসবে, তখন ছয়টি শর্ত পালন সাপেক্ষে তাদের আনুগত্য গ্রহণ করার জন্য আল্লাহতা'য়ালা তাঁর নবী (সাঃ)কে নির্দেশ দিয়েছেন। এ ছয়টি আর কিছু নয়, ঈমান আনার পর একজন নারীর মৌলিক কর্তব্যসমূহ মাত্র। লক্ষণীয়, এ শর্তসমূহের কোথাও স্বামীর প্রতি নিরংকুশ আনুগত্য প্রদর্শনের কথা বলা হয়নি। শুধু তাই নয়, পঞ্চম শর্তটিতে অত্যন্ত

www.pathagar.com

পরিষ্কার ভাষায় স্বামী ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের ঔরসের সন্তান স্ত্রীর নিজ গর্ভে ধারণ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। বস্তুত এটিই সেই অদৃশ্যের হিফাজত, যার মাধ্যমে একজন নারী মুমিনা হতে পারে, হতে পারে আল্লাহর প্রতি অনুগত - 'কানিতাত'।

আয়াতটিতে আরো একটি বিষয় গুরুত্বের দাবিদার। এটিতে স্বামীর প্রতি নিরংকুশ আনুগত্যের কথা কোথাও যে শুধু বলা হয়নি তা নয়, এমনকি খোদ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র প্রতিও নিরংকুশ আনুগত্য প্রদর্শন করার জন্য বলা হয় নি। ষষ্ঠ শর্তটিতে বলা হয়েছে সৎকার্যে তথা ন্যায়-কল্যাণকর বিষয়ে নবী (সাঃ)কে নারী অমান্য করবেনা। নবী (সাঃ) পুরুষ বা নারী কাউকেই কখনো অন্যায় বা মন্দ নির্দেশ দিতে পারেন তেমন ধারণা মনে স্থান পেলেও মহাপাপ হয়ে যাবে। অথচ তেমন নবী (সাঃ)কে মান্য করার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহপাক সৎকার্যের শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। অতএব এটি নির্দ্বিধায় বলা যায় যে স্বামীর প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যের নির্দেশ মহান আল্লাহ কখনই দেন নি, দিতে পারেন না। আয়াতে যে আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে, সূরা আল-মুমতাহিনার ১২ আয়াতের আলোকেও প্রমাণিত হয় যে, সেটি নিঃসন্দেহে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য। আল্লাহর নির্দেশ পালন এবং অর্পিত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের প্রমাণ দিতে হয়।

'সালিহাত্' এবং 'কানিতাত' শব্দ দুটির উপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে এবং অদৃশ্যের হিফাজতের ব্যাপারে সুদীর্ঘ আলোচনার পর আমরা আলোচ্য আয়াতাংশে 'ফাসসালিহাতু কানিতাতুন হাফিজাতুন লিল গায়বি বিমা হাফিজাল্লাহ' এর যে অর্থ পাই তা হলো:

'সুতরাং সৎকর্মপরায়ণ নারীরা আল্লাহনুগত হয় এবং আল্লাহর হিফাজতে অদৃশ্যের হিফাজত করে।'

৪.৩. নারীর নুশূজের আশংকা ও তা দূরীকরণ

আয়াতটির সর্বশেষ অংশে আল্লাহ বলেন:

স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার (নুশূজ) আশংকা কর, তাদের সদুপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা বর্জন কর, এবং তাদের প্রহার কর। যদি তারা তোমাদের অনুগতা হয়ে যায়, তবে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অন্বেষণ করো না। আল্লাহ মহান, শ্রেষ্ঠ।

এটি ই.ফা.বা. কর্তৃক অনূদিত কুরআনুল করীমের অনুবাদ। আয়াতে ব্যবহৃত দু'টি শব্দ, 'অবাধ্যতা' এবং 'অনুগত হওয়া' পরস্পর বিপরীতার্থক। কুরআন মজীদের মূল বাণীতে এ শব্দ দু'টির জন্য ব্যবহৃত শব্দদ্বয় একে অপরের

www.pathagar.com

সমার্থক নয় বা তারা একই মূল শব্দ থেকে উৎপন্ন নয়। বরং তারা সম্পূর্ণ মৌলিক দুটি শব্দ। শব্দ দুটি হচ্ছে যথাক্রমে 'নুশূজ' এবং 'ইত'আত'। আমরা ইতিপূর্বে বলেছি, 'নুশূজ' শব্দটির অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার বিভিন্নভাবে করেছেন। এর অনুবাদে 'অবাধ্যতা', 'ঔদ্ধত্য', 'বিদ্রোহাত্মক আচরণ', 'disloyality and ill conduct' ইত্যাদি শব্দ সুবিধামত ব্যবহৃত হয়েছে। অপরদিকে 'ইতআত' শব্দটিকে এর বিপরীতার্থক বলে ধরে নেয়া হয়েছে।

৪.৩.১. প্রচলিত ব্যাখ্যার বিশ্লেষণ

লক্ষণীয় বিষয় হলো 'নুশূজ' শব্দের অনুবাদে যে সব শব্দ ব্যবহার করা হয়, তার সবগুলোই কোনো সীমা বা সংজ্ঞাবিহীন শব্দ। চেষ্টা করেও ঐ সব শব্দের সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া সম্ভব নয়। এতে একটি বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায়। তা হলো, ইচ্ছামতো যে কোন তুচ্ছ বিষয়কে নারীর 'নুশূজ' আচরণ আখ্যা দিয়ে তার উপর জবরদস্তি শাসন কায়েম রাখা যায়। নারীর কণ্ঠ স্তব্ধ করে রাখা যায়। ফলে প্রাপ্ত ব্যাখ্যাসমূহে 'নুশূজ' শব্দের যে অর্থই গ্রহণ করা হোক না কেন, এর কোন সীমা বা সংজ্ঞা নিরূপণের কোন প্রয়াস কিন্তু লক্ষ্য করা যায় না, অথবা শব্দটির ব্যাখ্যায় বিশদ কিছু বলতে দেখা যায় না। শব্দটির ব্যাখ্যায় যত কম কথা বলা যায়, নারীর উপর পুরুষের প্রভুত্ব-কর্তৃত্বের ব্যাপ্তিও তত দীর্ঘতর হয়।

এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম ই.ফা.বা কর্তৃক প্রকাশিত 'কুরআনুল করীমের' ছোট একটি পাদটিকা। আলোচ্য আয়াতে 'নুশূজ'-এর আশংকা দূরীকরণের জন্য প্রদত্ত বিধানের টিকায় উক্ত গ্রন্থে লেখা হয়েছে, "স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে এইসব ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। এইগুলি তালাকের পূর্বাবস্থায় প্রযোজ্য।..." এ টিকা পড়ে পাঠক নির্ঘাত হোঁচট খেতে বাধ্য হবেন। কারণ অনুবাদে বলা হলো স্ত্রীর অবাধ্যতার জন্য গৃহীতব্য ব্যবস্থা, আর পাদটিকায় বলা হচ্ছে স্ত্রী ব্যভিচারিণী হলে গৃহীতব্য ব্যবস্থা। তবে কি 'নুশূজ'-এর অর্থ নারীর ক্ষেত্রে ব্যভিচারিণী? এমন প্রশ্নের উদ্রেক অত্যন্ত সঙ্গত। অবশ্য ই.ফা.বা.-র এ পাদটিকাটি ছাড়া অপরাপর সকল ব্যাখ্যা থেকে এ ধারণাই জন্মায় যে, স্বামীর নির্দেশ অমান্য করাই স্ত্রীর 'নুশূজ' তথা অবাধ্যতা। নির্দেশটি ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত, বৈধ-অবৈধ ইত্যাদি বিবেচনার কোন এখতিয়ার স্ত্রীর নেই। কেউ কেউ অবশ্য স্বামীর অন্যায় নির্দেশ অমান্য করা যায় বলে অভিমত প্রকাশ

www.pathagar.com

করে থাকেন। তবে ব্যাপারটি তাদের নিজেদের যুক্তিকাঠামোতেই অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, স্বয়ং নির্দেশদাতাই যেখানে বিচারক, সেখানে নির্দেশ পালনকারীর কোন ক্ষমতাই থাকে না নির্দেশের গুণাগুণ বিচারের। এ ধরনের ব্যাখ্যা নারীকে, বিশেষ করে স্ত্রীকে দাসীর সমগোত্রীয় করে ফেলে। অতএব এমন ব্যাখ্যা কখনই ইসলামসম্মত হতে পারে না।

এটি অনস্বীকার্য যে একটি ইসলামী সমাজে বা একটি ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য বিচারক নির্বাচন অত্যন্ত দুরূহ কাজ। ভালো একজন বিচারক হওয়ার জন্য একজন ব্যক্তিকে শরিয়ত, ফিকাহ্‌শাস্ত্র এবং উসূলশাস্ত্রের ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করতে হয়। এছাড়াও ব্যক্তিটির মধ্যে যাবতীয় মানবিক গুণাবলীর স্বীকৃত এবং পরীক্ষিত সমাবেশ একান্ত আবশ্যক। সঠিক এবং সৎ বিচারক নির্বাচন পদ্ধতিটি এত বেশি গুরুত্বের দাবিদার যে, এ বিষয়ে ইসলামী পণ্ডিতগণ বহু গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। এছাড়াও আমরা ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখতে পাই আবদুল্লাহ ইবনে উমরের (রাঃ) মত মর্যাদাশীল পণ্ডিত সাহাবা, ইমাম আযম আবু হানিফা (রহঃ) এবং আরো অনেক সুপণ্ডিত জ্ঞানী ব্যক্তিকে বিচারকের দায়িত্বশীল সম্মানজনক পদ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করতে।

একটি সমাজের প্রত্যেক পুরুষকে শরীয়ত বিষয়ে, ফিকাহ এবং উসূল শাস্ত্রে সমানভাবে শিক্ষাদান কখনই সম্ভব নয়। প্রত্যেক মানুষকে সমান তাকওয়াসম্পন্ন সৎ-বিবেকবান মানুষে পরিণত করাও কখনো সম্ভব নয়। এতদসত্ত্বেও এ আয়াতের ব্যাখ্যায় স্ত্রীদের আনুগত্য আদায় ও অবাধ্যতার বিচারের দণ্ড নিশ্চিন্তে স্বামীদের হাতে তুলে দেয়াটা কতখানি ভ্রমাত্মক তা সহজেই অনুমেয়। এরই কুফল হিসাবে আমরা দেখতে পাই, ইসলাম বা কুরআন-হাদীস সম্পর্কে, উসূল বা ফিকাহ্‌ শাস্ত্র সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞানবিহীন মুসলিম ব্যক্তি মাত্রই জানে যে ইসলাম স্বামীকে স্ত্রীর সার্বক্ষণিক এবং নিরংকুশ আনুগত্য আদায়ের সুযোগ দেয়। একই সাথে আনুগত্যহীনতার আশংকা সৃষ্টি হলে (প্রমাণিত আনুগত্যহীনতা নয়) স্বামীকে স্ত্রী-প্রহারের তথা স্ত্রীর বিচারের অনুমতি দেয়। অথচ প্রকৃত সত্য কখনই তা হতে পারে না। কখনই একজন ব্যক্তি অপর একজন ব্যক্তির কিংবা স্বামী তার স্ত্রীর সার্বক্ষণিক এবং সর্বকর্মের বিচারক হতে পারে না। কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তি বা প্রত্যেক স্বামীর পক্ষে বিচারক হওয়ার মতো প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও গুণাবলী অর্জন কখনই সম্ভব নয়।

বলা হয়ে থাকে, এ আয়াতে স্ত্রীদের অবাধ্যতার শাস্তির বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। এ ধরনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আয়াতে ব্যবহৃত অপর একটি শব্দ

www.pathagar.com

সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়। ফলে তখন 'নুশূজ' শব্দের অর্থ সীমা-সংজ্ঞাবিহীন অবাধ্যতা বলে চালিয়ে দেয়া সহজ হয়। আয়াতে বলা হয়েছে, "ওয়াল্লাতী তাখাফুন্না নুশূজাহুন্না .....," অর্থাৎ "যাদের 'নুশূজ' এর আশংকা কর ....."। আয়াতে 'নুশূজ'-এর আশংকার কথা বলা হয়েছে এবং 'নুশূজ' এর আশংকা দেখা দিলে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিধান দেয়া হয়েছে। 'নুশূজ' অর্থাৎ তথাকথিত অবাধ্যতার কথা বলা হয়নি বা অবাধ্যতার শাস্তির বিধানও আয়াতে বর্ণিত হয়নি।

কুরআন মজীদে চুরি অথবা যিনার মতো নির্দিষ্ট সমাজ কলুষকারী অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তির বিধান দেয়া হয়েছে। কিন্তু সন্দেহের বশবর্তী হয়ে আশংকা বা অনুমানের ভিত্তিতে কাউকে শাস্তি প্রদান করা কুরআনের নির্দেশের বিপরীত শুধু নয়, বরং এভাবে সিদ্ধান্ত নিতে সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহপাক সূরা আন-নিসাতেই বলছেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا

হে মুমিনগণ! তোমরা যখন আল্লাহর উদ্দেশ্যে সফরে বের হও, তখন (শত্রু-মিত্র) যাচাই করো; কেউ তোমাদের পূর্বাহ্নেই সালাম দিলে, সহসা তাকে বলে ফেলোনা যে, 'তুমি মুমিন নও।' আননিসাঃ ৯৪ (অংশ)।

অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে মহান আল্লাহ এ ব্যাপারে নিষেধ করছেন যে, কারো সালাম প্রদানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে, অনুমানের উপর নির্ভর করে তাকে মু'মিন নয় বলে ঘোষণা করা যাবে না। এমনকি নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্যও কারো সালামের প্রত্যুত্তরে তাকে মুমিন নয় বলে ঘোষণা করা যাবে না। সূরা আল-হুজুরাত-এ আল্লাহ পাক আরো বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

হে বিশ্বাসীগণ! যদি কোন সত্যত্যাগী (ফাসেক) ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন বার্তা নিয়ে আসে, তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়কে আঘাত না কর, এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মে জন্য অনুতপ্ত না হও। হুজুরাতঃ ৬

আল-হুজুরাত-এ আল্লাহ পাক আরো বলেনঃ

www.pathagar.com

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কল্পনা (খারাপ ধারণা) থেকে বিরত থাক। কারণ, কোন কোন ক্ষেত্রে কাল্পনিক ধারণা-অনুমান পাপ। এবং তোমরা একে অপরে গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করোনা ও একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা তা ঘৃণাই করবে। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।"
হুজুরাত: ১২

সূরা ইউনূসের ৩৬ ও ৬৬ আয়াতে, আন-নাজমের ২৩ আয়াতেও অনুমান-নির্ভর সিদ্ধান্তের কুফল সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও কুরআন মজীদে আরো অনকেগুলো আয়াতে অনুমানের ভিত্তিতে কিছু না বলা বা না করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। দেখা যাচ্ছে অনুমান বা সন্দেহের ভিত্তিতে কারো বিরুদ্ধে কখনই কোন সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না। এটা মহান আল্লাহতা'য়ালার কঠোর নির্দেশ। আর আশংকাতো অনুমান-সন্দেহেরই নামান্তর। অথচ আন-নিসার আলোচ্য আয়াতাংশের প্রচলিত ব্যাখ্যায় বলা হয়ে থাকে স্ত্রীদের 'নুশূজ'-এর (তথাকথিত অবাধ্যতা বা আনুগত্যহীনতা) আশংকা দেখা দিলে তাদেরকে বিভিন্নভাবে শাস্তি প্রদান করতে হবে। কিন্তু সন্দেহ-অনুমান-আশংকার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কুরআন মজীদের উপরোল্লিখিত আয়াত তিনটির ভিত্তিতে অবৈধ। 'নুশূজ'-এর অর্থ যদি 'অবাধ্যতা' বা 'আনুগত্যহীনতা' বিবেচনা করা হয়, তাহলে আল্লাহর বাণীতেই স্ববিরোধিতা আরোপ করা হয় (নাউজুবিল্লাহ)। সুতরাং কুরআনের আলোকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, 'নুশূজ' শব্দের অর্থ 'অবাধ্যতা' বা 'আনুগত্যহীনতা'র মতো সীমা-সংজ্ঞাহীন অপরাধ নয়, বরং এটি এমন কোন অপরাধ যা সংঘটনের আশংকা দেখা দিলেই তা প্রশমনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে।

এখন আমাদের সামনে দু'টি অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন উপস্থিত: (১) 'নুশূজ' অর্থাৎ তথাকিথত আনুগত্যহীনতা বা অবাধ্যতার মতো সীমা-সংজ্ঞাহীন আচরণের আশংকার জন্যই কি আয়াতে বর্ণিত ব্যবস্থাদি প্রদান করা হয়েছে? না কি 'নুশূজ'-এর অন্য কোন অধিকতর গুরুত্ববহ অর্থ রয়েছে, যার আশংকা দেখা

www.pathagar.com

দেয়া মাত্রই সাবধানতা অবলম্বন আবশ্যক হয়ে পড়ে? (২) আয়াতে 'নুশূজ'-এর আশংকা দূরীকরণের জন্য যে বিশেষ ব্যবস্থার বিধান দেয়া হয়েছে তা যদি শাস্তিই না হবে, তবে কিসের বিধান এসব? আশা করা যায়, পরবর্তী আলোচনায় প্রশ্ন দুটির জবাব এবং একই সাথে আয়াতাংশটির যৌক্তিক ব্যাখ্যা বেরিয়ে আসবে।

৪.৩.২. ইসলামে দাম্পত্য জীবনের স্বরূপ

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, সূরা আল-বাকারার ২২৮ আয়াতে আল্লাহতা'য়ালা বলেছেন, *'নারীদের তেমন ন্যায়সংগত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের একমাত্রা অধিক মর্যাদা আছে।'* এ কারণে পুরুষকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে নারীর তথা পরিবারের ভরণপোষণ ও অভিভাবকত্বের। কিন্তু এই একমাত্রা মর্যাদার বলে পুরুষ নারীর সীমা-সংজ্ঞাহীন আনুগত্যের দাবিদার হয়ে যায় না। একমাত্রা মর্যাদার অর্থ সীমাহীন মর্যাদা নয়, তা কেবল একমাত্রা-ই। আমরা আরো দেখেছি আল্লাহপাক সূরা আলে-ইমরানের ১৯৫ আয়াতে বলেছেন, *'আমি তোমাদের মধ্যে কোন কর্মে-নিষ্ঠ নর অথবা নারীর কর্ম বিফল করিনা; তোমরা একে অপরের সমান।'* এছাড়া সূরা আত-তাওবার ৭১ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, *'মুমিন এবং মুমিনা (ঈমানদার নারী ও পুরুষ) পরস্পর পরস্পরের আউলিয়া (বন্ধু, পৃষ্ঠপোষক, অভিভাবক)।'* আবার আল-বাকারার ১৮৭ আয়াতে বলছেন, *'তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ।'*

আল্লাহ একদিকে বলবেন পুরুষ ও নারী একে অপরের সমান; একে অপরের আউলিয়া এবং একে অপরের পরিচ্ছদ। আবার অপরদিকে বলবেন স্বামী তার স্ত্রীর সীমাহীন আনুগত্যের দাবিদার ও আনুগত্যহীনতার আশংকা দেখা দিলে স্ত্রীকে বিধান মোতাবেক শাস্তি প্রদান করতে হবে। আল্লাহতা'য়ালার বাণী এবং বিধান কখনই এমন পরস্পরবিরোধী হতে পারে না। দু'টি সমান সত্তা, যারা একে অপরের পরিচ্ছদ ও আউলিয়া, তারা কখনো একে অপরের সীমাহীন আনুগত্য দাবি করতে পারে না। দু'জন মানুষ কখনো সার্বিকভাবে এবং সকল বিবেচনায় সমান হয় না। পুরুষ-নারী নির্বিশেষে যে কোন দু'জন ব্যক্তিকে তুলনা করলে দেখা যাবে বর্ণ, গোত্র, আর্থিক অবস্থা, শারীরিক সক্ষমতা, ইত্যাদি কোনকিছুতেই তারা সার্বিকভাবে পরস্পরের সমান নয়। কিছু না কিছু পার্থক্য উভয়ের মধ্যে থেকেই যায়। দু'জন মানুষের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক

www.pathagar.com

.প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এসব পার্থক্য কখনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। মর্যাদার দিক থেকে সমান হলেই দু'জন মানুষ সকল পার্থক্য ভুলে পরস্পর বন্ধু হয়ে যেতে পারে। অনুরূপভাবে দৃশ্যমান যত পার্থক্যই থাকুক, নারী-পুরুষ তথা স্বামী-স্ত্রী মর্যাদার দিক থেকে পরস্পরের সমান আসনে প্রতিষ্ঠিত না হলে, কখনোই একে অপরের আউলিয়া বা পরিচ্ছদ হতে পারে না।

সূরা আল-বাকারার ২৩৩ আয়াতে আল্লাহপাক বলেন:

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

'কিন্তু তারা যদি পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে স্তন্য-পান বন্ধ রাখতে চায়, তবে তাদের কোন অপরাধ নেই।' আল-বাকারা:২৩৩(অংশ)।

এ আয়াতাংশে দুই বিবদমান স্বামী-স্ত্রী, যাদের মধ্যে বিচ্ছেদ অবধারিত হয়ে গিয়েছে অথচ তাদের দুগ্ধপোষ্য সন্তান রয়েছে, তাদের ব্যাপারে বিধান ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহতা'য়ালা জানাচ্ছেন, সন্তানকে স্তন্য-দানের বিষয়টি স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্মতি ও পরামর্শক্রমে সমাধা করতে হবে। এমন জটিল ক্ষেত্রেও একের সিদ্ধান্ত অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়া যাবে না। দুগ্ধপোষ্য সন্তানের জীবনধারণের প্রধান উপকরণের ব্যাপারে এটাই হচ্ছে মহান আল্লাহর সিদ্ধান্ত। সুতরাং এটা সহজেই অনুধাবনযোগ্য যে, স্বামী-স্ত্রীর পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটির নিত্যদিনের খুঁটিনাটি সকল বিষয়াদি আল্লাহতা'য়ালার সিদ্ধান্ত অর্থাৎ পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতেই পরিচালিত হবে। প্রভুত্ব কায়েমকারী, স্বৈরাচারী মনোবৃত্তিসম্পন্ন দু'একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে অনাদিকাল থেকে নিশ্চয় এমনটিই ঘটে আসছে।

আল্লাহ্পাক আরও বলেন:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

'এবং তাদের সাথে সৎ সুন্দরভাবে জীবন যাপন কর।' আন-নিসা:১৯ (অংশ)।

দুর্বলের প্রতি সবলের অথবা অক্ষমের প্রতি সক্ষমের অত্যাচার, জুলুম, নির্যাতনের মধ্য দিয়ে সংসার জীবন-যাপন নয় বরং সৎ ও সুন্দর আচরণের মধ্য দিয়ে স্ত্রীদের সাথে সংসার জীবন যাপনের নির্দেশ দিচ্ছেন মহান আল্লাহ। সূরা আশ-শূরার ৩৮ আয়াতে আল্লাহতা'য়ালা আরও বলেন:

www.pathagar.com

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

'যারা তাদের প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের ভিত্তিতে কার্যাদি সম্পন্ন করে এবং আমি যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। (তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে আল্লাহর কাছে।)' আশ-শূরা: ৩৮

সূরা আশ-শূরার ৩৬ থেকে ৪১ পর্যন্ত আয়াতসমূহে যারা আল্লাহর উপর প্রকৃত ঈমান আনে এবং জীবনের সকল অবস্থায় আল্লাহর উপর নির্ভর করে তাদের বিভিন্ন গুণাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে। ৩৮ আয়াতে উল্লেখিত কয়েকটি গুণাবলীর অন্যতম হচ্ছে নিজেদের মধ্যে পরামর্শের ভিত্তিতে কার্যাদি সম্পন্ন করা। এ আয়াতের ভিত্তিতে কুরআনের প্রায় সকল ব্যাখ্যাকার একমত যে, রাষ্ট্রীয়-সামাজিক কার্যাদি যেমন পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে হওয়া উচিত, ঠিক তেমনি পারিবারিক-দাম্পত্য বিষয়াদিও স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক শলা-পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হওয়া উচিত এবং এটাই আল্লাহর নির্দেশ। সূরা রূমের ২১ আয়াতে আল্লাহতা'য়ালা আরও বলেন:

"এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন: তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সংগী/সংগিনীদেরকে, যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।" আর-রূম: ২১(অংশ)

স্বামী যদি সর্বক্ষণ স্ত্রীর আনুগত্য দাবিই করতে থাকে, অথবা স্ত্রী যদি সর্বক্ষণ স্বামীর নির্দেশের একান্ত বাধ্য সেবিকা হয়েই কাটায়, তাহলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও দয়া কখনই সৃষ্টি হবে না। তাদের মধ্যে বড় জোর প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু কখনই ভালোবাসার সম্পর্ক সৃষ্টি হবে না। সূরা আর-রূমের ২১ আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর নিদর্শন তখনই কেবল দেখতে পাওয়া যাবে, যখন আনুগত্য বা বাধ্য থাকার বিষয়াবলী হবে পারস্পরিক। ঠিক যেমন করে আল্লাহতা'য়ালা সূরা আন-নিসার প্রথম আয়াতে আল্লাহর দোহাই দিয়ে পরস্পরের নিকট পরস্পর অধিকার দাবির কথা বলেছেন।

www.pathagar.com

স্বামী-স্ত্রীর পরিবার নামক এ প্রতিষ্ঠান সূরা আল-বাকারার ২২৮ আয়াত এবং সূরা আন-নিসার ১ আয়াতে বর্ণিত দু'জন সমান অধিকারসম্পন্ন নর-নারীর প্রতিষ্ঠান। সূরা আল-বাকারার ১৮৪ আয়াত, সূরা আত-তাওবার ৭১ আয়াত এবং সূরা আলে-ইমরানের ১৯৫ আয়াত অনুযায়ী এ প্রতিষ্ঠানের সদস্য দু'জন পরস্পর পরস্পরের সমান, এরা একে অপরের আউলিয়া এবং একে অপরের পরিচ্ছদ। এদের পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয় সূরা আল-বাকারা: ২৩৩, আন-নিসা: ১৯, আশ-শূরা: ৩৮ এবং আর-রূম: ২১ আয়াত অনুযায়ী পারস্পরিক শলা-পরামর্শ, সমঝোতা, সহমর্মিতা, স্নেহ-ভালবাসা-প্রেম-প্রীতির আদান প্রদানের ভিত্তিতে। আল্লাহর কালাম অনুযায়ী এটাই দু'জন মুমিন-মুমিনার সংসারের প্রতিচ্ছবি।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, স্বামী-স্ত্রীর পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটিতে কি কেবল প্রেম-প্রীতি-স্নেহ-ভালোবাসার স্রোতই বইতে থাকবে? সকল অবস্থাতেই কি এখানে পারস্পরিক শলা-পরামর্শ বা সমঝোতা-সহমর্মিতার পরিবেশ বিরাজ করবে? কথিত আদর্শ অবস্থার ব্যত্যয় কি কখনো ঘটে না বা ঘটতে পারবে না? আদর্শ অবস্থা থেকে বিচ্যুতি সব সময়েই ঘটতে পারে। বিশেষতঃ আল্লাহ কর্তৃক স্থাপিত আদর্শ থেকে বিচ্যুতি ঘটাবার ব্যাপারে ইবলিস-শয়তানতো সবার অলক্ষ্যে সদাসর্বদা ক্রিয়াশীল এবং তৎপর রয়েছে।

স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য বর্তমান। একজন পুরুষ এবং অপরজন নারী। একজন শারীরিকভাবে সাধারণতঃ তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী এবং অপরজন দুর্বল। আমরা দেখেছি আল্লাহতা'য়ালা পুরুষকে যে বিশেষ অনুগ্রহটি করেছেন, সেটি দৃশ্যতঃ তার শক্তি; এবং এই শারীরিক শক্তির কারণেই পুরুষকে নারীর ভরণপোষণ এবং তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আল্লাহতা'য়ালা পুরুষকে শক্তি প্রদান করে এমন নিশ্চয় ভাবেননি যে, প্রদত্ত শক্তি শুধু দ্বীনের কর্মে, সৎপথে, গঠনমূলক কর্মে, মানবতার প্রয়োজনে এবং পরিবারের কল্যাণেই ব্যয়িত হবে; এবং কখনই এর কোন অপব্যবহার হবে না। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাঁর সৃষ্টির মধ্যে দুর্বলচিত্ত পুরুষ এবং শয়তানের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেবহাল। আর তাই এই সূরা আন-নিসার ১৯ আয়াতে আল্লাহপাক আরো বলেন:

'তোমরা যদি তাদের ঘৃণা কর, তবে এমন হতে পারে যে আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন, তোমরা তাকেই ঘৃণা করছ।' ৪: ১৯ (অংশ)

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ অবশ্যই জানেন যে, যার শক্তি অধিক, সে কখনো কখনো দুর্বলের উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন করতে পারে। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, অত্যাচার বা উৎপীড়নের ফলে দুর্বল পক্ষ যদি অবনত না হয়, তবে শক্তিশালী পক্ষ পরবর্তীতে তাকে ঘৃণা করবে। এই অত্যাচার, উৎপীড়ন, ঘৃণা, অবহেলা ইত্যাদি আল্লাহর বিধানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। অতঃপর আল্লাহতা'য়ালা স্পষ্ট ভাষায় ঘৃণার পথ, অত্যাচার নির্যাতনের পথ পরিহারের নির্দেশ দিচ্ছেন। শক্তিমান পুরুষ যদি প্রাত্যহিক কর্মে অন্যায়, অত্যাচার, নির্যাতন, ঘৃণা ইত্যাদি অবদমন করে দুর্বল নারীর সাথে সৎভাবে জীবনযাপনে সচেষ্ট হয়, তবে পুরুষ-নারীর সংসারটি তখন কেবল গৃহ নয়, আল্লাহর সার্বক্ষণিক ইবাদতের স্থান, শান্তির নীড়ে পরিণত হবে। পুরুষের শক্তি তখন নারীর আনুগত্য আদায়ের জন্য ব্যয়িত না হয়ে, আল্লাহর পথে ও মানবতার প্রয়োজনে ব্যয়িত হয়। আর মানুষের জীবনেও তখন আল্লাহর রাহমাত-করুণা নিত্য বহমান হয়।

৪.৩.৩. 'নুশূজ'-এর স্বরূপ বিশ্লেষণ

আমরা দেখেছি 'নুশূজ' শব্দের অর্থ কখনো 'অবাধ্যতা', কখনো 'ঔদ্ধত্য', কখনো 'বিদ্রোহাত্মক আচরণ', 'Disloyality and ill conduct' ইত্যাদি করা হয়েছে। এ শব্দসমূহ এমন যে এগুলোর কোন ব্যাখ্যা বা সীমা-সংজ্ঞা নিরূপণ করা যায় না। যেমন 'নুশূজ' অর্থ যদি অবাধ্যতা ধরা হয়, তাহলে কোন্ বিশেষ আচরণকে অবাধ্যতা বলা হবে, সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার অবকাশ থেকে যায়। অর্থাৎ অবাধ্যতা সংক্রান্ত একটি বিস্তারিত আচরণবিধিও একই সঙ্গে প্রণয়ন করা আবশ্যক হয়ে পড়ে, যা লংঘিত হওয়ার আশংকা দেখা দিলেই শাস্তি প্রদানের কথা উঠবে।

দাম্পত্য জীবনের স্বরূপ অনুসন্ধান করতে গিয়ে পবিত্র কুরআনের আলোকে আমরা যা পেয়েছি তা হলো স্বামী-স্ত্রীর পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটি দু'জন সার্বিক সমানাধিকারসম্পন্ন পুরুষ ও নারীর প্রতিষ্ঠান। কুরআনের বাণী অনুযায়ী এ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে পারস্পরিক শলা-পরামর্শ, সমঝোতা, সহমর্মিতা, প্রেম-ভালোবাসা-স্নেহ-প্রীতি আদান প্রদানের ভিত্তিতে। শক্তিমদমত্ততার স্থান এ প্রতিষ্ঠানে নেই। এ প্রতিষ্ঠানের এক পক্ষ ঘৃণাবশতঃ অপরপক্ষের উপর অত্যাচার-জুলুম-নির্যাতন চালাবে তা আল্লাহ পছন্দ করেন না। আমরা এ সবই দেখেছি উপরের আলোচনায়। কিন্তু সারা কুরআন মজীদ জুড়ে এমন একটি বাণীও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে বাণীটিকে স্ত্রীর আনুগত্যের

www.pathagar.com

সীমা নির্ধারক বলা যাবে। অর্থাৎ 'নুশূজ' নামক কর্মটিকে কোনভাবে স্ত্রীর আনুগত্যহীনতা বা অবাধ্যতার মতো সাধারণ অপরাধ বলে চালানো যাবে না।

কিন্তু এটাও সত্য যে, 'নুশূজ' এমন একটি আচরণ, যার আশংকা দেখা দিলেই তা নির্মূল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করার পথ বাৎলে দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহতা'য়ালা। সুতরাং নিঃসন্দেহে এটি একটি গুরুতর গর্হিত কর্ম। কিন্তু অনুগত থাকার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কেউ আনুগত্য করছে না এমন আশংকার সৃষ্টি হলেই তাকে শাস্তি দেয়া যাবে কি? অনুরূপভাবে বাধ্য থাকার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কারো মধ্যে অবাধ্যতার আশংকা দেখা দিলে তাকে শাস্তি দেয়া যাবে কি?

প্রসঙ্গক্রমে মোল্লা নাসির উদ্দিন হোজ্জার একটি কৌতুক উল্লেখ করা যেতে পারে। একদা হোজ্জার কন্যা মাটির কলসি নিয়ে পানি সংগ্রহে যাচ্ছিল। হোজ্জা তাকে সজোরে এক চড় কষিয়ে বললেন, খবরদার কলসি যেন না ভাঙে। হোজ্জার স্ত্রী অকারণে কন্যাকে প্রহারের প্রতিবাদ জানালে হোজ্জা বললেন, 'কলসি যদি ভেঙেই ফেলতো চড় মেরে আর কী লাভ হবে।' আশংকা সৃষ্টি হওয়ামাত্র শাস্তি প্রদান কৌতুকের বিষয় হতে পারে, কুরআনের বাণী হতে পারে না। সুতরাং আনুগত্যহীনতা বা অবাধ্যতার আশংকা দেখা দেয়ামাত্রই শাস্তি বা অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ নেহায়ত অমানবিক এবং আল্লাহর বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। আবার একথাও সত্য, আল্লাহতা'য়ালা আলোচ্য আয়াতে 'নুশূজ'-এর আশংকার কথাই বলেছেন। অতএব 'আশংকা' শব্দটিকে উপেক্ষা করার কোন উপায় নেই। কারণ এই 'আশংকা' শব্দটিই প্রমাণ করে যে 'নুশূজ' আনুগত্যহীনতা বা অবাধ্যতার মতো কোন সাধারণ বিষয় নয়, বরং এটি পারিবারিক জীবনে মহাপ্রলয় সৃষ্টিকারী গুরুতর কোন বিষয়। আল্লাহতা'য়ালা কুরআনপাকে চুরির অপরাধে হাত কাটার এবং হত্যার বদলে হত্যার বিধান ঘোষণা করেছেন। কিন্তু কেউ চুরি করবে অথবা হত্যা করবে এ আশংকায় কারো বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান তিনি দেন নি।

আমরা দেখেছি, পূর্ববর্তী আয়াতাংশে আল্লাহতা'য়ালা বলেছেন, "সৎকর্মপরায়ণ এবং আল্লাহানুগত নারী আল্লাহর হিফাজতে অদৃশ্যের হিফাজত করে।" যে নারী কেবল স্বামীর ঔরসের সন্তানই নিজ গর্ভে ধারণ করে, সে-ই প্রকৃত সৎকর্মপরায়ণ এবং আল্লাহনুগত নারী। পক্ষান্তরে যে নারী অদৃশ্যের হিফাজত করেনি; অর্থাৎ স্বামী ভিন্ন অন্য কারো সন্তান নিজ গর্ভে ধারণ করে এবং স্বামীর পিতৃত্বের মিথ্যা পরিচয় দেয়, সে সৎকর্মপরায়ণ নয় বা আল্লাহনুগতও নয়।

www.pathagar.com

আনুগত্যের যে নির্দিষ্ট সীমা মহান আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সে তা লংঘন করেছে। লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, আনুগত্যের এ নির্দিষ্ট সীমা কোন নারী সীমান্ত অতিক্রম করার মত মুহূর্তের মধ্যে অতিক্রম করে না। বরং রীতিমতো দীর্ঘ একটি কাল এ সীমান্তের আশেপাশে পদচারণা করে। অতঃপর একসময় সীমারেখা অতিক্রম করে যায়। আল্লাহর দৃষ্টিতে এ সীমারেখার নিকটবর্তী হওয়াও পাপ। পবিত্র কুরআনের অনন্য বর্ণনাভঙ্গি:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ

'এগুলি আল্লাহর সীমারেখা, সুতরাং এগুলির নিকটবর্তী হয়োনা।' আল-বাকারা: ১৮৭(অংশ)

আল্লাহর এ বাণী যে কোন অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কোন গুরুতর অপরাধ সংঘটনের পূর্বে চিন্তা-কর্মে অনেক লঘু অপরাধ সংঘটিত হতে থাকে, যেগুলি অপরাধীকে নির্দিষ্ট সীমারেখার নিকটবর্তী হতে প্ররোচিত করে। অতঃপর গুরুতর অপরাধটি সংঘটনের মাধ্যমে অপরাধী সীমা লংঘন করে ফেলে।

'কানিতাত' তথা আল্লাহানুগত্যের নির্দিষ্ট সীমারেখাটি হচ্ছে নারী স্বামী ভিন্ন অন্য কারো ঔরসের সন্তান নিজ গর্ভে ধারণ করবে না। কিন্তু কোন নারী যদি স্বামী ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের ঔরসের সন্তান নিজ গর্ভে ধারণ করে, তবেতো সে নির্দিষ্ট সীমারেখা অতিক্রম করেই ফেললো। এটি তখন আর 'নুশূজ' রইল না। নারী তখন ব্যভিচারের অপরাধ করে ফেললো। ব্যভিচার তথা যিনার জন্য শাস্তি স্বয়ং আল্লাহপাক সূরা নূর-এ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। নারী, যে কোন আর্থ-সামাজিক অবস্থায় হোকনা কেন, মুহূর্তের প্ররোচনায় বা প্রলোভনে ব্যভিচারের মতো হীন অপরাধে কখনও লিপ্ত হয় না। এ ধরনের অপরাধের পূর্বে একজন নারী এবং একই সাথে স্বামী ভিন্ন দ্বিতীয় একজন পুরুষ কিছু নিষিদ্ধ, অবৈধ, অসামাজিক এবং অশ্লীল কর্মে লিপ্ত থাকে বেশ দীর্ঘ একটি কাল। এই অশ্লীল-অসামাজিক কর্ম পরিণতিতে ক্রমান্বয়ে ব্যভিচারের প্ররোচনা দেয়। এ অশ্লীলতা সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন:

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ

'প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক, অশ্লীল আচরণের নিকটেও যাবেনা।' আল-আনআম:১৫১ (অংশ)

আল্লাহপাক অন্যত্র বলেন:

www.pathagar.com

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

'বল, আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ (হারাম) করেছেন, প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা।' আ'রাফ:৩৩ (অংশ)

আমরা বলেছিলাম আনুগত্যের সীমারেখা তথা আল্লাহ নির্ধারিত সীমারেখার নিকটবর্তী হওয়াও নিষিদ্ধ। কুরআন এবং হাদীস ব্যভিচারের মতো হীনতম অপরাধের শাস্তি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। কিন্তু অশ্লীলতা তথা যে কর্মটি ব্যক্তিকে ব্যভিচারের নিকটবর্তী করে তোলে, আল্লাহপাক তার থেকেও দূরে থাকতে বলছেন এবং এ কর্মটিকেও হারাম বলে জানাচ্ছেন। কিন্তু অশ্লীলতা নামক এ হারাম কর্মটির জন্য কোন শাস্তি মহান আল্লাহ নির্দিষ্ট করে দেন নি। কারণটাও খুবই স্পষ্ট- ব্যভিচারের অপরাধীকে, বিশেষতঃ নারী অপরাধীকে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু অশ্লীলতার মতো হারাম কর্ম সম্পাদনকারীকে চিহ্নিত করার কোন উপায় থাকে না। অশ্লীল আচরণ করার পর, কেউ যদি তা করেনি বলে দাবি করে, তাহলে তা প্রমাণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। কারণ এ কর্মটি সম্পাদনের পর কোথাও কোন আলামত বর্তমান থাকে না। পুরো কর্মটিই একটি আচরণগত ব্যাপার, অথচ তা একটি হীনতম অপরাধের দিকে ব্যক্তিকে ঠেলে নিয়ে যায়। প্রায়শঃই যার অনিবার্য পরিণতি হয়ে থাকে সামাজিক এবং পারিবারিক বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি। অতএব সংগত কারণেই অশ্লীল আচরণের কোন শাস্তি নির্দিষ্ট করা হয়নি। তবে এ আচরণের আশংকা দেখা দিলে আশংকা দূরীকরণের ব্যবস্থা নিশ্চয় গ্রহণ করা যেতে পারে। বিশেষতঃ যদি এমন কোন আশংকা দেখা দেয় যা ক্রমান্বয়ে ব্যক্তিকে ব্যভিচারের দিকে নিয়ে যেতে পারে, তাহলে আশংকা দূরীকরণের বিশেষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ অবশ্যই করা যেতে পারে। কিন্তু কখনই শাস্তির কোন নির্দেশ দেয়া যেতে পারে না। কারণ আশংকাতো আশংকাই - তা সত্য যেমন হতে পারে, তেমনি অমূলকও হতে পারে।

আল্লাহর হিফাজতের অধীনে অদৃশ্যের হিফাজত করাকে নারীর আল্লাহনুগত্যের পরিচায়ক তথা সীমা নির্ধারক বলে মহান আল্লাহ জানিয়েছেন। আন-নিসার বর্তমান আলোচ্য অংশে, (আন-নিসা ৩৪ আয়াতের শেষাংশ, 'স্ত্রীদের মধ্যে যাদের 'নুশূজ' এর আশংকা কর....) আল্লাহতা'য়ালা 'নুশূজ' এর আশংকার কথা বলেছেন। একই আয়াতের এক অংশে আল্লাহানুগত্যের সীমা চিহ্নিত করে দিয়ে, পরবর্তী অংশে স্বামীর প্রতি সাধারণ আনুগত্যহীনতার আশংকায় মহান

www.pathagar.com

আল্লাহ নারীকে শাস্তি প্রদানের কথা বলবেন, এটা অসম্ভব। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে 'নুশূজ' শব্দের অর্থ কখনো সীমা-সংজ্ঞাহীন সাধারণ আনুগত্যহীনতা বা অবাধ্যতা হতে পারে না। বরং 'নুশূজ'এর অর্থ সুস্পষ্টভাবে অদৃশ্যের হিফাজত না করার আশংকা দেখা দেয়া বা আল্লাহনুগত্যের নির্দিষ্ট সীমা লংঘিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়া। অর্থাৎ 'নুশূজ' শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য হচ্ছে স্বামী ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের ঔরসের সন্তান স্ত্রীর গর্ভে ধারণ এবং/অথবা বিবাহবহির্ভূত কোন সম্পর্কে জড়িত হওয়ার আশংকা সৃষ্টি হওয়া।

আমাদের এ ব্যাখ্যারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় সূরা আন-নিসার ১৯ আয়াতে। আল্লাহ বলছেন:

> *'হে ঈমানদারগণ! নারীদের জবরদস্তি তোমাদের উত্তরাধিকার গণ্য করা বৈধ (হালাল) নয়; তোমরা তাদের যা দিয়েছ, তা থেকে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদের উৎপীড়ন করো না। যদি না তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়, তাদের সাথে সৎভাবে জীবনযাপন কর।'* আন-নিসা: ১৯(অংশ)

বিবাহিতা স্ত্রী স্বামীর হাতের পুতুল বা দাসীতে পরিণত হয়ে যায় না যে তাকে নিয়ে পুরুষ যেমন খুশি তেমন করবে। বস্তুত নারীরও একটি মানবিক সত্তা রয়েছে, যা সার্বিকভাবে পুরুষের সত্তার সমান। নারীর প্রতি কোন জুলুম-নির্যাতন-উৎপীড়নের অধিকার পুরুষের নেই। নারীর সাথে পুরুষ সৎভাবে, মারূফ আচরণের সাথে জীবনযাপন করবে, এটাই আল্লাহর নির্দেশ।

উপরোক্ত আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারি, নারী প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়েছে বলে প্রমাণিত হলেই কেবল মারূফ আচরণের ব্যতিক্রম করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে নারীর অশ্লীল আচরণের আশংকা দেখা দিলে, কোন শাস্তি নয়, মারূফ আচরণের বিপরীতও নয়, শুধু আল্লাহ নির্দেশিত পন্থায় সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। সূরা আন-নিসার আলোচ্য আয়াতাংশের পূর্বাপর বিশ্লেষণ এবং একই সূরার ১৯ আয়াতও সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণ করে যে 'নুশূজ' শব্দের অর্থ তথাকথিত আনুগত্যহীনতা বা অবাধ্যতা নয়, বরং 'নুশূজ' এর প্রকৃত অর্থ অদৃশ্যের হিফাজত না করার পরিস্থিতি দেখা দেয়া বা সুস্পষ্ট অশ্লীলতা।

www.pathagar.com

৪.৩.৪. 'নুশূজ'এর আশংকা দূরীকরণে নির্দেশিত ব্যবস্থা.

পৃথিবীর অনেক দেশে, বিশেষতঃ তথাকথিত সভ্য পাশ্চাত্যে, বিবাহ-বহির্ভূত যৌনাচার এখন প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। কিন্তু প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের কোন দেশের কোন স্বামী নিশ্চয় কখনও চাইবে না, তার স্ত্রী অন্য কোন পুরুষের ঔরসের সন্তান গর্ভে ধারণ করুক; অতঃপর পিতৃত্বের মিথ্যা পরিচয়ে এবং অভিভাবকত্বে সন্তানটি বড় হয়ে উঠুক। অনুরূপভাবে কোন স্ত্রীও চাইবে না তার স্বামী অন্য কোন নারীর সাথে বিবাহ-বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক স্থাপন করুক। বিবাহ-বহির্ভূত এবং নীতিবিবর্জিত কর্মকাণ্ডের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন প্রেসিডেন্ট কর্তৃক তার দেশবাসী, স্ত্রী এবং কন্যার কাছে ক্ষমা প্রার্থনার কাহিনী বিশ্ববাসী দীর্ঘদিন মনে রাখবে। ঘটনাটি প্রমাণ করে, বিবাহ-বহির্ভূত অশ্লীলতা-ব্যভিচার, প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের কোন সমাজব্যবস্থাতেই কাম্য নয়।

চুরি, হত্যা বা অন্য যে কোন অপরাধের আশংকার ভিত্তিতে কাউকে অপরাধী সাব্যস্ত করা বা কাউকে শাস্তি দেয়ার কোন বিধান ইসলামে নেই। অপরাধ সংঘটিত হলে এবং অপরাধীকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা গেলে শাস্তি প্রয়োগের কথা আসে। তাও অপরাধ প্রমাণ, অপরাধীকে শনাক্তকরণ, অপরাধের গুরুত্ব এবং শাস্তির মাত্রা নির্ধারণ, ইত্যাদি কার্য একজন বিশেষজ্ঞ বিচারক বা কাজী দ্বারাই কেবল সম্পন্ন হতে পারে। ইচ্ছা করলেই যে কেউ বিচারক হয়ে যেতে পারে না বা আইন নিজের হাতে তুলে নিতে পারে না।

কিন্তু স্বামীর মনে যদি এমন আশংকা দেখা দেয় যে তার স্ত্রী 'নুশূজ' আচরণ করছে, তখন করণীয় কী হবে? স্ত্রী বিবাহবহির্ভূত কোন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছে এমন আশংকা যদি দেখা দেয়, তখনই বা কী করা যেতে পারে? স্বামী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির সন্তান নারী তার গর্ভে ধারণ করতে পারে, যদি এমন আশংকা দেয়, তখন? যদি আশংকা দেখা দেয়, আল্লাহর হিফাজতের অধীনে অদৃশ্যের হিফাজতের জন্য দায়িত্বশীল নারী তার দায়িত্বটি যথাযথভাবে পালন করছে না, তখন? তখনও কি সুনির্দিষ্ট অপরাধ সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য সহকারে পর্যবেক্ষণ করতে হবে? পরস্পরের মধ্যে সুগভীর ভালবাসা এবং আস্থা বিরাজমান এমন দম্পতির স্বামীও কিন্তু এধরনের পরিস্থিতিতে আশংকার যথার্থতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ধৈর্য ধরে বসে থাকবে না। কিংবা আশংকা দূরীকরণের জন্য, কোন বিচারক বা অভিভাবকের দ্বারস্থ হবে না। পক্ষান্তরে স্ত্রীর প্রতি সবচাইতে অবিশ্বস্ত স্বামীও এহেন পরিস্থিতিতে ভাববে না যে, 'পর

www.pathagar.com

স্ত্রীর সাথে আমি যা করি, আমার স্ত্রীও নাহয় অন্য পুরুষের সাথে তেমন একটা কিছু করলো।' বরং স্বামী-স্ত্রীর গৃহ, চার দেয়ালের, বাইরে কোন কিছু প্রকাশ হওয়ার আগেই যাতে আশংকা নির্মূল করা যায়, তার জন্য করণীয় সবকিছু করতে দ্বিধান্বিত হবে না।

নির্দিষ্ট অপরাধটি অর্থাৎ 'নুশূজ' যদি সংঘটিত হয়েই যায় অর্থাৎ নারী যদি স্বামী ভিন্ন অন্য কারো সন্তান গর্ভে ধারণ করেই ফেলে, তাহলে সে যিনার অপরাধে অপরাধী হয়ে গেলো এবং সে রযমের শাস্তির উপযুক্ত হয়ে গেলো। বিষয়টি তখন স্বামী-স্ত্রী দু'জন নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করার পর্যায়ে থাকবে না। ব্যক্তি পর্যায় ছাড়িয়ে গিয়ে এটি তখন সামাজিক বা রাষ্ট্রিক পর্যায়ের অপরাধে পরিগণিত হবে। অর্থাৎ আল্লাহ আনুগত্যের নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করলে সেটি তখন আর 'নুশূজ'এর অপরাধ থাকবে না। বরং সেটি হবে যিনা-ব্যভিচারের অপরাধ। পরিবারের প্রধান দু'জন সদস্যের একজন, এক্ষেত্রে নারী, ব্যভিচারের মতো অপরাধ করবে এমন আশংকা দেখা দিলে, নিশ্চিত হওয়ার জন্য অপরজন কখনোই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে থাকবে না। 'নুশূজ' আচরণটি এমনই, এটি ব্যক্তিকে (এক্ষেত্রে নারী) ক্রমান্বয়ে অশ্লীলতা ও ব্যভিচারের দিকে নিয়ে যায়। পক্ষান্তরে অপরজন অর্থাৎ পুরুষটির মনে যদি স্ত্রীর 'নুশূজ'এর আশংকা একবার দানা বাঁধতে শুরু করে, তাহলে সে আত্মসম্মান, পরিবারের সম্মান, বংশের সম্মান, সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যৎ, ইত্যাদির কথা ভেবে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যাচ্ছেতাই কাণ্ড বাধিয়ে বসতে পারে। যে কোন ধর্ম বা সমাজের যে কোন পুরুষই এমনটি করতে পারে এবং এটিই মানবীয় আবেগ-উত্তেজনার স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ।

একজন বিবাহিতা নারী যখন ব্যভিচারের অপরাধ করে, তখন ব্যাপারটি কেবল অপরাধের বিচার-শাস্তির প্রক্রিয়ার মধ্যেই শেষ হয়ে যায় না। নারীকে এ অপরাধের দায়ভার দীর্ঘকাল ধরে বয়ে বেড়াতে হয়। কখনো তা বংশ পরম্পরায় একটি পরিবারের উপর কলঙ্কের কালিমা লেপন করতে থাকে। কোন স্বামী চায় না তার স্ত্রী ব্যভিচারের অপবাদের বোঝা বয়ে বেড়াক। ব্যভিচারিণী মায়ের সন্তান - পরিচয়ের এমন গ্লানি বহন করতে চাইবে না কোন সন্তান। এমন কি কোন নারীও চাইবে না তার উপর এহেন অপবাদের বোঝা নেমে আসুক। সুতরাং ব্যভিচারের মতো হীনতম অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে এর আশংকা নির্মূল করার যথাযথ ব্যবস্থা থাকা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু 'নুশূজ'এর আশংকা দেখা দিলেই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে অপরিণামদর্শিতার

www.pathagar.com

পরিচয় দেয়ার কোন সুযোগও আল্লাহতা'য়ালা রাখেননি। এ ধরনের সমস্যা সংকুল জটিল অবস্থাতেও মহান আল্লাহতা'য়ালা পরম ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মুকাবিলার জন্য পর্যায়ক্রমিক পন্থা নির্দেশ করেছেন কুরআন মজীদে।

ধারাক্রমিকভাবে আল্লাহতা'য়ালা তিনটি নির্দেশ দিয়েছেন,*"স্ত্রীদের মধ্যে যাদের 'নুশূজ'এর আশংকা কর, তাদের সদুপদেশ দাও (নসিহত কর, বোঝাও, পরামর্শ দাও); তারপর তাদের শয্যা বর্জন কর এবং অতঃপর তাদের প্রহার (দারাবা) কর।"* প্রথম নির্দেশে আল্লাহাতা'য়ালা 'নুশূজ' এর আশংকায় সদুপদেশ দানের কথা বলেছেন। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, সূরা আন-নিসার ৯৪ আয়াত ও আল-হুযুরাত-এর ৬ ও ১২ আয়াতের আলোকে কোন মুসলমান, কোন বিষয়ে পূর্ণ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত, কল্পনা-অনুমান বা সন্দেহ-আশংকার ভিত্তিতে কখনো কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যদি কখনও এমন কোন আশংকা দেখা দেয়, যার সাথে দু'টি মানুষের তথা একটি পরিবারের বংশ পরম্পরার মান-সম্মান সম্পৃক্ত, সেক্ষেত্রে আশংকা দূরীভূত করার সহজতম উপায় কি হতে পারে? যে কোন বিবেচনায়, আশংকাটি সত্য কিনা তা প্রমাণে সচেষ্ট হওয়াই হবে সহজতম উপায়।

এখানে দুটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। প্রথমতঃ যে কোন আশংকা নিতান্তই আশংকা কেবল। তা সমূলক হতে পারে আবার অমূলকও হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ আশংকা যখন দেখা দেয়, তার সমূলক বা অমূলক একটা ভিত্তি থাকে। স্ত্রীর 'নুশূজ'এর আশংকা যখন দেখা দেয়, তখন তা দূরীভূত করার প্রথম উপায় হচ্ছে স্ত্রীর সাথে আলাপ-আলোচনা করা, শলা-পরামর্শ করা, স্ত্রীকে সদুপদেশ দেয়া এবং যথাযথ নসিহত করা। আয়াতে 'নুশূজ'এর আশংকা দূরীভূত করার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে ঠিক এ পথটিই বাৎলে দেয়া হয়েছে। মূল আরবীতে বলা হয়েছে, 'ফাইযূহুন্না'। অর্থাৎ 'তাদের প্রতি ওয়াজ-নসিহত করো।' বস্তুতঃ আশংকা দূরীভূত করা তথা আশংকার সত্যতা নিরূপণের এটিই যথার্থ উপায়।

ধরা যাক, স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই ন্যূনতম তাকওয়াসম্পন্ন মুমিন এবং মুমিনা। এদের মধ্যে যথেষ্ট আল্লাহ-ভীতি আছে এবং এরা দু'জন বোধসম্পন্ন মানুষ। তাহলে এটি প্রায় নিশ্চিত যে, 'নুশূজ'এর আশংকার সত্যতা অনুসন্ধানের প্রাথমিক পর্যায়ে ওয়াজ-নসিহত, সদুপদেশ বা পারস্পরিক শলা-পরামর্শের মাধ্যমেই ভিত্তিহীন আশংকাটি সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়ে যাবে। 'নুশূজ'এর আশংকা যে অমূলক তা উভয়ের কাছে প্রমাণিত হয়ে যাবে এবং আশংকাকারীর অন্তর

www.pathagar.com

থেকে একটি বোঝাও সহজে লাঘব হয়ে যাবে। 'নুশূজ'এর আশংকা দূরীভূত করার জন্য এটি আল্লাহতা'য়ালা বর্ণিত প্রথম পদ্ধতি। এই প্রথম পদ্ধতিকে কখনো কোন বিবেচনায় শাস্তি বলা যাবে না। বরং আশংকা দূরীকরণ ও দাম্পত্য সমঝোতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এটিকে সর্বোৎকৃষ্ট প্রাথমিক পন্থা বলা যেতে পারে।

দ্বিতীয় নির্দেশঃ কিন্তু আশংকা যদি সমূলক হয়, তাহলে কি শুধু আলাপ-আলোচনা ও সদুপদেশের মাধ্যমে তা দূরীভূত করা সম্ভব হবে? হয়তো হবে, যদি 'নুশূজ' নামক বিষবৃক্ষের শিকড় বিপদজ্জনক গভীরে না পৌঁছে থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো শুধু আলাপ-আলোচনা এবং পারস্পরিক শলা-পরামর্শের মাধ্যমেই বিষবৃক্ষের শিকড় উপড়ে ফেলা যাবে। 'নুশূজ'কারীকে হয়তো তার কর্মের অনিবার্য পরিণতির কথা বুঝিয়ে দিয়ে, তার অনুসৃত পন্থার কদর্যতা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানদান করে হয়তো তাকে সৎপথে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে।

তবে এ সম্ভাবনাও সমান বিদ্যমান যে সাধারণ আলাপ-আলোচনা, উপদেশ-নসিহত ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রেই বিফলে যাবে। এটি এমন এক নেশা, যা ব্যক্তিকে হিতাহিত জ্ঞানরহিত মাতালে পরিণত করে। এ ক্ষেত্রে করণীয় কি? এখনতো আশংকাটি গভীরতর। যদিও সুদৃঢ় প্রমাণ প্রতিষ্ঠা এমন অবস্থায়ও কখনো সম্ভব নয়, তবুও এ পর্যায়ে আশংকাকে শুধু অমূলক আশংকা ভেবে অবহেলা করা যায় না। বলা যায় বিষবৃক্ষের শিকড় এতখানি গভীরে পৌঁছে গেছে যে মুখের মিষ্টি কথায় বা কিছু উপদেশ বাণী দিয়ে তাকে উপড়ানো সম্ভব নয়। এ পর্যায়েও মহান আল্লাহতা'য়ালা ধৈর্যহারা না হয়ে বুদ্ধিমত্তার সাথে পরিস্থিতি মুকাবিলার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ এ ক্ষেত্রেও আশংকাটি অমূলক হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা বিদ্যমান। সম্পূর্ণ ব্যাপারটি দাম্পত্য মান-অভিমান থেকে সৃষ্ট একটি জটিলতাও হতে পারে। অথবা হতে পারে স্বামীর অকারণ আশংকা হেতু ব্যক্তিত্বের সংঘাত। সুতরাং দ্বিতীয় পর্যায়ে মহান আল্লাহ বিধান দিচ্ছেন, "তারপর স্ত্রীর শয্যা বর্জন কর।"

স্ত্রীর সম্ভাব্য বিপথগামিতার আশংকা দূরীকরণে প্রথম ব্যবস্থা কার্যকর হয়ে গেলেতো ভালই, তাহলে দ্বিতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কোন আবশ্যকতা থাকে না। কিন্তু প্রথম ব্যবস্থা ব্যর্থ হলেই চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত বা ব্যবস্থা এখনো গ্রহণ করা যাবে না। বরং দ্বিতীয় ব্যবস্থা হিসেবে ধৈর্যশীলতার সাথে স্ত্রীশয্যা বর্জন করতে হবে। একটি ব্যাপারে সকল পণ্ডিতগণ একমত পোষণ করেন যে, পৃথককৃত

www.pathagar.com

শয্যাটি একই কক্ষের মধ্যে হতে হবে। উদ্দেশ্য একটাই: নারীকে তার আত্ম-সম্মানবোধে আঘাত করা, তাকে তীক্ষ্ম অপমানবোধে বিদ্ধ করা এবং তার সম্ভাব্য অনুসৃত পন্থার কদর্যতা সম্পর্কে সজাগ করে তোলা।

তৃতীয় নির্দেশ: অনেক নারীর ক্ষেত্রে 'নুশূজ'এর আশংকায় গৃহীত এই দ্বিতীয় ব্যবস্থা প্রয়োগের পরই আশংকা বিদূরিত হবে। আবার কিছু নারীর ক্ষেত্রে তাতেও হয়তো কোন সুফল লাভ হবেনা। অর্থাৎ আশংকার শিকড়টি এত বেশি গভীরে প্রবশ করে গেছে যে এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পদ্ধতিটিও ব্যর্থ। 'নুশূজ'এর আশংকা দূরীকরণের এই দ্বিতীয় পদ্ধতি, একই কক্ষে স্ত্রীর শয্যা পৃথক করে দেয়া, এটিকে কি কোন বিশেষ অপরাধের শাস্তি বলা যাবে? না - তা বলা যাবে না। বড়জোর বলা যায়, একটি পীড়াদায়ক আশংকা দূরীকরণের লক্ষ্যে স্ত্রীর সাথে আপোষ-মীমাংসার উৎকৃষ্ট পন্থা মাত্র। অথবা যদি আশংকাটি প্রায় নিশ্চিত বলে সন্দেহ হয়, তাহলে স্ত্রীকে কুপথ থেকে সুপথে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে এ ব্যবস্থাকে সংশোধনমূলক, দৃষ্টান্তমূলক বা শিক্ষাদানকারী প্রয়াস বলা যেতে পারে। এটিকে কোনভাবেই শাস্তি বলে অভিহিত করা যায় না।

'নুশূজ' তথা স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হবার আশংকাটি যদি এতই গভীর হয় যে, স্ত্রীর শয্যা পৃথক করে দেয়ার পরও আশংকা দূরীভূত না হওয়ার স্পষ্ট আলামত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তাহলে করণীয় কি হবে? মহান আল্লাহ এমন জটিল পরিস্থিতিতেও চান না যে স্বামী-স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক, একটি সংসার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাক, বা স্বামী-স্ত্রী-সন্তানাদির কতকগুলো জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ুক। এমন পরিস্থিতিতেও মহান আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা চান 'নুশূজ'এর সত্য বা মিথ্যা সকল আশংকা দূরীভূত হোক। পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটিতে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজ করুক। মানুষকে সংশোধিত হয়ে আল্লাহর পথে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ আল্লাহ রাহমানুর রাহীম সর্বদাই বর্তমান রেখেছেন। আর তাই শয্যা বর্জনের পরও স্ত্রীর 'নুশূজ'এর আশংকা দূরীভূত না হলে, আল্লাহনুগত্য এবং অদৃশ্যের হিফাজতের ব্যাপারে সন্দেহ বর্তমান থাকলে, আল্লাহপাক নির্দেশ দিচ্ছেন, "তাদের প্রহার কর।"

স্ত্রীকে প্রহার করার জন্য মূল আরবীতে ব্যবহৃত 'দারবুন' শব্দটির একটু বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। 'দারবুন' শব্দটি আরবী ভাষায় ব্যাপক অর্থবোধক এবং বহুল ব্যবহৃত শব্দ। অভিধানে এর অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে, "অনুরূপ, তুল্য, চালাক, চতুর, প্রহার করা, দংশন করা, নাড়াচাড়া করা, উপমা বর্ণনা করা, উপকথা বর্ণনা করা, সফর করা, আঘাত করা, টোকা দিয়ে বাদ্যযন্ত্র বাজানো, লক্ষ্যভেদ

www.pathagar.com

করা, বুক ধুক ধুক করা, প্রার্থনা করা, সাঁতার কাটা, বাঁশী বাজানো, ইত্যাদি।" পবিত্র কুরআন মজীদে প্রধানতঃ তিনটি অর্থে শব্দটি বারে বারে ব্যবহৃত হয়েছেঃ (১) 'দারাবাল্লাহু মাসালান' অর্থাৎ আল্লাহ উপমা পেশ করছেন, এ বাক্যাংশটি কুরআন পাকে বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। (২) আঘাত করা অর্থেঃ- মুসা (আঃ) এর প্রতি লাঠি দ্বারা মাটিতে আঘাত করার নির্দেশ, আল-বাকারাঃ ৬০, মৃতদেহকে জীবন্ত করার লক্ষ্যে আঘাত করা, আল-বাকারাঃ ৭৩। (৩) সফর করা অর্থেঃ- আন-নিসাঃ ১০১ ইত্যাদি। কেবল একটি আয়াতে যুদ্ধেক্ষেত্রে শত্রুর উপর আঘার হানার উদ্দেশ্যে (মুহাম্মাদঃ৪) এবং অপর কয়েকটি স্থানে মৃত্যুশয্যায় ফেরেশতা কর্তৃক কাফিরের রূহ বের করে নেয়ার সময় তার মুখে ও পিঠে আঘাত করার অর্থে 'দারাবা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তবে শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে আঘাত করা বা প্রহার করা অর্থে 'দারাবা' শব্দটি সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না। শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে যে নির্দিষ্ট প্রহার বা আঘাত, তার জন্য সচরাচর 'জিলদুন' শব্দটিই ব্যবহৃত হয়ে থাকে (আন-নুরঃ ১)। এছাড়াও 'আযাব' শব্দটি অনির্দিষ্ট শাস্তি হিসাবে কুরআন মজীদের সর্বত্র ব্যবহৃত হয়েছে।

'দারাবা' শব্দটি দ্বারা সাধারণতঃ মৃদু আঘাত বা মৃদু প্রহার, মাটিতে লাঠি দ্বারা টোকা দেয়া, বাদ্য যন্ত্রে মৃদু টোকা, বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ডের ধুক-ধুক আঘাত, ইত্যাদি বোঝানো হয়ে থাকে। প্রচণ্ড বা কঠিন আঘাত বোঝানোর জন্য শব্দটি ব্যবহৃত হয় না। আলোচ্য আয়াতেও 'দারাবা' শব্দটি শাস্তিমূলক আঘাত বা প্রহার বোঝাবার জন্য ববহৃত হয়নি। বরং মৃদু আঘাতের নির্দেশ দিয়ে এক্ষেত্রে নারীর আত্মসম্মানবোধে ঘা দিতে বলা হয়েছে। এটিকে নিঃসন্দেহে একটি শিক্ষামূলক বা সংশোধনমূলক পদ্ধতি বলা যেতে পারে। উল্লিখিত প্রহার যদি শাস্তিমূলক হতো, তাহলে এর সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতো একটি প্রমাণিত অপরাধ এবং অপরাধের গুরুত্বের সাথে শাস্তির মাত্রাও অবশ্যই উল্লেখ করা হতো। পরিবারের কোন সদস্য কোন শাস্তিযোগ্য অপরাধ করলে, স্বামী বা পরিবারের অপর কোন ক্ষমতাশালী সদস্য ইচ্ছা করলেই তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করতে পারে না। অপরাধ নিশ্চিতকরণ, অপরাধের বিচার এবং শাস্তি প্রয়োগ কেবল উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ বিচারক বা কাজী কর্তৃকই সম্পন্ন হতে পারে। বর্তমান ক্ষেত্রে অপরাধ-বিচার-শাস্তির সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটাই অনুপস্থিত। কারণ, এক্ষেত্রে সমস্যাটি অপরাধ নয়, 'নুশূজ'এর আশংকা। এ আশংকা দূরীকরণের জন্য বিচার-শাস্তির আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। এটি একটি দম্পতির অত্যন্ত গোপনীয় বিষয়। দম্পতির কক্ষের চার দেয়ালের

www.pathagar.com

বাইরে পরিবারের তৃতীয় কোন ব্যক্তিও এতে জড়িত হওয়া বা এর সাথে নিজেকে জড়ানো বাঞ্ছনীয় নয়। এমনকি এ আশংকার পূর্বাপর তথ্য কিংবা আশংকা দূরীকরণের পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা সম্পর্কে পরিবারের বাইরের কারো জড়িত হওয়ারও কোন সুযোগ নেই।

আল্লাহতা'য়ালা স্ত্রীর 'নুশূজ'এর আশংকায় তার মনের গতি পরিবর্তন এবং আল্লাহনুগত্য ও অদৃশ্যের হিফাজাত নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সর্বশেষ পন্থা হিসেবে 'দারাবা' শব্দ ব্যবহার করে, স্ত্রীকে মৃদু আঘাত (প্রহার নয়) করতে বলেছেন। আবার এ পন্থাটি তখনই কেবল অনুমোদনযোগ্য, যখন সংশোধনের প্রথম দুটি পন্থা ব্যর্থ হবে। তাছাড়া আঘাতের এ নির্দেশ যতটা না শারীরিক তার চাইতে বেশি মানসিক। 'দারাবা' শব্দটিই এ তথ্যের দিকে নির্দেশ করে। ইবনে জুরাইয আতা থেকে আবু বকর আল জাসসাস (রঃ) উদ্ধৃতি দিয়েছেন, "প্রহার বা আঘাতের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত দণ্ডটি মিসওয়াক দণ্ডের চাইতে বড় হতে পারবে না।" হাদীস থেকেও আমরা জানতে পাই যে স্ত্রীকে যদি কখনো সর্বশেষ পর্যায়ের সংশোধন পন্থা প্রয়োগ করতে গিয়ে মৃদু আঘাত করতে হয়, তবে তা এমনভাবে হবে যেন স্ত্রীর গায়ে আঘাতের কোন দাগ না থাকে। মিসওয়াক দণ্ড দিয়ে আঘাত বা দাগ না লাগে মত প্রহার প্রকৃতপক্ষে কোন অপরাধের শাস্তি হতে পারে না। বরং এ প্রহারের উদ্দেশ্য, স্ত্রীর আত্মসম্মানবোধে আঘাত করে 'নুশূজ'এর আশংকা দূরীভূত করা।

অতএব আমরা দেখলাম 'নুশূজ' তথা বিবাহবহির্ভূত কোন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার আশংকা দেখা দিলে প্রথমতঃ আলাপ-আলোচনা, উপদেশ-নসিহতের মাধ্যমে আশংকা দূরীভূত করার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু তাতে আশংকা দূরীভূত না হলে, বরং আশংকা প্রায় সত্যি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে, পরবর্তীতে স্ত্রীর শয্যা পৃথক করে দিতে হবে। তাতেও আশংকা দূরীভূত না হলে স্ত্রীকে মৃদু প্রহার করে আত্মসম্মানবোধে ঘা দিয়ে সংশোধনের চেষ্টা করার পন্থা মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন।

কুরআনের আলোকে আমরা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছি যে, আলোচ্য ক্ষেত্রে 'নুশূজ' শব্দের অর্থ স্বামীর প্রতি স্ত্রীর সীমা-সংজ্ঞাহীন আনুগত্যহীনতা বা অবাধ্যতা নয়। বরং এর অর্থ অদৃশ্যের হিফাজতের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হওয়া; বিবাহবহির্ভূত কোন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া; যা সুস্পষ্ট অশ্লীলতা ছাড়া আর কিছু নয়। 'নুশূজ'এর আশংকাটি এমন যে, এটি একবার মনের কোণে উঁকি দিলে একজন মানুষ সম্পূর্ণ দিশেহারা পাগলপ্রায় হয়ে উঠে। এধরনের পরিস্থিতিতে

www.pathagar.com

মানুষ শরবিদ্ধ বাঘের মতো যে কোন আচরণ করে ফেলতে পারে। এমন কঠিন পরিস্থিতিতেও আল্লাহতা'য়ালা মানুষকে ধৈর্যহারা অস্থির হতে নিষেধ করেছেন। বরং বিচক্ষণতার সাথে পরম ধৈর্যসহকারে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বনের মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

এ পর্যায়ে অতি সংগত প্রশ্ন উঠতে পারে, অশ্লীলতা তথা বিবাহবহির্ভূত কোন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া ছাড়া স্ত্রীর অন্য কোন কর্ম বা আচরণ স্বামীর নিকট কখনো কি অবাধ্যতা তথা প্রহারযোগ্য বা সংশোধনযোগ্য অপরাধ বলে মনে হতে পারে না? অবাধ্যতা নিশ্চয় হতে পারে, তবে তা কোনভাবেই প্রহারযোগ্য হতে পারে না এবং সেক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগের কোন অবকাশই নেই। কারণ, আল্লাহ পাক সূরা আন-নিসার ১৯ আয়াতে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন, *"যদি না তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়, তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন কর। তোমরা যদি তাদের ঘৃণা কর, তবে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন, তোমরা তাকে ঘৃণা করছ।"*

এ ছাড়াও সূরা তাগাবূন-এর ১৪ আয়াতে আল্লাহ আরো বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾

'হে বিশ্বাসীগণ! তেমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু, অতএব তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্ক থেকো। তোমরা যদি তাদের মার্জনা করো, তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

এ আয়াতে কিছু কিছু স্ত্রী ও সন্তানের শত্রুতার আশংকার কথা বলা হয়নি, বরং নিশ্চিত শত্রু বলা হয়েছে। অথচ নিশ্চিত শত্রু চিহ্নিত হওয়ার পরও শত্রুকে শায়েস্তার বা শত্রুর প্রতি প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠার অনুপ্রেরণা মহান আল্লাহ দেন নি। স্ত্রী এবং সন্তানদের কাউকে আল্লাহর পথে চলতে গিয়ে নিশ্চিত শত্রু জানার পরও মহান আল্লাহ নিজ ক্ষমাশীলতার উদাহরণ দিয়ে মানুষকে স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি ক্ষমাশীল-স্নেহপ্রবণ হয়ে উঠার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। ক্ষমাশীলতা-দয়াশীলতা যেখানে আল্লাহর প্রধান গুণ, সেখানে আল্লাহ নিশ্চয় চাইবেন তাঁর অনুগত বান্দারা তাঁরই প্রধান এবং সুন্দরতম গুণে গুণান্বিত হয়ে উঠুক।

www.pathagar.com

স্ত্রী নিশ্চিতভাবে শত্রু, এটি জানার পরও আল্লাহতা'য়ালা তাকে শাস্তির নির্দেশ না দিয়ে যথার্থই ক্ষমার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং ক্ষমাপরায়ণ-দয়াময় আল্লাহতা'য়ালার পক্ষে এটা কখনই সম্ভব নয় যে, তিনি সীমা-সংজ্ঞাহীন আনুগত্যহীনতা বা অবাধ্যতার আশংকা দূরীকরণের জন্য স্ত্রীকে প্রহারের নির্দেশ দেবেন। আল্লাহর কিতাব পবিত্র কুরআন নিশ্চয় এ ধরণের বৈপরীত্য থেকে মুক্ত। অতঃপর এটা সহজেই বোধগম্য যে, 'নুশূজ'এর আশংকা দূরীকরণে যে বিধান মহান আল্লাহ দিয়েছেন, তা কখনই শাস্তির বিধান নয়, বরং তা সুখী দাম্পত্য জীবন নির্মাণের লক্ষ্যে আপোষ-মীমাংসার বিধান, সংশোধনমূলক এবং শিক্ষামূলক বিধান।

দাম্পত্য জীবন তথা পুরুষ ও নারীর যৌথজীবনের স্বরূপ বিশ্লেষণ, 'নুশূজ' শব্দটির স্বরূপ অনুসন্ধান, অপরাধের বিচার ও শাস্তি সংক্রান্ত পর্যালোচনা শেষে আমরা যদি সূরা আন-নিসার ৩৪ আয়াতের আলোচ্য তৃতীয়াংশের প্রতি আর একবার দৃষ্টিপাত করি, তাহলে আমরা দেখতে পাই, মহান আল্লাহ বলছেনঃ

স্ত্রীদের মধ্যে যাদের 'নুশূজ'-এর (এ শব্দটির এমন কোন প্রতিশব্দ নেই, যা একশব্দে প্রকাশযোগ্য। এর অর্থ অদৃশ্যের হিফাজতে ব্যর্থতা, আল্লাহর আনুগত্য না করা, আল্লাহর নির্দেশের বিরোধিতা করা বা বিবাহবহির্ভূত বা পরকীয়া কোন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া বা অন্য পুরুষের সন্তান গর্ভে ধারণ করা) আশংকা কর, তাদের সদুপদেশ দাও (কথা দ্বারা বুঝাও, ওয়ায নসিহত কর), (তাতে আশংকা দূরীভূত না হলে) অতঃপর তাদের শয্যা বর্জন কর এবং (তাতেও যদি আশংকা দূরীভূত না হয়) তাদের (দৃষ্টান্তমূলকভাবে, সংশোধনমূলকভাবে এবং আত্মসম্মানবোধে আঘাত করার মতো করে) মৃদু আঘাত কর। এতে যদি তারা (আল্লাহর নির্দেশের ব্যাপারে) তোমাদের অনুসারী হয়ে যায়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অন্বেষণ করোনা, আল্লাহ মহান, শ্রেষ্ঠ।

www.pathagar.com

৫

কুরআন এবং নবী (সাঃ)র পারিবারিক জীবন

..... সা'দ ইবনে হিশাম ইবনে আমীর (রহঃ) উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে উম্মুল মুমিনীন! দয়া করে আমাকে রাসূলুল্লাহ(সাঃ)র আখলাক (চরিত্র) সম্পর্কে অবহিত করুন।' জবাবে আয়েশা (রাঃ) বললেন, 'বাছা! আপনি কী কুরআন অধ্যয়ন করেন না?' জবাবে সা'দ জানালেন যে, তিনি কুরআন অধ্যয়ন করেন। তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র চরিত্র ছিল আল-কুরআন।' সা'দ বলেন, 'তখন আমার ইচ্ছে হল উঠে চলে যাই এবং মৃত্যু পর্যন্ত কখনো আর কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করবো না। পরে আমার মনে হলো আরো কিছু জিজ্ঞেস করি। তাই আমি বললাম, 'রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র রাতের ইবাদাত সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। ....' সহীহ মুসলিম[৩৬]

উল্লিখিত হাদীসটি থেকে আমরা জানতে পারছি, পবিত্র কুরআনে একজন মানুষকে যেভাবে জীবনযাপনের দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ওই সব দিক-নির্দেশনা নিখুঁতভাবে অনুসরণ করেছেন। কুরআনে বর্ণিত জীবন-যাপনের দিক-নির্দেশনাসমূহ যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারলে, যে কেউ সহজে বুঝতে পারবে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জীবনযাপন পদ্ধতি কেমন ছিল। আর তাই আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র জীবন-চরিত সম্পর্কে বিস্তারিত না বলে, এক কথাতেই জানিয়ে দিলেন যে, পবিত্র কুরআনে জীবন-যাপনের যে দিক-নির্দেশনা বিদ্যমান, নবীজী (সাঃ) ওগুলোই যথাযথ অনুসরণ করেছেন। মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি সদস্যের জন্য এটি অন্যতম শিক্ষণীয় যে, পবিত্র কুরআনের প্রতিটি আদেশ-নিষেধ অনুসরণ মানেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে অনুসরণ। বলা হয়ে থাকে, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) ছিলেন, নবীজী (সাঃ)র স্ত্রীদের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয়তমা। তিনি যখন রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে এমন সাক্ষ্য দেন, তখন আমরা স্বাভাবিকভাবেই আশা করতে পারি পবিত্র কুরআনে নবী (সাঃ)র জীবনের সুদিনের প্রতিফলন নয়,

www.pathagar.com

বরং দুর্দিনের, দুঃসময়ের, বিভিন্ন ক্রান্তিকালের প্রতিফলনও থাকবে। এমনকি তাঁর নিতান্ত ব্যক্তিগত দাম্পত্য-জীবনের চড়াই-উৎরাইয়ের চিত্রও তাতে প্রতিফলিত হবে। কুরআনের তিনটি সূরায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র দাম্পত্যজীবনের টানাপোড়েনের উপর সূক্ষ্ম এবং নৈর্ব্যক্তিকভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

৫.১. নবী (সাঃ) কর্তৃক নিজের জন্য মধু হারাম করে নেয়া সম্পর্কিত ঘটনা

সূরা আত-তাহরীমের প্রথম চারটি আয়াত দিয়েই এ প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করা যায়। আয়াতগুলোতে আল্লাহতা'য়ালা বলছেন:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۚ وَاللَّـهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١﴾ قَدْ فَرَضَ اللَّـهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللَّـهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّـهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ ۖ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَـٰذَا ۖ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٣﴾ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّـهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۖ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّـهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ ﴿٤﴾

হে নবী, আল্লাহ যে জিনিস হালাল করেছেন তা তুমি হারাম করছো কেন? (তা কি এজন্য যে,) তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাও? আল্লাহ ক্ষমাশীল এবং দয়ালু। আল্লাহ তোমাদের জন্য কসমের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হওয়ার পন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক এবং তিনি মহাজ্ঞানী ও মহাকৌশলী। (লক্ষণীয় যে,) নবী তাঁর এক স্ত্রীকে গোপনে একটি কথা বলেছিলেন। পরে সেই স্ত্রী যখন (অন্য কারো কাছে) সেই গোপনীয় বিষয়টি প্রকাশ করে দিলেন এবং আল্লাহ নবীকে এই (গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করার) ব্যাপারটি জানিয়ে দিলেন, তখন নবী (ঐ স্ত্রীকে) কিছুটা সাবধান করলেন এবং কিছুটা মাফ করে দিলেন। নবী যখন তাঁকে (গোপনীয়তা প্রকাশের) এই কথা জানালেন তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কে আপনাকে এ বিষয়ে অবহিত করেছে?' নবী বললেন:

www.pathagar.com

আমাকে তিনি অবহিত করেছেন যিনি সবকিছু জানেন এবং সর্বাধিক অবহিত। তোমরা দু'জন যদি আল্লাহর কাছে তাওবা করো (তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম), কেননা, তোমাদের মন সরল-সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছে। আর যদি তোমরা নবীর বিরুদ্ধে পরস্পর সংঘবদ্ধ হও তা হলে জেনে রাখো, আল্লাহ তার অভিভাবক, তাছাড়া জিবরাঈল, নেককার ঈমানদারগণ এবং সব ফেরেশতা তার সাথী ও সাহায্যকারী।
আত-তাহরীম: ১-৪

আমরা দেখতে পাচ্ছি, সূরা আত-তাহরীম শুরু হয়েছে আল্লাহর অসন্তোষের কথা ঘোষণার মধ্য দিয়ে। অসন্তোষের কারণ নবী (সাঃ) তাঁর নিজের জন্য একটি জিনিস হারাম ঘোষণা করেছেন, যে জিনিসটি আল্লাহ সার্বিকভাবে সকলের জন্য হালাল করে দিয়েছেন। কুরআন জানাচ্ছে, নবী (সাঃ) উম্মুল মুমিনীনদের একটি দলকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করতে গিয়ে এমনটি করেছিলেন। এটিই আল্লাহর অসন্তোষের কারণ। আমরা এখানে আরো একটি বিষয় অবগত হচ্ছি। তা হলো, আল্লাহ যে জিনিসটি সার্বিকভাবে হালাল করে দিয়েছেন, তা হারাম ঘোষণা করার অধিকার কোন মানুষ কিংবা নবী কারোই নেই। অর্থাৎ আইন হিসাবে, বিধান হিসাবে আল্লাহ প্রদত্ত আইন-বিধান চূড়ান্ত। এ ঘটনার সাথে সম্পর্কিত দুটি হাদীসের উদ্ধৃতি লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে একটি কার্যত হাদীসের কোন সহীহ গ্রন্থে নথিভুক্ত হয় নি। অপরটি প্রায় সকল সহীহ গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। আমরা এখানে দ্বিতীয় হাদীসটি উল্লেখ করছি।

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যয়নব বিনতে জাহশ (রাঃ)এর গৃহে অবস্থান করে মধুপান করছিলেন। আমি এবং হাফসা (রাঃ) পরামর্শ করলাম, আমাদের উভয়ের মধ্যে যার গৃহে নবী (সাঃ) আসবেন, সে যেন তাঁকে বলে, 'আমি আপনার মুখ থেকে মাগাফিরের গন্ধ পাচ্ছি। (মাগাফির একটি ফুলের নাম। অনেকে বাবলা ফুলকেও মাগাফির বলে। এ ফুল এবং ফুলের মধুতে একটা বাসী গন্ধ পাওয়া যায়।) আপনি কি মাগাফির খেয়েছেন?' যার গৃহেই তিনি গেলেন, তিনি তাঁকে সিদ্ধান্ত মোতাবেক ঐ কথা বললেন। উত্তরে তিনি বললেন, 'না। বরং আমি যয়নব বিনতে জাহশের ঘরে মধুপান করেছি। ওঁর ওখানে আমি আর কখনো মধু পান করবোনা।' আর তখনই পবিত্র কুরআনের সূরা আত-তাহরীমের আয়াত ১ থেকে ৪ আয়াত নাযিল হলো। আয়াতে যে দু'জন নারীর কথা বলা হয়েছে, তাঁরা হলেন, আয়েশা (রাঃ) এবং হাফসা(রাঃ)। [৩৭), (৩৮)

www.pathagar.com

মধুর শরবৎ খাওয়া বিষয়ক অপর একটি হাদীস-সূত্রে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রতিদিন আসরের সালাত শেষে প্রত্যেক স্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতেন। অতঃপর নির্দিষ্ট পালা অনুযায়ী একজনের গৃহে রাত্রি যাপন করতেন। একবার এ ধরনের সৌজন্য-সাক্ষাতের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যয়নব (রাঃ)এর গৃহে তুলনামূলকভাবে অধিক সময় অতিবাহিত করেন। অনুসন্ধান করে আয়েশা (রাঃ) জানতে পারেন, নবী (সাঃ) ওখানে বসে মধুর শরবত পান করছিলেন। বিষয়টি আয়েশা (রাঃ) অপছন্দ করেন। অত:পর তিনি হাফসা (রাঃ)র সাথে পরামর্শ করে কৌশল আঁটলেন। কৌশলের ফল হাতেনাতেই পাওয়া গেল। নবী (সাঃ) যয়নব (রাঃ)র গৃহে আর কখনো মধু খাবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করে ফেললেন। এর ফলশ্রুতিতে সূরা আত-তাহরীমে আল্লাহতা'য়ালার অসন্তোষের বাণীসম্বলিত আয়াত নাযিল হলো। একটি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক নিজের জন্য হালাল জিনিসকে হারাম করে নেয়া এবং অপরটি হচ্ছে দু'জন উম্মুল মুমিনীন কর্তৃক নবী (সাঃ)র বিরুদ্ধে অযৌক্তিক কৌশল অবলম্বন। আত-তাহরীমের উল্লিখিত আয়াতসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট হাদীস আমাদের জানাচ্ছে, নবী-গৃহেও আর দশটি সংসারের মতো সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার ঘটনা ঘটতো। দশজন মানুষের সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনার যে অনুভূতি, নবী-গৃহের মানুষজনের মধ্যেও অনুরূপ অনুভূতি কাজ করতো; তাদের মধ্যে অন্য সবার মতোই স্নেহ-ভালবাসা-ঈর্ষা-বিদ্বেষ সক্রিয় ছিল।

উম্মুল মুমিনীনদেরকে আল্লাহতা'য়ালা নারীকুল এবং মানবতার জন্য আদর্শ হিসাবে তৈরি করছিলেন। তাঁদের মাধ্যমেই নবী (সাঃ)র অন্তপুরে সংঘটিত ঘটনাবলী পরবর্তীকালের উম্মাতকে অবহিত করে পারিবারিক বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করা হবে। সূরা আল-আহযাবের ৩০ আয়াতে আল্লাহতা'য়ালা নবী-পত্নীদের সম্বোধন করে বলেছেন, তাঁদের কারো দ্বারা যদি কোন প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ সম্পাদিত হয়, তবে তাঁকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করা হবে। তাঁদের কোন ধরনের বিচ্যুতি আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয়।

৫.২. ইখতিয়ার সম্পর্কিত আয়াত নাযিলের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র দাম্পত্যজীবনের টানাপোড়েনের দ্বিতীয় ঘটনাটি বিধৃত হয়েছে সূরা আল-আহযাবের ২৮-২৯ আয়াতে। আয়াত দু'টিতে আল্লাহতা'য়ালা বলছেন:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ

www.pathagar.com

أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّـهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

হে নবী! তোমার স্ত্রীদেরকে বলো, 'যদি তোমরা দুনিয়া এবং তার ভূষণ চাও, তাহলে এসো আমি তোমাদের কিছু দিয়ে ভালোভাবে বিদায় করে দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখেরাতের প্রত্যাশী হও, তাহলে জেনে রাখো তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল তাদের জন্য আল্লাহ মহাপ্রতিদানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আল-আহযাব: ২৮-২৯

আল্লাহর উপরোক্ত বাণী দু'টি অত্যন্ত নৈর্ব্যক্তিকভাবে আমাদের জানাচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র কয়েকজন স্ত্রী তাঁর কাছে বিভিন্ন পার্থিব ভোগসামগ্রীর দাবি জানাচ্ছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র কাছে দেয়ার মতো ঐসমস্ত ভোগসামগ্রী ছিল না অথবা থাকলেও তিনি তা তাঁদের দিতে ইচ্ছুক ছিলেননা। তাঁদের এসব দাবি-দাওয়া নবী (সাঃ)র মনোকষ্টের কারণ হচ্ছিল এবং তিনি তাঁদের উপর অসন্তুষ্টও হচ্ছিলেন। নবী-পত্নীগণ কর্তৃক পার্থিব ভোগসামগ্রী দাবির ঘটনাটির সাথে সংশ্লিষ্ট অনেকগুলো হাদীস বুখারী এবং মুসলিমে পাওয়া যায়, তার মধ্য থেকে একটি নিচে উদ্ধৃত হলো:

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমার দীর্ঘদিনের বাসনা ছিল, আমি উমর (রাঃ)কে জিজ্ঞেস করবো, সূরা আত-তাহরীমের আয়াত - "তোমরা দু'জনের হৃদয় অন্যায়-প্রবণ হয়ে পড়েছে। তোমরা যদি অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দিকে ফিরে আসো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন।" কোন দু'জন উম্মুল মুমিনীনকে উদ্দেশ্য করে নাযিল হয়েছে। তাঁর খিলাফতের সময় একবার হজ্জ-সফরে আমি তাঁর সফর-সঙ্গী হলাম। হজ্জ শেষে ফেরার পথে অনেক কৌশল করে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'হে আমিরুল মুমিনীন! নবী (সাঃ)র স্ত্রীগণের মধ্যে কোন দুজনকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহতা'য়ালা বলেছেন, "তোমাদের দুজনের হৃদয় অন্যায়-প্রবণ .....।" উমর (রাঃ) বললেন, 'হে ইবনে আব্বাস! এ তো বড় বিস্ময়কর ব্যাপার! (আপনি এতদিন পরে এ বিষয়ে জানতে চাচ্ছেন কেন? এতো সবারই জানা।) হাদীস বর্ণনাকারী যুহরী বলেন, 'আল্লাহর কসম! উমর (রাঃ) প্রশ্নটি অপছন্দ করলেও ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে কিছুই গোপন করেননি। তিনি বললেন, 'তাঁরা দু'জন ছিলেন হাফসা এবং আয়েশা (রাঃ)। এরপর তিনি ঘটনার বিবরণ দিতে লাগলেন।

www.pathagar.com

তিনি (উমর (রাঃ)) বললেন, 'আমরা কুরাইশরা (জাহিলিয়া যুগে) আমাদের স্ত্রীদের উপর প্রভাব বিস্তার করে চলতাম। কিন্তু মদীনায় এসে আমরা এমন লোকদের সাক্ষাৎ পেলাম, যাদের উপর তাদের স্ত্রীরা প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। এমনই পরিবেশে আমাদের নারীরা মদীনার নারীদের অভ্যাস রপ্ত করতে শুরু করে দেয়। ....একদিন আমি আমার স্ত্রীর উপর রাগান্বিত হলাম। আমার স্ত্রীও দেখি আমার কথার উপর কথা বলতে লাগলেন। বিষয়টি আমার খুব অপছন্দ হলো। আমার মনোভাব বুঝতে পেরে তিনি আমাকে বললেন, 'আপনার কথার পিঠে কথা বলাটা আপনি অপছন্দ করছেন কেন? আল্লাহর কসম! নবী-পত্নীরাও নবী (সাঃ)র কথার পিঠে কথা বলে থাকেন। এমনকি তাঁরা কখনো কখনো অভিমান করে সারাদিন কথা না বলে কাটিয়ে দেন। এটি শুনে তক্ষুণি (আমার কন্যা) নবী-পত্নী হাফসার কাছে চলে গেলাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কী রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র কথার পিঠে কথা বলে থাকো?' সে বললো, 'হ্যাঁ।' আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমরা কেউ নবী (সাঃ)র সাথে অভিমান করে কথা না বলে সারাদিন কাটিয়ে দাও?' সে বললো, 'হ্যাঁ।' আমি বললাম, 'তোমাদের মধ্যে যে এরূপ আচরণ করে থাকে, সে আসলেই দুর্ভাগা ও ক্ষতিগ্রস্ত। তোমাদের মধ্যে কেউ কি বিপদমুক্ত ও নিরাপদ হতে পারো, যদি তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ)এর ক্রোধের কারণ হও। এরূপ হলেতো ধ্বংস অনিবার্য। তুমি কখনো রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হবে না এবং তাঁর কাছে কোনকিছু দাবি করবে না। তোমার কোন চাহিদা থাকলে তা আমাকে জানাবে। তোমার সপত্নী তোমার চাইতে বেশি সুন্দরী এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র নিকট অধিকতর প্রিয়। তিনি যেন তোমায় ধোঁকায় ফেলতে না পারেন (এখানে তিনি সপত্নী বলতে আয়েশা (রাঃ)কে বুঝিয়েছেন)।'

তিনি (উমর (রাঃ)) বলেন, 'আমার এক আনসারী প্রতিবেশী ছিলেন। আমরা দুই বন্ধু প্রতিদিন পালাক্রমে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র নিকট (তাঁর মজলিসে) যেতাম। ওহী নাযিলসহ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র ওখানে যা যা ঘটতো আমরা পরস্পরের নিকট বর্ণনা করতাম। .... একদিন তিনি নবী (সাঃ)র গৃহ থেকে ফিরে এসে উত্তেজিত অবস্থায় জানালেন, সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে। নবী (সাঃ) তাঁর সকল পত্নীদের তালাক দিয়েছেন। আমি বললাম, হাফসা হতাশ ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। পূর্ব থেকেই আমার মনে হচ্ছিল এমন একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। ফযরের সালাত শেষে আমি হাফসার কাছে উপস্থিত হলাম। তখন

www.pathagar.com

তিনি কাঁদছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কী আপনাদের সবাইকে তালাক দিয়েছেন?' শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বললেন, 'আমি জানি না। তবে তিনি তাঁর ঐ চিলেকোঠার নির্জন কুঠুরিতে বাস করছেন।' আমি নবীজী (সাঃ)র খাদেমের কাছে গিয়ে বললাম, 'রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র নিকট থেকে উমরের জন্য অনুমতি নিয়ে আসুন।' তিনি ভিতরে গেলেন এবং বেরিয়ে এসে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি আপনার কথা উত্থাপন করেছি, কিন্তু তিনি নীরব থাকলেন।' আমি চলে এলাম এবং মিম্বারের কাছে এসে বসে পড়লাম। ওখানে একদল লোক বসে আছেন এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ ডুকরে ডুকরে কাঁদছেন। আমি অস্থির-অধৈর্য হয়ে পড়লাম। আবার ঐ খাদেমের কাছে গিয়ে উমরের জন্য অনুমতি আনতে বললাম। তিনি ভিতরে গিয়ে ফিরে এসে পুনরায় বললেন, 'আমি আপনার কথা বলেছি, কিন্তু তিনি নিরুত্তর রয়েছেন। আমি ফিরে যেতে উদ্যত হয়েছি, তক্ষুণি খাদেম আমাকে ডাক দিয়ে বললেন, 'আপনি প্রবেশ করুন; তিনি আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন।' আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে সালাম জানালাম। তাঁকে দেখলাম খেজুর পাতার একটি চাটাইয়ের উপর হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন। তাঁর পার্শ্বদেশে চাটাইয়ের দাগ বসে গেছে। আমি তাঁকে বললাম, 'হে রাসূলুল্লাহ! আপনি কি আপনার স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন?' তিনি মাথা তুলে আমার দিকে তাকালেন এবং বললেন, 'না।' আমি বললাম, 'আল্লাহু আকবার! হে রাসূলুল্লাহ! আপনি একবার ভেবে দেখুন- আমরা কুরাইশ বংশের লোকেরা আমাদের স্ত্রীদের উপর প্রভাব বিস্তার করে এসেছি। কিন্তু মদীনায় এসে দেখলাম এখানকার নারীরা তাদের পুরুষদের উপর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। তাদের দেখাদেখি আমাদের নারীরা এখন ঐ অভ্যাস রপ্ত করতে শুরু করেছে। একদিন আমি আমার স্ত্রীর উপর রাগান্বিত হলাম। অমনি তিনি আমার সাথে তর্কে লিপ্ত হলেন। ....।' সব শুনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মৃদু স্বরে হেসে উঠলেন। আমি বললাম, 'হে রাসূলুল্লাহ! আমি হাফসার কাছে গিয়ে তাঁকে বলেছি, আপনার সপত্নী আপনার চাইতে..... ....।' এবারও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মুচকি হাসলেন।

আমি আবার বললাম, 'হে রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার সাথে একান্তে আলাপ করতে চাই।' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, করতে পারেন।' আমি মাথা তুলে ঘরের চারিদিকে চোখ বুলিয়ে দেখলাম। আল্লাহর কসম! আমি সেখানে তিনখানি চামড়া ব্যতীত চোখে পড়ার মতো আর কিছু দেখিনি। আমি বললাম, 'হে রাসূলুল্লাহ! আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন তিনি যেন আপনার উম্মাতকে

www.pathagar.com

প্রাচুর্য দান করেন। পারসিক ও রোমকদেরতো বিপুল বৈষয়িক সুখ-সমৃদ্ধি দান করা হয়েছে। অথচ তারা আল্লাহর ইবাদাত করে না। তখন তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, 'হে খাত্তাবের পুত্র! আপনি কী সন্দেহের জালে জড়িয়ে পড়েছেন? আসলে তারা তো এমন এক সম্প্রদায়, যাদেরকে পার্থিব জীবনের সাময়িক সুখ-সমৃদ্ধি দান করা হয়েছে।' আমি বললাম, 'হে রাসূলুল্লাহ! আপনি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।' তিনি তাঁর সহধর্মিণীগণের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, একমাস তাঁদের কারো সাহচর্যে আসবেন না।

যুহরী (রহ:) বলেন, 'উরওয়া (রহ:) আয়েশা (রাঃ) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, 'যখন উনত্রিশ দিন অতিবাহিত হলো, তখন প্রথমে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার নিকট আসলেন। তখন আমি বললাম, 'হে রাসূলুল্লাহ! আপনি তো কসম করেছিলেন, একমাস আমাদের কাছে আসবেন না; অথচ আজতো উনত্রিশ দিন অতিবাহিত হলো। আমি এক এক করে দিন গুনেছি।' জবাবে তিনি বললেন, 'মাস উনত্রিশ দিনেও হয়।' অতঃপর তিনি বললেন, 'হে আয়েশা! আমি একটি ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত জানতে চাই। তবে আপনার বাবা-মায়ের সাথে পরামর্শ না করে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত জানানোর প্রয়োজন নেই।' তখন তিনি সূরা আল-আহযাবের ২৮-২৯ আয়াত পাঠ করলেন, 'হে নবী! তোমার স্ত্রীদেরকে বলো, যদি তোমরা দুনিয়া এবং তার ভূষণ চাও, তাহলে এসো আমি তোমাদের জন্য তার কিছু ব্যবস্থা করে দিই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় করে দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও পরকালের প্রত্যাশী হও, তাহলে জেনে রাখো তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল তাদের জন্য আল্লাহ মহাপ্রতিদানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।' আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমি তক্ষুণি বললাম, 'হে রাসূলুল্লাহ! এ বিষয়ে আমি কি আমার বাবা-মায়ের সাথে পরামর্শ করতে যাবো? নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং পরকাল কামনা করি ....।' অত:পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একে একে প্রত্যেক স্ত্রীকে আয়াত দুটি শুনিয়ে তাঁদের মতামত জানতে চাইলেন এবং প্রত্যেকেই আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এবং আখিরাতকেই প্রাধান্য দিলেন।[৩৯]

হাদীসটি আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র সমসাময়িককালে মক্কা এবং মদীনা অঞ্চলের সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য সম্পর্কে ধারণা দিচ্ছে। উমর (রাঃ)র জবানীতে আমরা জানতে পারছি, মক্কার সংস্কৃতিতে পুরুষতান্ত্রিকতার প্রভাব প্রবল ছিল। পক্ষান্তরে মদীনার সংস্কৃতি ছিল উদার এবং সমতাভিত্তিক।

www.pathagar.com

উম্মুল মুমিনীনরাও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র সাথে বিভিন্ন বিষয়ে বাদানুবাদে লিপ্ত হতেন, এমনকি কখনো অভিমান ভরে সারাদিন কথা না বলে থাকতেন। উমর (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র কাছে অভিযোগ করলেন মদীনার সংস্কৃতি মক্কার নারীদের প্রভাবিত করছে, তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন উত্তর না দিয়ে মৃদু হাসলেন। কী চমৎকার দৃশ্য! কোন বিশেষ অঞ্চলের সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি নবী হিসাবে প্রেরিত হন নি। আল্লাহ তাঁর নবী (সাঃ)কে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন কুরআন তথা আল্লাহর সংস্কৃতি, মানুষের নিজস্ব ফিতরাতকে জাগ্রত করার জন্য। সুতরাং উমর (রাঃ)র অভিযোগের প্রত্যুত্তরে তাঁর মৃদু হাসিটাই যথার্থ। আবার তিনি যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে জানালেন, নবী-পত্নী হাফসা (রাঃ)কে (তাঁর কন্যা) আয়েশা (রাঃ)র সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কারণে তিনি বকাঝকা করেছেন, তখনও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মৃদু হাসলেন, কিন্তু কোন জবাব দিলেন না। রূপ-গুণ যার যেমনই হোক, নবী-পত্নী হিসাবে প্রত্যেকেরই মর্যাদা সমান। এতো আল্লাহরই হুকুম যে, একাধিক স্ত্রী থাকলে, তাদের প্রত্যেকের সাথে ইনসাফ-ভিত্তিক সমানাচরণ করতে হবে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এক্ষেত্রেও অত্যন্ত সঙ্গতভাবে কোন জবাব না দিয়ে কেবল মৃদু হাসলেন।

৫.৩. *সূরা আন-নূর-এ উদ্ধৃত মিথ্যা অপবাদের (ইফক) ঘটনা*

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র পারিবারিক জীবনে সংঘটিত একটি ঘটনা-সূত্রে সূরা আন-নূরের ১১ থেকে ২২ আয়াতে আল্লাহতা'য়ালা অনেকগুলো হুকুম এবং দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। যে ঘটনা-সূত্রে আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে, এটি 'ইফক'এর ঘটনা নামে খ্যাত। 'ইফক' শব্দটির অর্থ হচ্ছে মিথ্যা অপবাদ। আয়াতগুলো নিম্নে উদ্ধৃত হলো:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ
خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ
كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾ لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ
الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾
لَّوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ

www.pathagar.com

عِندَ اللَّـهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٣﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّـهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّـهِ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَـٰذَا سُبْحَانَكَ هَـٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾ يَعِظُكُمُ اللَّـهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾ وَيُبَيِّنُ اللَّـهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۚ وَاللَّـهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّـهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّـهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّـهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّـهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَـٰكِنَّ اللَّـهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّـهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّـهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّـهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢﴾

যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদের অন্তর্গত একটি দল। একে তোমরা নিজেদের জন্যে খারাপ মনে করো না; বরং এটি তোমাদের জন্যে মঙ্গলজনক। এর মধ্যে যে যতটা অংশ নিয়েছে সে ততটাই গোনাহ কামাই করেছে এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে নেতৃত্ব দিয়েছে, তার জন্যে রয়েছে মহাশাস্তি। তোমরা যখন একথা শুনলে, তখন মু'মিন পুরুষ

www.pathagar.com

ও মু'মিন নারীরা কেন নিজেদের সম্পর্কে সুধারণা করেনি এবং কেন বলেনি যে, এ তো মিথ্যা অপবাদ? তারা কেন (মিথ্যা অপবাদ রটানোর পরিবর্তে) এ ব্যাপারে চার জন সাক্ষী উপস্থিত করেনি। তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি বিধায়, আল্লাহর কাছে তারাই মিথ্যাবাদী। যদি ইহকালে ও পরকালে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না থাকত, তবে যেসব কথায় তোমরা লিপ্ত হয়ে গিয়েছিলে সেগুলোর কারণে তোমাদের ওপরে মহাশাস্তি নেমে আসতো। তোমরা এক মুখ থেকে আর এক মুখে এ মিথ্যা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছিলে এবং এমন সব কথা বলে যাচ্ছিলে যার সম্পর্কে তোমাদের কিছুই জানা ছিল না। তোমরা একে নিতান্ত মামুলি কথা মনে করছিলে, অথচ আল্লাহর কাছে এটি গুরুতর ব্যাপার ছিল। একথা শোনার সাথে সাথেই তোমরা বলে দিলে না কেন, "এমন কথা মুখ দিয়ে বের করা আমাদের শোভা পায় না, সুব্হানাল্লাহ! এ তো একটি জঘন্য অপবাদ।" আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি মু'মিন হয়ে থাক, তবে ভবিষ্যতে কখনও এ ধরনের আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না। আল্লাহ তোমাদের জন্যে স্পষ্ট করে নির্দেশ প্রদান করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান। যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার ঘটুক, তাদের জন্যে ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা তোমাদের প্রতি না থাকতো এবং আল্লাহ যদি স্নেহশীল ও দয়ার্দ্র না হতেন (তাহলে যে জিনিস তোমাদের মধ্যে ছড়ানো হয়েছিলো তার পরিণাম হতো অতি ভয়াবহ।) হে ঈমানদারগণ! শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, সে তাকে অশ্লীল ও মন্দ কাজেরই আদেশ করবে। যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের প্রতি না থাকত, তবে তোমাদের কেউ পবিত্র হতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্রতা দান করেন। আল্লাহ সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞ। তোমাদের মধ্যে যাদেরকে সদগুণ ও আর্থিক প্রাচুর্য দিয়ে ধন্য করা হয়েছে, তারা যেন এমন কসম না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজনকে, দরিদ্র-অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদেরকে কিছুই দেবে না। তোমাদের উচিত তাদের ক্ষমা করা এবং দোষত্রুটি উপেক্ষা করা। তোমরা কি কামনা কর না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। সূরা আন-নূর: ১১-২২

www.pathagar.com

লক্ষণীয়, আয়াতগুলোতে 'ইফক' অর্থাৎ মিথ্যা অপবাদের যে ঘটনাটি ঘটেছিল তার কোন বর্ণনা নেই। কেবল 'যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে' এটুকু বলেই সিদ্ধান্ত প্রদান শুরু হয়েছে। মিথ্যা অপবাদ রটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, এর মধ্য থেকে শিক্ষণীয় বিষয়াবলী, সমাজে এর প্রভাব, এর খারাপ দিক, অপবাদ রটানোর ক্ষেত্রে মুমিন-মুমিনাদের করণীয়-বর্জনীয়, ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহতা'য়ালা মূল ঘটনাটি উল্লেখ না করেই 'মিথ্যা অপবাদ'কেই আয়াতগুলোর কেন্দ্রীয় বিষয়ে পরিণত করেছেন। এটা অবশ্যই সত্য যে, কোন বিশেষ ব্যক্তি বা নির্দিষ্ট ঘটনা মুখ্য বিষয় নয়। ঘটনার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বা ষড়যন্ত্র এবং ঘটনার ফলাফল, সুদূরপ্রসারী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই মুখ্য। আল্লাহতা'য়ালার কী অপূর্ব বর্ণনা-কৌশল! আর এ জন্যই কুরআন মজীদ সার্বজনীন-সর্বকালীন শিক্ষণীয় গ্রন্থ। উল্লিখিত আয়াতগুলো থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তসমূহও লক্ষণীয়:

১. যেমনটি আমরা বলে থাকি, যা কিছু ঘটে সব কিছুর মধ্যেই মুমিনের জন্য কল্যাণ নিহিত থাকে; ঠিক তেমনভাবেই আল্লাহতা'য়ালা প্রথমেই জানাচ্ছেন, মিথ্যা অপবাদ রটনার যে ঘটনা ঘটেছে, সেটি মুমিনদের জন্য কল্যাণকর।

২. মিথ্যা অপবাদ রটনার কাজে যার যতটুকু অংশগ্রহণ, সে ততটুকু গুনাহর বোঝা মাথায় তুলে নিয়েছে। এ কাজে নেতৃত্ব দানকারীর গুনাহ সর্বাধিক এবং তার জন্য রয়েছে সর্বোচ্চ শাস্তি।

৩. প্রত্যেক মুমিন পুরুষ এবং নারী অপর মুমিন পুরুষ এবং নারী সম্পর্কে সবসময় মনে সুধারণা পোষণ করবে।

৪. কোন মুমিনের নামে সাক্ষ্য-প্রমাণবিহীন মিথ্যা অপবাদ শোনা-মাত্রই সকল মুমিন নারী-পুরুষ প্রচারিত অপবাদটিকে মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করবে।

৫. প্রমাণবিহীন মিথ্যা অপবাদ শোনা মাত্রই সেটি এক কান থেকে আর কানে রটানো যাবে না। অর্থাৎ প্রমাণিত নয় এমন অপবাদ মুমিনদের সমাজে প্রচার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

৬. কোন মুমিন পুরুষ বা নারী কখনোই কোন মিথ্যা অপবাদ রটনার কাজে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৭. যে বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট জ্ঞান (তথ্য-প্রমাণ) নেই, সে বিষয়ে কোন কথা বলা যাবে না।

www.pathagar.com

৮. অপবাদ রটনার কাজে কাউকে নিয়োজিত দেখলে তার বিরুদ্ধে বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ উত্থাপন করে তাকে জবাবদিহির মুখোমুখি করতে হবে।

৯. ন্যূনতম চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্য অথবা সুনির্দিষ্টভাবে অপবাদের যথার্থতার প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

১০. অপবাদের প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত না হলে মিথ্যা অপবাদ তৈরি এবং রটনার দায়ে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান এবং জঘন্য মিথ্যা অপবাদ রটানোর অপরাধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১১. অপবাদ রটনা একটি শয়তানী কাজ। আর মুমিনদের সমাজে অশ্লীলতা এবং মন্দ কাজের প্রসার ঘটানোই শয়তানের উদ্দেশ্য। সুতরাং মুমিনদের কর্তব্য হচ্ছে সকল শয়তানী কাজ পরিহার করা।

১২. আর্থিক সচ্ছলতা এবং সদগুণসম্পন্ন কোন মুমিন কারো প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে কখনো এমন কোন প্রতিজ্ঞা করবে না যে, দরিদ্র আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত, অথবা আল্লাহর পথে যারা ঘর থেকে বেরিয়েছে তাদের কোন সাহায্য করবে না।

১৩. এমন কি ঐসব দরিদ্র ব্যক্তিরা যদি ভুলক্রমে কখনো কোন অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়, তাহলেও তাদেরকে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকার প্রতিজ্ঞা করা যাবে না।

১৪. মানুষের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া আল্লাহর কাছে খুব বেশি পছন্দনীয়। ক্ষমাশীলতা আল্লাহতা'য়ালার বিশেষ গুণ। আল্লাহতা'য়ালার নিজের এ গুণে গুণান্বিত হতে মানুষকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

সূরা আন-নূরের ১১ থেকে ২২ আয়াত পর্যন্ত ১২টি আয়াত পর্যালোচনা করে আমরা যেসব সিদ্ধান্ত পেয়েছি, তার সাথে আমাদের মূল আলোচনার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু আয়াতগুলো থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তসমূহ এমনই হৃদয়গ্রাহী যে, এগুলো উদ্ধৃতির ইচ্ছা দমন করা গেল না। মূল ঘটনা একটি জঘন্য মিথ্যা অপবাদের। কিন্তু ঘটনার কোন উল্লেখ ছাড়াই আল্লাহতা'য়ালা মিথ্যা অপবাদ রটনার ক্ষেত্রে বিশ্বাসী মুসলিম সমাজের করণীয়-বর্জনীয় সম্পর্কে অনেকগুলো দিক-নির্দেশনা প্রদান করলেন। আল্লাহ কীভাবে বিশ্বাসী জনগোষ্ঠীর চরিত্র সুগঠিত করতে চান এ দিক-নির্দেশনাসমূহ তারই কিছু নমুনা মাত্র। এসবই আল্লাহর ফিতরাতের অংশ আর এ ফিতরাত দিয়েই তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানুষ বরাবরই শয়তানের ধোঁকা এবং কুপ্ররোচনার ফলে বিপথগামী হয়ে

www.pathagar.com

পড়ে। মানুষকে তার ফিতরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং শয়তানের কুপ্ররোচনা থেকে রক্ষা করার জন্যই কুরআনের অবতারণা।

আমরা দেখেছি, উল্লিখিত ১২টি আয়াতে 'ইফক'এর মূল ঘটনাটির কোন বর্ণনা ছাড়াই সমাজে মিথ্যা অপবাদ ছড়িয়ে পড়লে করণীয়-বর্জনীয় সম্পর্কে আল্লাহতা'য়ালা অনেকগুলো দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। আল্লাহতা'য়ালা যে ঘটনা বর্ণনা করেন নি, সেটি আমাদের আলোচনায় উত্থাপন করা সংগত কিনা সেটি একটি প্রশ্ন বটে। তবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র দাম্পত্য জীবনে সংঘটিত টানাপোড়েনের কয়েকটি ঘটনায় তাঁর প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল সেটিই আমাদের আলোচ্য বিষয় বিধায় ঘটনাগুলোর উপর আলোকপাত এক্ষেত্রে নিতান্তই আবশ্যক। 'ইফক' বা মিথ্যা অপবাদের ঘটনাটির সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীসটি প্রায় সকল সহীহ হাদীস গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। নিম্নের হাদীসটি 'সহীহ মুসলিম' থেকে সংগৃহীত।

হাব্বাব ইবনে মূসা .... উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁরা সকলেই আয়েশা (রাঃ)র ঐ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন, অপবাদ রটনাকারীরা তাঁর ব্যাপারে যে অপবাদ রটনা করেছিল। তারপর কুরআনের আয়াত নাযিল করে আল্লাহ তাঁকে ঐ অপবাদ থেকে নির্দোষ ঘোষণা করলেন। বর্ণানাকারী যুহরী বলেন, 'তাঁরা সকলেই আমার নিকট হাদীসের এক এক অংশ বর্ণনা করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ অন্যের তুলনায় কঠোর হাফিয ছিলেন এবং উত্তমরূপে হাদীস বর্ণনায় সক্ষম ছিলেন। তাঁরা আমার নিকট যা বর্ণনা করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের বর্ণনা আমি উত্তমরূপে মুখস্থ রেখেছি। তাঁদের একের হাদীস অন্যের হাদীসকে সত্যায়িত করে। তাঁরা সকলেই আলোচনা করেছেন যে,

নবী-সহধর্মিণী আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন তখন তিনি স্ত্রীদের মধ্যে লটারি করতেন। যাঁর নাম আসত, তাঁকেই তিনি তাঁর সফর-সঙ্গী করতেন। এক যুদ্ধ-সফরের পূর্বে নবী (সাঃ) লটারি করলেন এবং তাতে আমার নাম উঠল। আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র সাথে ঐ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। এটি ছিল পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পরবর্তীকালের ঘটনা। সওয়ারী অবস্থায় আমি হাওদার ভিতর থাকতাম এবং অবতরণকালেও হাওদার ভিতর থাকতাম। যুদ্ধশেষে প্রত্যাবর্তনকালে মদীনার কাছাকাছি একটি স্থানে আমরা অবস্থান করছিলাম। রাত্রিবেলায় তিনি রওয়ানা

www.pathagar.com

হওয়ার নির্দেশ দিলেন। লোকজন যখন রওয়ানা হওয়ার ব্যাপারে ঘোষণা দিলেন, তখন আমি দাঁড়িয়ে চলতে লাগলাম; এমনকি আমি সৈন্যদেরকে ছাড়িয়ে চলে গেলাম। এরপর আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে সওয়ারীর কাছে এসে লক্ষ্য করলাম যিফারী পূর্তির তৈরি হারটি আমার গলায় নেই, ওটি হারিয়ে গেছে। আমি আবার পূর্ববর্তী স্থানে ফিরে এসে আমার হারটি খুঁজলাম। এতে আমার বিলম্ব হয়ে গেল। এদিকে হাওদা বহনকারী লোকজন এসে হাওদা উঠিয়ে আমায় বহনকারী উটের উপর রেখে দিয়েছে। তারা ধরেই নিয়েছে, আমি হাওদার ভিতর আছি। স্বল্পাহারের কারণে তখনকার মহিলারা হালকা-পাতলা গড়নের হতো। তদুপরি আমি ছিলাম অল্পবয়স্কা। তাই হাওদা উত্তোলনকালে তাদের কাছে এর ওজন সাধারণ অবস্থার চাইতে ব্যতিক্রম কিছু মনে হয় নি। অবশেষে লোকেরা উট দাঁড় করিয়ে পথ চলতে আরম্ভ করলো। ইত্যবসরে আমি আমার হার খুঁজে পেলাম এবং পূর্ববর্তী স্থানে (যেখানে হাওদা ছিল) ফিরে এসে দেখি সেখানে জনমানুষের কোন চিহ্ন নেই। তখন আমি ইচ্ছা করলাম, আমি যেখানে বসা ছিলাম, সেখানেই বসে থাকবো এবং আশা করছিলাম, লোকেরা যখন খুঁজে আমাকে পাবে না, তখন অবশ্যই তারা আমার সন্ধানে আমার নিকট ফিরে আসবে। বসে থাকা অবস্থায় একসময় আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। (কোনকিছু ফেলে গেলে, তা যথাস্থানে পৌঁছিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যরা স্থান ত্যাগের পর সে সময় একজনের দায়িত্ব থাকতো সবার শেষে স্থানটি ভাল করে দেখে নেয়া। -এটি সহীহ বুখারী থেকে নেয়া হয়েছে) সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল আসসুলামী আয-যাকওয়ানী (রাঃ) পুরো এলাকা পরিদর্শন শেষে প্রত্যুষে আমার স্থানে পৌঁছালেন। দূর থেকে তিনি একটি মানবদেহ দেখে আমার কাছে এলেন এবং আমাকে দেখে চিনে ফেললেন। কারণ, পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। তিনি উচ্চস্বরে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না লিল্লাহি রাযিউন' পড়লেন আর তাতেই আমার ঘুম ভেঙে গেল। তৎক্ষণাৎ আমি আমার চাদর দিয়ে স্বীয় মুখমণ্ডল আবৃত করলাম। আল্লাহর কসম! তিনি আমার সাথে কোন কথা বলেন নি। 'ইন্না লিল্লাহ...' বলা ছাড়া তাঁর কোন কথাই আমি শুনি নি। তিনি নিজের উটকে বসিয়ে দিয়ে স্বীয় হস্ত প্রসারিত করলেন এবং আমি উটের পিঠে চড়ে বসলাম। তিনি পায়ে হেঁটে উটকে হাঁকিয়ে নিয়ে গেলেন। এক সময় আমরা সৈন্যদলের নিকটে গিয়ে পৌঁছলাম। তখন তারা দুপুরের প্রচণ্ড রোদে সওয়ারী থেকে নেমে ভূমিতে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন।'

www.pathagar.com

আয়েশা (রাঃ) আরো বললেন, 'আমার বিষয়ে যারা ধ্বংস হবার তারা ধ্বংস হয়ে গেল। এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল। অবশেষে আমরা মদীনায় পৌঁছলাম। মদীনায় পৌঁছার পর একমাস পর্যন্ত আমি অসুস্থ ছিলাম। এদিকে মদীনার লোকজন অপবাদ রটনাকারীদের কথা গভীরভাবে পর্যালোচনা করে দেখতে লাগল। এ সম্পর্কে আমি কিছুই জানতে পারি নি। তবে এ রুগ্ন অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র নিকট থেকে পূর্বের মতো ভালবাসা না পাওয়ায় আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক হলো। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঘরে প্রবেশ করে সালাম জানিয়ে বলতেন, 'এ মহিলা কেমন আছে?' তাঁর আচরণ আমাকে সন্দিগ্ধ করে তুললো। আমি সে সম্বন্ধে (মিথ্যা অপবাদ) কিছুই জানতাম না। রোগমুক্ত হওয়ার পর আমি একদিন বের হলাম। মিসতাহ-র আম্মাকে সাথে নিয়ে আমরা মানাসি প্রান্তরের দিকে গেলাম। সেটি ছিল আমাদের শৌচাগার। আমরা রাত্রেই বের হতাম। .... প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ শেষে আমরা বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। মিসতাহ-র আম্মা নিজ চাদরে প্যাঁচ লেগে হোঁচট খেয়ে হঠাৎ মাটিতে পড়ে যান এবং সাথে সাথে তিনি বলে উঠলেন, 'মিসতাহ ধ্বংস হোক!' তখন আমি তাঁকে বললাম, 'আপনি অন্যায় কথা বলছেন। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির সম্পর্কে আপনি মন্দ বলছেন?' তিনি বললেন, 'হে অবলা নারী! মিসতাহ কী বলে বেড়াচ্ছে, তা কী আপনি শোনেন নি?' আমি জানতে চাইলাম তিনি কি বলেছেন।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'মিসতাহ-র আম্মা তখন আমাকে অপবাদ রটনাকারীরা যা রটাচ্ছে তা বিস্তারিত জানালেন। সব শোনার পর আমার রোগ আরো বেড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার গৃহে প্রবেশ করে সালাম করলেন এবং পূর্ববৎ বললেন, 'এ মহিলা কেমন আছে?' তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি আমাকে আমার বাবা-মায়ের বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি দেবেন?' আমার ইচ্ছে হচ্ছিল বাবা-মায়ের বাড়ি গিয়ে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে অনুমতি দিলেন। আমি আমার বাবা-মায়ের কাছে চলে এলাম। আমার মাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'লোকেরা কী কথা বলছে? তিনি বললেন, 'মা! এসব কথায় কান দিওনা এবং এগুলোকে খারাপ মনে করো না। কারো যদি সুন্দরী স্ত্রী থাকে এবং সে তাকে ভালবাসে, একই সাথে ঐ মহিলার যদি সতীনও থাকে, তাহলে সতীনরা দোষচর্চা করবে না, এমনটি খুব কম দেখা

www.pathagar.com

যায়।' রটনাকারীদের সমস্ত কথা শুনে আমি কেঁদে কেঁদে দিবা-রাত্রি অতিবাহিত করতে লাগলাম।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'এদিকে আমাকে তালাক দেয়ার ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) এবং উসামা ইবনে যায়িদ (রাঃ)কে ডাকলেন, (অন্য এক হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উমর (রাঃ)র পরামর্শও চেয়েছিলেন এবং উমর (রাঃ) বলেছিলেন তিনি আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে ভাল ব্যতীত মন্দ কিছুই জানেন না।)। তখন ওহী নাযিল স্থগিত ছিল। উসামা (রাঃ) বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আয়েশা আপনার স্ত্রী; ভাল ব্যতীত তাঁর সম্বন্ধে কোন কথাই আমার জানা নেই। আলী (রাঃ) বললেন, 'আল্লাহ তো আপনার উপর কোন সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেন নি। সর্বোপরি আয়েশা ছাড়াও বহু স্ত্রীলোক আছে। আপনি যদি দাসী (বারীরা)কে জিজ্ঞেস করেন, তবে সে সত্য বলে দেবে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বারীরা (রাঃ)কে ডেকে বললেন, 'হে বারীরা! সন্দেহমূলক কোন কাজে আপনি আয়েশাকে কখনো দেখেছেন কী?' বারীরা (রাঃ) বললেন, 'ঐ সত্ত্বার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য-নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন; তাঁর মধ্যে যদি কোন দোষ আমি দেখতাম, তাহলে তা অবশ্যই আমি বর্ণনা করতাম। তবে তিনি একজন অল্পবয়স্কা নারী। পরিবারের জন্য আটার খামীর বানিয়ে রেখেই তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন আর বকরী এসে তা খেয়ে ফেলতো। এ দোষ ব্যতীত আর কোন দোষ আয়েশার মধ্যে আছে বলে আমার জানা নেই।'

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মিম্বরে দাঁড়িয়ে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই (অপবাদ ছড়ানোর কাজে নেতৃত্বদানকারী এবং চিহ্নিত মুনাফিক) থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে মুসলিম সম্প্রদায়! আমার পরিবার সম্পর্কে যে ব্যক্তির পক্ষ থেকে কষ্টদায়ক রটনার সংবাদ আমার নিকট পৌঁছেছে, তার প্রতিশোধ গ্রহণ করার মত কোন ব্যক্তি এখানে উপস্থিত আছে কী? আমি তো আমার পরিবার সম্পর্কে ভাল ব্যতীত অন্য কোন কথা জানি না এবং যে ব্যক্তি সম্পর্কে (সাফওয়ান) তারা অপবাদ রটনা করছে, তাকেও আমি নেককার বলেই জানি। সে তো আমাকে ছাড়া কখনো আমার গৃহে প্রবেশ করতো না।' একথা শুনে সা'দ ইবনে মু'আয আনসারী (রাঃ) দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'হে রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার পক্ষ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবো। অপবাদ রটনাকারী যদি আউস গোত্রের হয়, তাহলে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেবো। আর যদি সে আমার

www.pathagar.com

ভ্রাতা খাযরাজ গোত্রের হয়, তবে আপনি আমাদের নির্দেশ দিন। আমরা তা পালন করবো।' তখন খাযরাজ সর্দার সা'দ ইবনে উবাদা (রাঃ) দাঁড়ালেন। যদিও তিনি একজন নেককার লোক ছিলেন, তথাপি বংশীয় অহমিকা তাঁকে ক্রোধে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। তাই তিনি সা'দ ইবনে মু'আয(রাঃ)কে বললেন, 'আল্লাহর কসম! আপনি তাকে হত্যা করতে পারেন না।' একথা শুনে সা'দ ইবনে মু'আয (রাঃ)র চাচাত ভাই উসায়দ ইবনে হুযায়র (রাঃ) দাঁড়িয়ে সা'দ ইবনে উবাদা (রাঃ)কে বললেন, 'আপনি মিথ্যা বলছেন। আল্লাহর কসম! আমরা অবশ্যই তাঁকে হত্যা করব। অবশ্যই আপনি মুনাফিক। তাই মুনাফিকদের পক্ষে কথা বলছেন।' এ সময় আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা পরস্পর উত্তেজিত হয়ে উঠল। এমনকি তারা যুদ্ধের সংকল্প করে বসলো। অথচ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের সামনে মিম্বরে দাঁড়ানো অবস্থায়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁদেরকে থামিয়ে শান্ত করলেন। তারা চুপ করে গেলেন এবং তিনি নিজেও আর কোন কথা বললেন না।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'অবিরাম অশ্রুপাত আর নির্ঘুম রাত, এভাবেই আমি দিনাতিপাত করতে লাগলাম। আমার বাবা-মা ভাবছিলেন, অবিরাম কান্নায় আমার হৃদপিণ্ড বুঝি বিদীর্ণ হয়ে যাবে। একদিন আমি ক্রন্দনরত অবস্থায় ছিলাম। আমার বাবা-মা আমার পাশে বসা ছিলেন। এমন সময় মদীনার একজন আনসার নারী আমার নিকট আসার অনুমতি চাইলে, তাঁকে অনুমতি দিলাম। তিনি ঘরে এসে আমার সাথে কাঁদতে শুরু করলেন।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'ঠিক এসময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের ঘরে প্রবেশ করলেন এবং আমাদের সালাম করে বসে পড়লেন। আমার সম্বন্ধে অপবাদ রটনা শুরু হওয়ার পর থেকে তিনি বিভিন্ন সময়ে ঘরে প্রবেশ করলেও কখনো বসেন নি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বসে তাশাহুদ পাঠ করলেন। তারপর বললেন, 'যাই হোক, হে আয়েশা! আপনার সম্পর্কে আমার কাছে এমন এমন সংবাদ পৌঁছেছে। যদি আপনি এ ব্যাপারে নিষ্পাপ এবং পবিত্র হয়ে থাকেন, তবে শীঘ্রই আল্লাহতা'য়ালা আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করবেন। আর যদি আপনার দ্বারা কোন গুনাহের কাজ হয়ে থাকে, তবে আপনি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা এবং তাওবাহ করুন। বান্দাহ গুনাহ স্বীকার করে তাওবাহ করলে, আল্লাহ তাঁর তাওবাহ কবুল করেন।' রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কথা শেষ করার সাথে সাথে আমার অশ্রুপাত এমনভাবে বন্ধ হয়ে গেল, যেন আমার চোখের সমস্ত পানি শুকিয়ে গেছে।'

www.pathagar.com

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'অত:পর আমি আমার পিতাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার সম্পর্কে যা বললেন, আমার পক্ষ থেকে আপনি তার জবাব দিন।' তিনি বললেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে কী জবাব দিব তা আমি জানি না।' আমি আমার মাকেও বললাম আমার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে জবাব দিতে। তিনিও আল্লাহর কসম খেয়ে বললেন, তিনি জানেন না রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে তিনি কী জবাব দেবেন। আমি তখন ছিলাম অল্পবয়স্ক কিশোরী। কুরআন শরীফও বেশি পড়তে পারতাম না। আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম! আমি জানি, আপনারা আমার সম্পর্কে যে কথা শুনেছেন, তা আপনাদের মনে গেঁথে গিয়েছে এবং আপনারা তা বিশ্বাস করে নিয়েছেন। সুতরাং আমি যদি বলি আমি নিষ্কলুষ তাহলে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন না। পক্ষান্তরে আমি যদি রটিত অপবাদ সত্য বলে স্বীকার করি, যে সম্পর্কে আল্লাহ জানেন আমি নিষ্পাপ, তাহলে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন। আল্লাহর কসম! আমার ও আপনাদের জন্য (নবী) ইউসুফ (আঃ)এর পিতার কথার উদাহরণ ব্যতীত অন্য কোন উদাহরণ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। তিনি বলেছিলেন, "সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়; তোমরা যা বলছো, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার আশ্রয়স্থল। সূরা ইউসুফ:১৮" এ কথা বলে আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম এবং বিছানায় শুয়ে পড়লাম।'

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহর কসম! আল্লাহ তো ঐ মুহূর্তেও জানেন যে আমি অবশ্যই নিষ্পাপ এবং অবশ্যই আল্লাহতা'য়ালা কোন না কোনভাবে আমার পবিত্রতার কথা প্রকাশ করে দিবেন। তবে আল্লাহর কসম! আমি ধারণাও করিনি যে, আল্লাহতা'য়ালা আমার এ বিষয়ে ওহী নাযিল করবেন, যা কিয়ামাত পর্যন্ত পঠিত হবে। আমার সম্বন্ধে পঠিত হওয়ার মত কোন আয়াত আল্লাহ কর্তৃক নাযিল করা থেকে আমার অবস্থা অনেক নিম্নমানের। তবে আমি মনে মনে আশা করছিলাম, স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে এমন কিছু দেখানো হবে, যার দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার পবিত্রতার বিষয় জানতে পারবেন।'

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তখনো তাঁর স্থান ছেড়ে উঠেন নি এবং অন্যান্যরা কেউ তখনো ঘর ছেড়ে বের হন নি। এমন সময় আল্লাহতা'য়ালা তাঁর নবীর উপর ওহী নাযিল করলেন। ওহী নাযিলের সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র যে কষ্টকর অবস্থার সৃষ্টি হতো, অনুরূপ অবস্থা তখন দেখা দিল। নাযিল হওয়া ওহীর কারণে প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও তিনি ঘেমে একাকার হয়ে গেলেন এবং তাঁর দেহ থেকে বিন্দু বিন্দু ঘাম গড়িয়ে পড়তে

www.pathagar.com

লাগল। একসময় এ কষ্টকর অবস্থার সমাপ্তি ঘটলো এবং তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠলো। তিনি বললেন, 'হে আয়েশা! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন।' এটি শুনে আমার মা উৎফুল্ল হয়ে আমাকে বললেন, 'ওঠো! রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র কাছে শুকরিয়া জ্ঞাপন করো।' আমি বললাম, 'আমি তাঁর নিকট কোন শুকরিয়া জ্ঞাপন করবো না। (অন্য এক হাদীসে আছে, আয়েশা (রাঃ) আরো বলেছেন, 'আপনারা মা-বাবারও কোন শুকরিয়া আদায় করবো না') আল্লাহ ছাড়া আমি আর কারো প্রশংসা করবো না। তিনিই আমার পবিত্রতা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত (সূরা আন-নূর ১১-২২) নাযিল করেছেন।'

আল্লাহর বাণী, 'যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তো তোমাদের অন্তর্গত একটি দল। একে তোমরা তোমাদের জন্য খারাপ মনে করো না; বরং এটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর।' .... আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আত্মীয়তার বন্ধন ও দারিদ্র্যের কারণে আবু বকর (রাঃ) মিসতাহকে (অপবাদ রটনাকারীদের অন্যতম) আর্থিক সহযোগিতা করতেন। কিন্তু আমার নামে অপবাদ রটনায় অংশগ্রহণের কারণে, আবু বকর (রাঃ) কসম করে বলেছিলেন, 'আল্লাহর কসম! আমি আর কোনদিন মিসতাহকে কোন আর্থিক সাহায্য দিবনা।' তখন আল্লাহতা'য়ালা নাযিল করলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা সদগুণ ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজনকে দান করবে না ....। তোমরা কী চাওনা যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করেন।'

হাব্বান ইবনে মূসা (রঃ) বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রঃ) বলেছেন, 'আল-কুরআনের মাঝে এ আয়াত বড়ই আশাব্যঞ্জক।' তারপর আবু বকর (রাঃ) বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই পছন্দ করি যে, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দেন।' অতঃপর তিনি মিসতাহ (রাঃ)র জন্য ইতোপূর্বে যে অর্থ ব্যয় করতেন, তা পুনরায় ব্যয় করা শুরু করে দিলেন। আর বললেন, 'তাকে আমি এ অর্থ দেয়া কখনো বন্ধ করবো না। .... রাবী ইবন শিহাব (রঃ) বলেন, 'ঐ লোকদের কাছ থেকে আমার নিকট যা পৌঁছেছে তা এ-ই হাদীস।'[৪০], [৪১]

হাদীসটি অতি দীর্ঘ; কিন্তু সম্পূর্ণ হাদীসটি উল্লেখ না করলে, 'ইফক' এর ঘটনাটি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং আয়েশা (রাঃ)র কতখানি মর্মপীড়ার

www.pathagar.com

কারণ হয়েছিল তা পুরোপুরি উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না। প্রথমদিকে আয়েশা (রাঃ) সফর শেষে বাড়ি ফিরেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি জানতেনই না যে, মদীনা জুড়ে তাঁর নামে অপবাদ রটানো হচ্ছে। কিন্তু মিথ্যা অপবাদের সমস্ত কেচ্ছাকাহিনীই নবীজী (সাঃ)র কানে আসছে। এক মাসের অসুস্থতার সময় তিনি প্রতিদিনই আয়েশা (রাঃ)র গৃহে নিয়মমাফিক একবার গিয়েছেন। সালাম জানিয়ে নিষ্প্রাণ-কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেছেন মহিলাটি কেমন আছেন। প্রশ্নের মধ্যে অন্তর্জ্বালা আছে, অথচ স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা নেই। অসুস্থ অবস্থাতেও আয়েশা (রাঃ) অনুভব করছেন, তাঁর প্রিয় স্বামী রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আগের মতো করে কথা বলছেন না; অসুস্থ স্ত্রীর পাশে এসে বসছেন না; নিষ্প্রাণ-ভালবাসাহীন যান্ত্রিকভাবে সালাম জানিয়ে পরোক্ষভাবে কুশল জানতে চেয়েই গৃহত্যাগ করছেন। অথচ বুঝতে পারছেন না কেন এমন হচ্ছে।

একমাস পর কিছুটা সুস্থ হয়ে মিসতাহ (রাঃ)র মায়ের নিকট থেকে মিথ্যা অপবাদ রটনার পুরো ঘটনা শুনে বুঝতে পারলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র ভালবাসাহীনতা এবং যান্ত্রিকতার কারণ। সব শুনে তিনি আবারও অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অতঃপর তিনি নবীজী (সাঃ)র অনুমতি চাইলেন পিতৃগৃহে যাওয়ার। পিতৃগৃহে অবস্থানের মেয়াদ সম্পর্কে হাদীস থেকে কিছু জানা না গেলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না, সেটিও উল্লেখযোগ্য একটি সময়। রাতারাতি সবকিছু ঘটে যায় নি। মিথ্যা রটনার ব্যাপারে তিনি তথ্যানুসন্ধানে রত ছিলেন নিশ্চয়। এদিকে কোন অহীও নাযিল হচ্ছিলোনা। এহেন জটিল পরিস্থিতিতে হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আয়েশা (রাঃ)কে তালাক দেয়ার বিষয় বিবেচনা করলেন। পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠ বেশ কয়েকজন সাহাবীর কাছে তিনি (সাঃ) আয়েশা (রাঃ)র সম্পর্কে বিশদ জানতে চাইলেন। সবার কাছ থেকে অনুকূল মতামত পাওয়ার পর আমরা তাঁর (সাঃ) মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। মসজিদুন নববীতে ঘোষণা দিয়ে আয়েশা (রাঃ)র নিষ্কলুষতা ঘোষণা এবং অপবাদ রটনাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তারও পরে এক সময় তাঁর অন্তর কোমল হতে শুরু করল। তিনি আয়েশা (রাঃ)র ঘরে প্রথমবারের মতো বসলেন। তাঁকে বুঝালেন, নসিহত করলেন। আর সেই বৈঠকেই আয়েশা (রাঃ)র চারিত্রিক বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করে এবং 'ইফক' বা মিথ্যা অপবাদের কোন ঘটনা ঘটলে করণীয় সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা সম্বলিত অহীর মাধ্যমে কুরআনের আয়াত নাযিল হলো।

www.pathagar.com

লক্ষণীয়, দীর্ঘ হাদীসটি স্বয়ং আয়েশা (রাঃ)র জবানীতেই সকল হাদীস গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তিনি অকপটে কোন প্রকার রাখঢাক ছাড়া সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে গেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন আয়েশা (রাঃ)কে বললেন কোন ভুল করে থাকলে অপরাধ স্বীকার করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে, তখন তাঁর প্রতিক্রিয়ার কী অপূর্ব বর্ণনা! তিনি কুরআন থেকে ইউসুফ (আঃ)র পিতা ইয়াকুব (আঃ)র ধৈর্য ধারণের উপমা দিলেন। ইউসুফ (আঃ)কে শৈশবে তাঁর সৎভাইয়েরা বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়ে একটি কূপের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরে এসে তাঁরা তাঁদের পিতাকে বলেছিলেন, ইউসুফ (আঃ)কে একটি নেকড়ে এসে খেয়ে ফেলেছে। তখন ইয়াকুব (আঃ) বলেছিলেন, তাঁদের কথায় তিনি ধৈর্য ধারণ করবেন, উত্তম ধৈর্য। অন্তরে তিনি অনুভব করতে পারছিলেন, তাঁর সন্তান বেঁচে আছে। কিন্তু তাঁর সেই ধৈর্যের মেয়াদ একদিন, একমাস বা একবছর ছিলনা। সেটি ছিল কয়েক যুগ। শিশু সন্তান নিখোঁজ হয়ে গেল। জীবনের দীর্ঘ সময় অতিক্রম করে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে ইউসুফ (আঃ) একসময় মিসরের শাসনক্ষমতা গ্রহণ করলেন। তারপরেই এক পর্যায়ে তাঁর পিতা ইয়াকুব (আঃ) এবং অন্যান্য ভাইদের সাথে তাঁর মিলন হলো। আয়েশা (রাঃ) ঠিক তেমন ধৈর্য ধারণের জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফেললেন। কারণ তিনিও জানতেন তাঁর নিষ্কলুষতার বিষয় কেবল আল্লাহই অবগত আছেন; সুতরাং অন্তরে তিনি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করছিলেন যে আল্লাহই একদিন তা প্রকাশ করে দেবেন।

আয়েশা (রাঃ)কে অবশ্য দিন-মাস বা যুগ অপেক্ষা করতে হয় নি। যে বৈঠকে তিনি ধৈর্য ধারণ করার কথা বলেছিলেন, ঐ বৈঠকেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র নিকট আয়েশা (রাঃ)র নিষ্কলুষতা ঘোষণা করে কুরআনের আয়াত নাযিল হলো। অত:পর আয়েশা (রাঃ)র মা তাঁকে বললেন উঠে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে শুকরিয়া আদায় করতে। কিন্তু যেহেতু তাঁর নামে রটানো অপবাদটিকে তাঁরা কেউ মিথ্যা বলে ঘোষণা দেননি, সেহেতু তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বা তাঁর পিতা-মাতা কাউকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে অস্বীকৃতি জানালেন। তিনি শুকরিয়া আদায় করলেন আল্লাহতা'য়ালার, কারণ আল্লাহতা'য়ালাই তাঁর নিষ্কলুষতা ঘোষণা করে কুরআনের আয়াত নাযিল করেছেন, যে আয়াতগুলো কিয়ামাত পর্যন্ত পঠিত হতে থাকবে। ইস্পাত-কঠিন চারিত্রিক দৃঢ়তা থাকলেই কেবল এমনভাবে কথা বলা সম্ভব!

www.pathagar.com

৫.৪. রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র জীবনে সংঘটিত তিনটি ঘটনার পর্যালোচনা

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র দাম্পত্য-জীবনের তিনটি ঘটনা আমরা উল্লেখ করেছি, যেগুলো অহী তথা কুরআনের বাণী নাযিলের উপলক্ষ হয়েছিল। প্রথমোক্ত ঘটনায় একজন স্ত্রীর গৃহে মধুর শরবত পানের জন্য স্বাভাবিকের চেয়ে দীর্ঘতর সময় অতিবাহিত করেন। বিষয়টি অন্য দু'জন স্ত্রী অপছন্দ করেন। তাঁরা কৌশল করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র মুখে মাগাফিরের গন্ধের কথা বললে তিনি আর কখনো মধু খাবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করলেন। স্ত্রীদের একদলকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের জন্য মধু হারাম ঘোষণা করেছিলেন। আল্লাহতা'য়ালা জানতেন যে, স্ত্রীদের সন্তুষ্ট করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের জন্য মধু নিষিদ্ধ করে নিয়েছিলেন, ওই স্ত্রীরা কার্যত একটি কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। অতঃপর কুরআনের আয়াত নাযিল হলো। আল্লাহতা'য়ালা যে জিনিস হালাল করে দিয়েছেন, সেটি হারাম ঘোষণা করা যাবে না। একই সাথে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র যে স্ত্রীরা কৌশল অবলম্বন করেছিলেন তাদের প্রতিও আল্লাহতা'য়ালার অসন্তোষের কথা জানিয়ে আয়াত নাযিল হলো। অর্থাৎ কৌশলটি ছিল নিতান্ত আবেগপ্রসূত, এতে যুক্তির লেশমাত্র ছিল না। অথচ এ কৌশলের কারণে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের জন্য মধুকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ফেলেছিলেন।

নিজের জন্য মধু হারাম করে নেয়ার এ ঘটনাটিতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র করার কিছুই ছিল না। কুরআনের বাণী নাযিল করে আল্লাহতা'য়ালা নবী (সাঃ)কে জানালেন, মাগাফিরের গন্ধের বিষয়টি একটি কৌশল মাত্র, আর এর ফলে তিনি (সাঃ) একটি হালাল জিনিসকে নিজের জন্য হারাম ঘোষণা করেছেন, যা তিনি করতে পারেন না। আল্লাহতা'য়ালা তাঁর নবীকে ভুলক্রমে কখনো কসম করে ফেললে, তার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তির জন্য ইতিপূর্বে নাযিলকৃত বাণীর কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। কৌশলের জন্য দায়ী উম্মুল মুমিনীনদেরকে তাওবা করার নির্দেশ সম্বলিত বাণী নাযিল করলেন, কারণ তাঁদের মন সুপথ থেকে স্খলিত হয়ে গেছে। কিন্তু কৌশল অবলম্বনের ঘটনাটি জানার পর নবীজী (সাঃ)র পক্ষ থেকে স্ত্রীদের সংশোধনের ব্যাপারে কোন প্রকার ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। একাধিক স্ত্রী থাকার ফলে পারিবারিক জীবনে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব মোটেই অস্বাভাবিক নয়। উম্মুল মুমিনীনদের ক্ষেত্রেও এমন ঘটনা একবার ঘটেছিল। আল্লাহতা'য়ালা তাঁর রাসূলের পারিবারিক জীবনকে উপলক্ষ করে বিশ্ববাসীকে এ সত্যটি জানিয়ে দিলেন।

www.pathagar.com

উদ্ধৃত দ্বিতীয় ঘটনাটি উম্মুল মুমিনীনগণ কর্তৃক পার্থিব ভোগ-সামগ্রী দাবি এবং এতদসূত্রে 'ইখতিয়ার'এর আয়াত নাযিল সংক্রান্ত। উম্মুল মুমিনীনরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র কাছে বিভিন্ন পার্থিব ভোগ-সামগ্রী দাবি করছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র নিজের বলতে কখনো তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু থাকতো না। বিভিন্ন যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী তখন বাড়িতে আসতে শুরু করেছিল এবং মদীনার মুসলিমদের জীবনে তার প্রভাবও দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু ভোগ-বিলাসিতায় জীবন ভাসিয়ে দেয়াতো নবী (সাঃ) বা তাঁর পরিবারের জন্য নয়। কখনো কোন যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী বাড়িতে আসলে, তা তিনি যত দ্রুত সম্ভব অভাবীদের মধ্যে দান করে দিতেন। উম্মুল মুমিনীনগণ এমন সব জিনিস দাবি করছিলেন, তা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) স্ত্রীদের দিতে সম্মত ছিলেন না। দাবির মুখে তিনি নীরবতা পালনকেই শ্রেয় স্থির করলেন। এর মধ্যে হাফসা (রাঃ)র পিতা নবীজী (সাঃ)র প্রিয় সুহৃদ উমর (রাঃ) আসলেন (কোন কোন হাদীসের বর্ণনায় আছে, আয়েশা (রাঃ)র পিতা আবু বকর (রাঃ)ও আসলেন)। তিনি এসে তাঁর কন্যাকে বুঝালেন এবং বকাঝকা করলেন; রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র কাছে এমন কিছু দাবি করতে নিষেধ করলেন, যা তাঁর কাছে নেই। দৃশ্যতঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পূর্ণ নীরবতা পালন করলেন। স্ত্রীদের কাউকে কোন হিতোপদেশ দান, প্রবোধ দান বা নসিহত করার বিষয় আমরা হাদীস থেকে জানতে পারি না। স্ত্রীদের প্রতি তাঁর ন্যূনতম ক্রোধ কিংবা কাউকে কোন প্রকার প্রহারেচ্ছা দেখা গেল না। বরং উমর (রাঃ) তাঁকে হাসাবার চেষ্টা করলে একসময় তিনি হেসে ফেললেন। এক পর্যায়ে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন একমাসকাল তিনি স্ত্রীদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবেন।

ইত্যবসরে তাঁর কাছে 'ইখতিয়ার' অর্থাৎ 'ক্ষমতা প্রদান' সংক্রান্ত বাণী প্রেরিত হলো, যা সূরা আল-আহযাবের ২৮-২৯ আয়াতে সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রতিশ্রুত একমাস (২৯ দিন) অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি নির্জনবাস থেকে নেমে আসলেন। অন্য একটি হাদীস থেকে জানা যায়, ঐ চান্দ্রমাসটি ২৯ দিনেরই ছিল। একমাস পর তিনি স্ত্রীদের সান্নিধ্যে এসে প্রথম আয়েশা (রাঃ)কে ইখতিয়ারের আয়াত দুটি শুনিয়ে তার সুচিন্তিত মতামত দিতে বললেন। তাড়াহুড়ো না করে প্রয়োজনে পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ করে মতামত দিতে বললেন। আয়েশা (রাঃ)র বিচক্ষণতা এবং সিদ্ধান্ত-গ্রহণে দক্ষতা লক্ষণীয়। তিনি দৃঢ়তার সাথে জবাব দিলেন, তাঁর দাম্পত্য-জীবন সম্পর্কে মা-বাবার সাথে পরামর্শ করার কোন আবশ্যকতা নেই। পার্থিব ভোগ-সামগ্রীর পরিবর্তে তিনি আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং আখিরাতকেই গ্রহণ করবেন। রাসূলুল্লাহ

www.pathagar.com

(সাঃ) কর্তৃক অপরাপর সকল উম্মুল মুমিনীনকে কুরআনের বাণীর আলোকে একই প্রশ্ন করা হলে সকলেই একই জবাব দিয়েছেন যে, তাঁরা পার্থিব ভোগ-সামগ্রীর পরিবর্তে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং আখিরাতকেই গ্রহণ করবেন।

বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট অনেকগুলো হাদীস পর্যালোচনা করে এমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না যে, স্ত্রীদের পার্থিব ভোগ-সামগ্রী দাবির সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) স্ত্রীদের কোন উপদেশ নসিহত দান করেছিলেন। বরং এটিই পরিলক্ষিত হয় যে, তিনি কেবল নীরবতা পালন করেছিলেন। উম্মুল মুমিনীনদের দাবি-দাওয়া যদি অযথার্থ হতো, তাহলে অন্যকোন ব্যবস্থা গ্রহণের আগে উপদেশ-নসিহতের মাধ্যমে তিনি (সাঃ) তাঁদের সঠিক জ্ঞান দান করতেন। আবার স্ত্রীগণ কর্তৃক ভোগ-সামগ্রী দাবি যদি অযথার্থ হয়, তাহলে পৃথিবীর সকল নারীর জন্য স্বামীর কাছে কোন দাবি-দাওয়া পেশ অবৈধ হয়ে যায় এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে 'ইখতিয়ার' সংক্রান্ত বাণী অনাবশ্যক হয়ে পড়ে। সুতরাং এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহতা'য়ালার ইচ্ছাতেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন প্রাক-ব্যবস্থা গ্রহণ ব্যতিরেকেই এক পর্যায়ে একমাসের জন্য নির্জনবাসের সিদ্ধান্ত নিলেন। নির্জনবাসের সিদ্ধান্তটিকে কী সূরা আন-নিসার ৩৪ আয়াতে প্রদত্ত দ্বিতীয় ব্যবস্থা হিসাবে বিবেচনা করতে পারি? ঘটনার সাথে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র একাধিক স্ত্রী জড়িত বিধায় স্ত্রীদের শয্যা পৃথক করার চেয়ে নবীজী (সাঃ)র শয্যা পৃথক করে নির্জনবাসে যাওয়াটাই সহজতর। কিন্তু প্রথমতঃ ভোগ-সামগ্রী দাবির মধ্যে কোন আশংকা পরিলক্ষিত হচ্ছে না; দ্বিতীয়তঃ তিনি (সাঃ) তাঁদের দাবি-দাওয়া পেশের অবৈধতা সম্পর্কে কোন উপদেশ-নসিহত প্রদান করেন নি; তৃতীয়তঃ উম্মুল মুমিনীনগণ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র কাছে কখনো অবৈধ কিছু দাবি করতে পারেন, সেটিও অভাবনীয়।

স্ত্রীদের ভোগ-সামগ্রী দাবির মুখে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র নীরবতা পালন এবং অবশেষে ঘোষণা দিয়ে নির্জনবাসে যাওয়ার সম্ভাব্য দু'টি কারণ বিদ্যমান। প্রথম কারণ, সাধারণ নারীদের ক্ষেত্রে স্বামীর আর্থিক সঙ্গতির সীমার মধ্যে এ ধরনের দাবি-দাওয়া বৈধ। দ্বিতীয় কারণ, স্ত্রীদের এ ধরনের বৈধ দাবি-দাওয়ার মুখে স্বামী/স্বামীদের করণীয় কী, এ ব্যাপারে কুরআন মজীদে কোন নির্দেশনা তখন পর্যন্ত ছিল না। অতএব কোন প্রকার রাগ-বিরাগ ছাড়াই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রথমে নীরবতা পালন করেছিলেন। এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একমাসের নির্জনবাসের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজেকে আলাদা করে ফেললেন। অতঃপর আল্লাহর বাণী নাযিল এবং প্রতিশ্রুত একমাস অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি স্ত্রীদের

www.pathagar.com

ইখতিয়ার সংক্রান্ত আয়াত দু'টি শুনিয়ে তাঁদের সিদ্ধান্ত জানতে চাইলেন। অবতীর্ণ আয়াত দু'টিতে দাবি-দাওয়ার কারণে নবীর স্ত্রীদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন অসন্তোষ বা ভর্ৎসনা নেই। কিন্তু জানিয়ে দেয়া হলো, নবীর স্ত্রী তথা উম্মুল মুমিনীনের মর্যাদা লাভ করতে হলে, পার্থিব ভোগ-সামগ্রীর লালসা পরিত্যাগ করতে হবে; তাহলেই কেবল আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং আখিরাত অর্জন সম্ভব হবে। পক্ষান্তরে ভোগ-সামগ্রীর লালসা চরিতার্থ করতে চাইলে, তাঁরা উম্মুল মুমিনীন থাকতে পারবেন না; স্বেচ্ছায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাধারণ নারীর জীবন গ্রহণ করতে হবে। নাযিল হওয়া আয়াত দুটি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সিদ্ধান্ত প্রদান করে:

১. স্বামী-স্ত্রী উভয়ের অবস্থান এবং মর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যে কোন জিনিস স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর নিকট দাবি বৈধ।
২. দাবি অনুযায়ী স্ত্রীর চাহিদাপূরণে স্বামী অসম্মত বা অসমর্থ হলে যথাযথ পদ্ধতিতে তালাকের ক্ষমতা স্ত্রী নিজের উপর প্রয়োগ করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে।
৩. উম্মুল মুমিনীনগণের মর্যাদার এটাই দাবি যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র অনুকরণে অনাড়ম্বর জীবনযাপন করবেন। তাঁদের সাফল্যের এটি অন্যতম শর্ত।

উম্মুল মুমিনীনগণ কর্তৃক ভোগসামগ্রী দাবি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র নিকট যদি অপরাধ বা অবাধ্যতা বলে প্রতীয়মান হতো অথবা এ ধরনের দাবির মধ্যে যদি কোনপ্রকার অপরাধ বা অবাধ্যতার আশংকা থাকতো তাহলে তিনি নিশ্চয় প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থা হিসাবে অন্তত দাবি-দাওয়া পেশ না করার আহ্বান জানিয়ে তাঁদের যথাযথ জ্ঞান এবং উপদেশ দিতেন। কিন্তু তিনি নীরবতা পালন ব্যতীত আর কিছু করেছেন বলে কোন দলিল অনুপস্থিত। অতঃপর তাঁর (সাঃ) নির্জনবাসকালে ঘটনাসূত্রে আল্লাহতা'য়ালার পক্ষ থেকে বাণী অবতীর্ণ হলে জানা গেল সাধারণভাবে স্বামীর নিকট স্ত্রী কর্তৃক বিভিন্ন ভোগসামগ্রী দাবি সম্পূর্ণ বৈধ। তবে উম্মুল মুমিনীনদের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা ভিন্নতর; কারণ তাঁদের জীবন এবং তাঁদের মর্যাদা নবী(সাঃ)র দীন-হীন জীবন এবং মর্যাদার সাথেই সম্পৃক্ত।

এবার 'ইফক' অর্থাৎ মিথ্যা অপবাদের ঘটনাটি পর্যালোচনা করা যাক। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসার অব্যবহিত পর আয়েশা (রাঃ) অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। একই সাথে মদীনাজুড়ে তাঁর নামে মিথ্যা অপবাদ রটনা শুরু হয়ে

www.pathagar.com

যায়। আয়েশা (রাঃ) রটনা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকলেও সবকিছু রাসূলুল্লাহ(সাঃ)র কানে আসছিল। ফলে স্ত্রী অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও রটনার আকস্মিকতায় মর্মাহত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর সাথে বাক্যালাপ বন্ধ করে দিলেন। প্রতিদিন নিয়মমাফিক তাঁর কক্ষে এসে সালাম জানিয়ে নিষ্প্রাণ কণ্ঠে 'এ মহিলা কেমন আছেন?' জিজ্ঞেস করেই গৃহত্যাগ করতেন। একমাস পর আয়েশা (রাঃ) মিথ্যা অপবাদের বিষয়ে জানতে পারলেন। অত্যন্ত ভগ্নহৃদয়ে রটনার ব্যাপারে আরো তথ্যানুসন্ধানের লক্ষ্যে বাবা-মায়ের বাড়িতে গিয়ে থাকার প্রস্তাব করলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্মতি জানালেন।

'ইফক'এর ঘটনাটি কার্যত কোন ঘটনা নয়; এটি একটি সম্পূর্ণ মিথ্যা অপবাদ রটনা। একজন উম্মুল মুমিনীনের নামে একটি মিথ্যা অপবাদ রটনার ফলে একটি আশংকার উদ্ভব ঘটেছে কেবল। এটি নিতান্তই তাঁর অপাপবিদ্ধ চরিত্রের উপর কালিমা লেপনের ঘৃণ্য অপপ্রয়াস। যে অপবাদটি মদীনাজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে, তা আদৌ ঘটেছে কিনা এ আশংকায় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)সহ আয়েশা (রাঃ)র মা-বাবা এবং শুভানুধ্যায়ীরা শংকিত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। অসুস্থ আয়েশা (রাঃ) জানতেনও না যে তাঁর নামে মদীনাজুড়ে মিথ্যা অপবাদ ছড়িয়ে পড়ছে। অসুস্থতার মধ্যে শুধু ভগ্নহৃদয়ে হতাশার সাথে ভাবছিলেন তাঁর প্রিয় স্বামী, রাসূলুল্লাহ (সাঃ), তাঁর কাছে এসে বসছেন না, তাঁর সাথে কথা বলছেন না। একমাস পর কিঞ্চিৎ সুস্থ হয়ে মিসতাহ (রাঃ)র মায়ের কাছে যখন মিথ্যা অপবাদ রটনার কথা জানতে পারলেন, তখন তিনি আবারও অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং রটনা সম্পর্কে বিশদ জানার লক্ষ্যে নবী (সাঃ)র অনুমতি নিয়ে পিতৃগৃহে চলে গেলেন। একদিকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)সহ তাঁর নিকটজনেরা সবাই মিথ্যা অপবাদ রটনার ফলে রাগে-দুঃখে-ক্ষোভে হতবিহ্বল। অপরদিকে অন্য একদল মুনাফিক অমানুষ মদীনাজুড়ে একমুখ থেকে আরেক মুখে মিথ্যা অপবাদ ছড়িয়ে পৈশাচিক আনন্দ লাভ করছিল।

এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) গভীর অন্তর্জ্বালা বুকে নিয়ে প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানে রত ছিলেন। এ পর্যায়ে হাদীস থেকে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লাভ করি। প্রথমতঃ এ সময়টিতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র নিকট কোন অহী নাযিল হয় নি; দ্বিতীয়তঃ আয়েশা (রাঃ) পিতৃগৃহে চলে যাওয়ার পর তাঁকে তালাক দেয়ার কথাও নবী (সাঃ)র মনে এসেছিল। কিন্তু তিনি (সাঃ) আবেগের বশবর্তী হয়ে দ্রুততার সাথে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন না। অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে পরিবারের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন সাহাবীর সাথে আলোচনা করে

www.pathagar.com

আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে জানতে চাইলেন। সাহাবীবৃন্দের অনুকূল মতামতের ফলে তাঁর (সাঃ) চিত্ত আরো সুদৃঢ় হলো। মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে একদিন তিনি (সাঃ) জনসমক্ষে স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)র চারিত্রিক নিষ্কলুষতা ঘোষণা করলেন এবং অপবাদ রটনাকারী মুনাফিক-নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের অভিপ্রায় ঘোষণা করলেন। তাঁর (সাঃ) পক্ষ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের কাজে উপস্থিত সাহাবাবৃন্দের সহযোগিতাও কামনা করলেন। কিন্তু এতে গোত্রীয় সংঘাত সৃষ্টি হওয়ার নতুন আশংকা সৃষ্টি হলে তিনি প্রতিশোধ গ্রহণের বাসনা পরিত্যাগ করলেও অপবাদ রটনাকারীদের মুখ বন্ধ করার জন্য ঘোষণটাই যথেষ্ট ছিল।

এ পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে আমরা প্রশান্ত চিত্তে আয়েশা (রাঃ)র সান্নিধ্যে আসতে দেখি এবং তখন তাঁর মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। কারণ আয়েশা (রাঃ)র অপাপবিদ্ধ চরিত্রের বিষয়টি মদীনাবাসীর মধ্যে প্রচার এবং অপবাদ রটানাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের ঘোষণা দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি (সাঃ) আয়েশা (রাঃ)র সাথে সাক্ষাৎ করতে এসে দীর্ঘ প্রায় দু'মাসের মধ্যে প্রথমবারের মতো আসন গ্রহণ করলেন। পূর্বের শীতলতার স্থলে তাঁর কণ্ঠ এখন অনেক মমতাপূর্ণ। স্ত্রীকে সালাম জানালেন, তাশাহুদ পাঠ করলেন এবং তাঁর সম্পর্কে ইতোমধ্যে যা জেনেছেন তা জানালেন। একটি স্বর্গীয় শান্ত-স্নিগ্ধ পরিবেশ আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। এবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উপদেশ-নসিহতের সুরে প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)কে বললেন, বহুল প্রচারিত অপবাদে সত্যিই যদি আয়েশা (রাঃ)র কোন সংশ্লেষ না থাকে, তাহলে আল্লাহতা'য়ালা নিশ্চয় এ অপবাদ থেকে মুক্তির পথ বের করে দেবেন; কিন্তু যদি কোন সংশ্লেষ থেকে থাকে, তাহলে তিনি আয়েশা (রাঃ)কে পরম ক্ষমাশীল আল্লাহর কাছে তাওবাহ করে ক্ষমা প্রার্থনার পরামর্শ দিলেন। আয়েশা (রাঃ)র যে চোখ দিয়ে মাসের পর মাস অশ্রু গড়াচ্ছিল, সে চোখে হঠাৎ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা দিল। তিনি নবীজী (সাঃ)র কথার কোন জবাব না দিয়ে, আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য প্রকাশের প্রত্যাশায়, ইউসুফ (আঃ)র পিতা ইয়াকুব (আঃ)র মতো ধৈর্য ধারণের প্রতিজ্ঞা করলেন। আয়েশা (রাঃ)র দৃষ্টিতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, মুখে ক্ষুরধার যুক্তি আর ধৈর্যের অনমনীয় প্রতিজ্ঞা শুধু যে তাঁর পূত-পবিত্র অপাপবিদ্ধ চরিত্রকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করে তা নয়; এগুলি তাঁর ঈমানের অনতিক্রম্য উচ্চতা, তাকওয়া-তাওয়াক্কুলের দুর্লঙ্ঘ্য গভীরতারও পরিচায়ক বটে। উদ্ভূত আশংকা-সন্দেহ থেকে মুক্তির দৃশ্যতঃ আর কোন পথ খোলা

www.pathagar.com

থাকলো না। জটিল এ পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার অব্যবহিত পরেই অহী নাযিলের তেজস্বিতাহেতু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তীব্র শীতের মধ্যে ঘেমে একাকার হয়ে গেলেন। অতঃপর সূরা আন-নূরের ১১-২২ আয়াত নাযিল করে আল্লাহতা'য়ালা তাঁর প্রিয় রাসূলের দুঃসহ মর্মযাতনার মধ্যেও অপরিসীম ধৈর্য, আয়েশা (রাঃ)র ইস্পাত-দৃঢ় ঈমান ও তাওয়াক্কুলের পুরস্কার দিয়ে দিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র পারিবারিক জীবনে টানাপোড়েনের তিনটি ঘটনা আমরা কুরআনের সূত্রে উল্লেখ করেছি। প্রথমোল্লিখিত দুটি ঘটনার সাথে কোন প্রকার আশংকা জড়িত ছিল না। দুটি ঘটনাই দৃশ্যমান; পক্ষ-বিপক্ষ সবাই সুচিহ্নিত। দুটিতেই ঘটনার অব্যবহিত পর দিক-নির্দেশনা সম্বলিত কুরআনের বাণী নাযিল করে স্বয়ং আল্লাহতা'য়ালা ঘটনার শুভ সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। তৃতীয়টি কোন ঘটনা নয়; একটি মিথ্যা অপবাদ রটনা মাত্র। একদল মনের আনন্দে একমুখ থেকে আরেক মুখে রটনার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং তাঁর সকল সঙ্গী-সাথীরা রটনার সত্যাসত্য নিয়ে, গতি-প্রকৃতি নিয়ে, পরিণতির কথা ভেবে চরম আশংকার মধ্যে দিনাতিপাত করছিলেন। অথচ পূর্বোক্ত দুটি ঘটনার মতো এক্ষেত্রে আল্লাহতা'য়ালার পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোন বাণী নাযিল হয়নি। কুরআনের বাণী নাযিলে এই যে বিলম্ব, এটাতো অহেতুক নয়। আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূলের জীবনে কঠিনতম বিপর্যয় তৈরি করে বিশ্বমানবতাকে বিপর্যয় মোকাবিলার পাঠ গ্রহণের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসার সাথে সাথেই মদীনা জুড়ে অপবাদ ছড়িয়ে পড়ছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রতিদিন একবার অসুস্থ স্ত্রীকে সালাম জানিয়ে তাঁর কক্ষে প্রবেশ করেছেন। অপবাদ সম্পর্কিত একটি কথাও বলেন নি। নিষ্প্রাণ কণ্ঠে কুশল জিজ্ঞেস করে গৃহত্যাগ করেছেন। এভাবে একমাস অতিবাহিত হয়েছে। কী অপরিসীম ধৈর্য! রাসূলুল্লাহ(সাঃ)র মত এমন ধৈর্য হয়তো সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁর (সাঃ) জীবন থেকে ধৈর্যের এ পাঠতো আমাদের গ্রহণ করতেই হবে। এটিইতো বিশ্বাসীর জন্য সুন্নাত।

আয়েশা (রাঃ) পিতৃগৃহে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তালাকের বিষয় বিবেচনা করলেন। কিন্তু সেক্ষেত্রেও কী অলৌকিক স্থিরতা। পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের সাথে কথা বললেন। ফলস্বরূপ তিনি (সাঃ) আয়েশা (রাঃ)র অপাপবিদ্ধ চরিত্রের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে তালাকের ভাবনা মন থেকে ঝেড়ে

www.pathagar.com

ফেললেন। স্ত্রী-তালাকের ঘটনা মুসলিম বিশ্বে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তেই ঘটে চলেছে। সেগুলোতে নবী (সাঃ)র জীবনের এ পাঠ, এ সুন্নাত কি অনুসারিত হয়ে থাকে? যদি না হয়ে থাকে তাহলে প্রকৃত সুন্নাত থেকে মুসলিম বিশ্ব কতখানি বিচ্যুত তা সহজেই অনুমান করা যায়।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবার জনসমক্ষে আয়েশা (রাঃ)র অপাপবিদ্ধ চরিত্রের ঘোষণা দিলেন এবং অপবাদ রটনাকারীদের নেতা মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে উপস্থিত সাহাবাবৃন্দের সহযোগিতা কামনা করলেন। এক্ষেত্রেও তাঁর (সাঃ) যেই-ভাবা-সেই-কাজ জাতীয় কোন তাড়া নেই। প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছার কথা ঘোষণামাত্রই তিনি প্রতিশোধের কোন নির্দেশ দেন নি। বরং ধীরস্থিরভাবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং সংঘাত সৃষ্টির আশংকায় প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা পরিত্যাগ করেছেন। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে কুশলী হওয়ার এ পাঠ আমরা কি নবী (সাঃ)র জীবন থেকে আদৌ গ্রহণ করি?

পরম ধৈর্যসহকারে সকল তথ্য সংগ্রহ এবং সর্বপ্রকার অনুসন্ধানে দীর্ঘ সময় ব্যয় করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অপবাদের অসারতা সম্পর্কে প্রায়-নিশ্চিত হলেন। সবশেষে আশংকার অবশিষ্ট শিকড়টুকু উৎপাটনের লক্ষ্যে তিনি (সাঃ) আয়েশা (রাঃ)র সাথে সাক্ষাৎ করলেন। উদ্দেশ্য তাঁকে বুঝানো, উপদেশ-পরামর্শ দেয়া এবং নসিহত করা। উপদেশ-নসিহতের কৌশলটি কী অসাধারণ! তিনি (সাঃ) ঘরে প্রবেশ করলেন, স্ত্রীকে সালাম জানালেন, দীর্ঘদিন পর প্রথমবারের মতো উপবেশন করলেন এবং তাশাহুদ পাঠ করলেন। মিথ্যা অপবাদ যে অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেছে তার কোন প্রতিফলন নবী (সাঃ)র কথায়-কাজে নেই। স্ত্রীকে যে মর্যাদা ও সম্মান দিয়ে তিনি (সাঃ) প্রথমে ভূমিকা এবং পরে উপদেশ-নসিহতের মূল কথাগুলো বললেন, তা আজকের দিনেও অত্যন্ত বিরল। অতঃপর আল্লাহতা'য়ালা তাঁর প্রিয় রাসূলের কাছে অহী নাযিল করে আয়েশা (রাঃ)র চারিত্রিক বিশুদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত করে দিলেন।

আল্লাহতা'য়ালা তাঁর রাসূলের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে এ শিক্ষাই দিলেন, একটি জঘন্য মিথ্যা অপবাদ চারিদিকে রটনা করা হচ্ছে বলেই সেটিকে সত্য ধরে নিয়ে তাৎক্ষণিক কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ সঙ্গত নয়। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে যতখানি সামাজিক মর্যাদা উপভোগ করে, তার স্ত্রীও অনুরূপ মর্যাদার অধিকারী। কখনো কোন মিথ্যা অপবাদ রটে গেলে অথবা চারিত্রিক বিশুদ্ধতা

www.pathagar.com

নিয়ে কোন আশংকা সৃষ্টি হলে অধৈর্য হয়ে স্ত্রীকে প্রহারতো দূরের কথা, এ বিষয়ে কোন আলোচনা বা উপদেশ নসিহতও করা সঙ্গত হবে না। বরং ধৈর্য সহকারে রটনা বা উদ্ভূত আশংকার মূল এবং সূত্র অনুসন্ধান করে সত্যাসত্য নিশ্চিত করার চেষ্টা করতে হবে, যেমনটি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) করেছেন। রটিয়ে পড়া অপবাদ সত্য হোক বা মিথ্যা হোক, ধৈর্য সহকারে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। একটি আশংকা সৃষ্টি হয়েছে বলেই অবিমৃষ্যকারী কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ বৈধ নয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এভাবেই তাঁর নিজের জীবনে উদ্ভূত একটি আশংকার অপনোদন করেছিলেন। কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত এটিই মুসলিম উম্মাহর জন্য সুন্নাহ। পারস্পরিক সন্দেহ, ঘৃণা আর অবিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে দাম্পত্য সম্পর্ক টিকে থাকে না। দাম্পত্য সম্পর্কের ভিত্তি পারস্পরিক বিশ্বাস, আস্থা এবং ভালোবাসা, যেমনটি আল্লাহতা'য়ালা সূরা আর-রূমের ২১ আয়াতে বলেছেনঃ

এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শনঃ তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গী/সঙ্গিনীদের, যাতে তোমরা পরস্পরের কাছে শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। আর-রূমঃ ২১

www.pathagar.com

৬

'নুশূজ'এর চূড়ান্ত পরিণতি

কুরআনের আলোকে সূরা আন-নিসার ৩৪ আয়াতটির বিস্তারিত বিশ্লেষণ শেষে আশা করা যায় এটিকে এখন অনেক সহজবোধ্য প্রতীয়মান হবে।

পুরুষ নারীর ভরণপোষণকারী (তত্ত্বাবধায়ক, পরিচালক), কারণ আল্লাহ তাদের পরস্পরকে পরস্পরের উপর বিশেষ অনুগ্রহ (বৈশিষ্ট্য) প্রদান করেছেন এবং কারণ পুরুষ তার ধন সম্পদ ব্যয় করে। সুতরাং সৎকর্মপরায়ণ নারীরা আল্লাহ অনুগত হয় এবং আল্লাহর হিফাজাত অদৃশ্যের হিফাজাত করে। স্ত্রীদের মধ্যে যাদের 'নুশূজ'এর (এ শব্দটির এক শব্দে প্রকাশযোগ্য কোন প্রতিশব্দ নেই, এর অর্থ অদৃশ্যের হিফাজতে ব্যর্থতা, দাম্পত্য জীবনে আল্লাহর আনুগত্য না করা, আল্লাহর নির্দেশের বিরোধিতা করা বা বিবাহবহির্ভূত কোন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া বা অন্য পুরুষের সন্তান গর্ভে ধারণ করা) আশংকা কর, তাদের সদুপদেশ দাও (কথা দ্বারা বোঝাও, ওয়াজ নসিহত কর), (তাতে আশংকা দূরীভূত না হলে) অত:পর তাদের শয্যা বর্জন কর এবং (তাতেও যদি আশংকা দুরীভূত না হয়) তাদের (দৃষ্টান্তমূলক, সংশোধনমূলকভাবে এবং আত্মসম্মানবোধে আঘাত করার মতো করে) প্রহার কর। এতে যদি তারা (দাম্পত্য সম্পর্কে সংক্রান্ত আল্লাহর নির্দেশের ব্যাপারে) তোমাদের অনুসারী হয়ে যায়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোন পন্থা অন্বেষণ করো না, আল্লাহ মহান, শ্রেষ্ঠ।

আয়াতটিতে আল্লাহতা'য়ালা পুরুষের উপর স্ত্রীর ভরণপোষণ এবং অভিভাবকত্বের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। এ দায়িত্ব অর্পণের কারণ আল্লাহতা'য়ালা জানাচ্ছেন, পুরুষ ও নারীকে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পুরুষ নারীর জন্য তার ধন সম্পদ ব্যয় করে। অতঃপর সৎকর্মপরায়ণ নারীর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে এ বলে যে, তারা আল্লাহানুগত হয় এবং আল্লাহর হিফাজতে অদৃশ্যের হিফাজত করে। অর্থাৎ তারা সন্তানের

www.pathagar.com

পিতৃত্ব সংক্রান্ত অদৃশ্য ব্যাপারটিকে বিশ্বস্ততার সাথে হিফাজত করে। তারা তাদের স্বামী ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের ঔরসের সন্তান আপন গর্ভে ধারণ করেনা। কিন্তু দাম্পত্য জীবনে যদি এমন আশংকা দেখা দেয় যে, স্ত্রী 'নুশূজ' আচরণ করছে, অর্থাৎ বিবাহবহির্ভূত কোন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার আশংকা দেখা দিচ্ছে, তখনও আল্লাহতা'য়ালা পুরুষকে অধৈর্য হয়ে সীমালংঘন না করার নির্দেশ দিয়েছেন। বরং পরম ধৈর্যসহকারে পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য উদঘাটন এবং আশংকা দূরীকরণের পন্থা বাৎলে দিয়েছেন। প্রথম পর্যায়ে স্ত্রীর সাথে আলাপ-আলোচনা, বাক্য বিনিময়, ওয়াজ-নসিহত, ইত্যাদির মাধ্যমে সত্যানুসন্ধান এবং আশংকা দূরীকরণের প্রয়াস গ্রহণ করতে হবে। এতে আশংকা দূরীভূত না হলে দ্বিতীয় পর্যায়ে একই কক্ষের মধ্যে স্ত্রীর শয্যা পৃথক করে আশংকা দূরীকরণের প্রয়াস গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। এতেও আশংকা দূরীভূত না হলে মিসওয়াক দণ্ডের মতো ক্ষুদ্র দণ্ডের সাহায্যে স্ত্রীকে মৃদু আঘাত করে তার আত্ম-সম্মানে ঘা দিয়ে সত্য উদঘাটন ও আশংকা দূরীভূত করার চেষ্টা করতে বলা হয়েছে।

কিন্তু তৃতীয় এবং শেষ পদ্ধতি প্রয়োগ করলেই কি 'নুশূজ'এর সকল আশংকা দূর হয়ে যাবে? এমন নিশ্চয়তা দেয়া কখনোই সম্ভব নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে পদ্ধতি তিনটি প্রয়োগ করাকালীন যে কোন পর্যায়ে আশংকা দূর হয়ে গিয়ে স্বামী-স্ত্রী পরম সুখে দাম্পত্য জীবন যাপন করতে থাকবে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে সব কয়টি পদ্ধতিই ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। আর তাই আল্লাহতা'য়ালা বলছেন, *'এতে যদি তারা (দাম্পত্য সম্পর্কে সংক্রান্ত আল্লাহর নির্দেশের ব্যাপারে) তোমাদের অনুসারী হয়ে যায়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোন পন্থা অন্বেষণ করো না, আল্লাহ মহান, শ্রেষ্ঠ।'* অর্থাৎ তৃতীয় পদ্ধতি প্রয়োগের পরও যদি স্ত্রীর 'নুশূজ'এর আশংকা দূর না হয়, তাহলে কেবল অন্যকোন পন্থা অন্বেষণ করা যেতে পারে। লক্ষণীয় যে, সেই অন্য পথটি কি তা কিন্তু এ আয়াতে বিশদ বলা হয় নি।

'নুশূজ'এর আশংকা দূরীকরণে পর্যায়ক্রমিক সকল ব্যবস্থা গ্রহণ শেষেও কোন কোন ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান হয়তো সম্ভব হবে না। এ পর্যায়ে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ক নিম্নতম পর্যায়ে নেমে আসারই কথা। এ ধরনের পরিস্থিতিতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে। আর এ বিচ্ছেদ স্বামী বা স্ত্রীর যে কোন একজনই চাইতে পারে। 'নুশূজ' আচরণের এটিই চূড়ান্ত এবং অনিবার্য পরিণতি। স্ত্রীর সন্দেহজনক আচরণে বীতশ্রদ্ধ হয়ে বা 'নুশূজ'এর

www.pathagar.com

আশংকা দূরীকরণে ব্যর্থ হয়ে স্বামী স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিতেই পারে। আবার স্ত্রী সত্যিই অন্য কোন পুরুষের প্রতি আসক্তি-হেতু স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। অথবা মিথ্যা অপবাদের কারণে স্বামীর প্রতি ভালবাসা হারিয়ে স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কথা ভাবতে পারে।

'নুশূজ'এর চূড়ান্ত পরিণতির কথাই সূরা আন-নিসার পরবর্তী ৩৫ আয়াতে আল্লাহতা'য়ালা তুলে ধরেছেন:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّـهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশংকা করলে, তোমরা তার (স্বামীর) পরিবার থেকে একজন ও ওর (স্ত্রীর) পরিবার থেকে একজন সালিশ (হাকামান) নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ে (স্বামী-স্ত্রী) নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত।

'নুশূজ'এর আশংকা থেকে সৃষ্ট বিপর্যয়ের কারণে একটি দাম্পত্য সম্পর্ক ভাঙনের মুখোমুখি। এ দম্পতির মধ্যে এখন আর প্রেম-ভালবাসার লেশমাত্রও বর্তমান নেই। এরা এখন পরস্পরকে অবিশ্বাস, অনাস্থা ও ঘৃণা-বিদ্বেষের আগুনে দগ্ধ করছে। এমন পরিস্থিতিতেও আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা চান না, একটি পরিবার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ুক এবং কতগুলো জীবন বরবাদ হয়ে যাক।

অতএব আল্লাহতা'য়ালা বললেন, পরিস্থিতির এ পর্যায়ে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ের পরিবার থেকে একজন করে সালিশ নিয়োগ করা হোক, যাতে বিবদমান দম্পতির মধ্যে আপোষ-নিষ্পত্তির শেষ চেষ্টা করা যায়। মূল আরবীতে 'হাকামা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যার বাংলা সালিশ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সালিশ শব্দটি এ ক্ষেত্রে সঠিক অর্থ জ্ঞাপন করছে না। 'হাকামা' বলতে এমন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যিনি বিধিবদ্ধ বিচারক না হলেও প্রকৃত অবস্থা পর্যালোচনা করে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্কের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে সক্ষম।

www.pathagar.com

আন-নিসার ৩৫ আয়াতে আল্লাহতা'লা বলেছেন, 'তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে দেবেন।' এখানে 'তারা' বলতে সালিশদ্বয় নাকি স্বামী-স্ত্রীকে বুঝানো হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। অধিকাংশ ব্যাখ্যাকার মনে করেন যে, 'তারা' বলতে সালিশ এবং দম্পতি উভয়ের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে, তবে দম্পতিকে নির্দেশ করার সম্ভাবনাই অধিক। নিঃসন্দেহে 'তারা' বলতে আয়াতে দম্পতির প্রতিই নির্দেশ করা হয়েছে। কারণ, হাকাম বা সালিশদ্বয় যত দায়িত্বশীল এবং তীক্ষ্মধী হোন না কেন, দম্পতির যে কোন একজন যদি নিজেদের মধ্যে আপোষ-নিষ্পত্তি না চায়, তাহলে সালিশদ্বয়ের পক্ষে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সন্ধি স্থাপন করে দেয়া কখনো সম্ভব হবে না। অপরদিকে স্বামী-স্ত্রীর মনে যদি পরস্পরের প্রতি লেশমাত্র ভালবাসাও অবশিষ্ট থাকে, যদি কেবল আত্মাভিমান বা প্রবল আত্ম-সম্মানবোধের কারণে পরস্পরের দিকে এগিয়ে যেতে অক্ষম হয়ে পড়ে, তাহলে সালিশদ্বয়ের সামান্য মধ্যস্থতা এবং আল্লাহর অপার অনুগ্রহের ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দ্রুত আপোষ-নিষ্পত্তি হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে দম্পতির উভয়ে বা যে কোন একজন যদি আপোষ-নিষ্পত্তি না চায়, তাহলে তাদের মধ্যে সন্ধি-সম্মিলন কোনভাবেই ঘটবে না। বিচ্ছেদই হবে তাদের অনিবার্য পরিণতি এবং এটিই তাদের জন্য কল্যাণকর। কারণ, আল্লাহাতা'য়ালার অনুমোদিত পরিবারে ঘৃণা-বিদ্বেষ-হানাহানির বিষবাষ্প প্রবাহ মোটেই অভিপ্রেত নয়। অতএব যে দম্পতির মধ্যে ঘৃণা-বিদ্বেষ ছাড়া আদান-প্রদানের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তাদের একত্রিত থাকার চাইতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াই উত্তম। এটি 'নুশূজ'এর নিকৃষ্টতম এবং সর্বশেষ পরিণতি। সিদ্ধান্ত প্রদানে সক্ষম হাকামদ্বয় চূড়ান্ত পর্যায়ে অতএব এ নির্দেশই প্রদান করবেন।

সূরা আন-নিসার ৩৪ আয়াতে নারীর 'নুশূজ' বা বিবাহবহির্ভূত অবৈধ কোন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার আশংকা দূরীকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা বাৎলে দেয়া হয়েছে। অতঃপর পরবর্তী আয়াতে বিচ্ছেদের দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান দম্পতির মধ্যে আপোষ-মীমাংসা সৃষ্টির উপায় বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা দাবি করেছি, 'নুশূজ' শব্দটি স্ত্রীর সাধারণ কোন অবাধ্যতা বা আনুগত্যহীনতা অর্থে ব্যবহার করা হয় নি এবং প্রদত্ত ব্যবস্থাও কোন অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ প্রদান করা হয় নি। কারণ, প্রথমতঃ অপরাধ যত গুরুতরই হোকনা কেন, অপরাধের আশংকা সৃষ্টি হলেই শাস্তি প্রয়োগ করা যায় না। এমন বিধান আল্লাহর নিয়মের

www.pathagar.com

সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। দ্বিতীয়তঃ নারীর উপর 'অদৃশ্যের হিফাজত' অর্থাৎ সন্তানের পিতৃত্বের ব্যাপারে বিশ্বস্ত থাকার দায়িত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ দায়িত্বের ব্যাপারে একবার আশংকা সৃষ্টি হলে আশংকাকারীর একেবারে মূল ধরে নাড়া দেয়। তৃতীয়তঃ আন-নিসার পরবর্তী ৩৫ আয়াতে দম্পতির মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি জানানো হয়েছে। এ বিরোধ আর কিছু নয়, 'নুশূজ' তথা অবৈধ কোন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার আশংকা থেকে সৃষ্ট বিরোধ। আল্লাহু সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালাই তাঁর কালামের বাণীর প্রকৃত অর্থ সঠিক জ্ঞাত।

www.pathagar.com

৭

হাদীসের আলোকে আয়াতটির পর্যালোচনা

৭.১. *শানে-নুযূল হিসাবে বর্ণিত হাদীসের পর্যালোচনা*

সূরা আন-নিসার ৩৪ আয়াতের শানে-নুযূল অর্থাৎ আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ বা উপলক্ষ হিসাবে একটি ঘটনা বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে পেশ করা হয়। গ্রন্থভেদে ঘটনার বর্ণনায় যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও প্রতিটি বর্ণনার মূল বক্তব্য কিন্তু অভিন্ন। তাফসীরে মাআ'রেফুল কোরআনে উদ্ধৃত সবচেয়ে তথ্যবহুল বর্ণনাটি নিম্নরূপ:

"যায়েদ ইবনে যুবাইর (রাঃ) তাঁর কন্যা হাবীবাহকে (রাঃ) হযরত সা'দ ইবনে রাবীর (রাঃ) নিকট বিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের পরস্পরের মধ্যে কিছুটা বিরোধ দেখা দিলে স্বামী তাঁকে থাপ্পড় মেরে বসেন। তাতে হাবীবাহ তাঁর পিতার নিকট অভিযোগ করেন। পিতা যুবাইর কন্যাকে সাথে নিয়ে মহানবীর (সাঃ) খেদমতে উপস্থিত হন। তিনি নির্দেশ দেন যে, যতটা জোরে সা'দ ইবনে রাবী হাবীবাকে থাপ্পড় মেরেছেন, তাঁরও (হাবীবা) অধিকার রয়েছে তাঁকে (স্বামীকে) ততটা জোরে থাপ্পড় মারার। তাঁরা উভয়ে নবীর (সাঃ) হুকুম শুনে সেমতে প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। কিন্তু তখনই আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হল। এতে সর্বশেষ পর্যায়ে স্ত্রীকে মারধর করাও স্বামীর জন্য জায়েজ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে পুরুষদের বিরুদ্ধে কিসাস গ্রহণের কিংবা প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয় নি। যাহোক, আয়াত নাযিল হওয়ার পর মহানবী (সাঃ) তাঁদের উভয়কে ডেকে আল্লাহর হুকুম শুনিয়ে দিলেন এবং প্রতিশোধ গ্রহণের হুকুমটি নাকচ করে দিলেন।"[৪২]

অনুরূপ ঘটনাই কোন গ্রন্থে পেশ করা হয়েছে যে, একজন নারী স্বামী কর্তৃক প্রহৃতা হয়ে ভাই-এর সাথে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র নিকট আসলেন, আবার কোন গ্রন্থে বলা হয়েছে, স্বামী কর্তৃক প্রহৃতা হয়ে স্বামীর সাথে নবীর (সাঃ) নিকট ফরিয়াদ করতে আসলেন, ইত্যাদি।

www.pathagar.com

প্রায় অনুরূপ একটি হাদীস তাফসীরে ইবনে কাসীরে পেশ করা হয়েছে এভাবে, *"হযরত হাসান বসরী বলিয়াছেন, 'একদা জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ(সাঃ)র নিকট আসিয়া অভিযোগ করিল যে, তাহার স্বামী তাহাকে চপেটাঘাত করিয়াছে। হুযুর (সাঃ) ফরমাইলেন: আলকাসাস-- অর্থাৎ সে অনুরূপ প্রতিশোধ পাইবে। ইহাতে আল্লাহতা'য়ালা এই আয়াত (৪:৩৪) নাযিল করিলেন। ফলে মহিলাটি প্রতিশোধ ব্যতিরেকেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র দরবার হইতে প্রত্যাবর্তণ করিল।*

তাফসীরে ইবনে কাছীরে আরো উল্লেখ করা হয়, *"ইবনে জারীর ও ইবনে আবু হাতিম একাধিক সনদে উপরোক্ত হাদীস হাসান বসরী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। কাতাদা, ইবনে জারীর এবং আস্ সুদ্দীও উক্ত হাদীসের সনদসমূহে হাসান বসরীর কোন উর্ধ্বতন রাবীর নাম উল্লেখ করেন নাই (উল্লেখ্য যে, হাসান বসরী (র:) ছিলেন একজন তাবেয়ী, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র সাথে তাঁর সাক্ষাতই ঘটেনি)। ইবনে জারীর উহার সকল সনদ তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন।*

"ইবেন মারদুবিয়া হযরত হাসান বসরীর সনদ ভিন্ন অন্য এক সনদে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন -- হযরত আলী (রাঃ) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মাদ,..... ও আহমাদ ইবনে নাসাঈ আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন: 'একদা জনৈক আনসারী সাহাবী একটি স্ত্রীলোক লইয়া হুযুরের (সাঃ) দরবারে আগমন করতঃ বলিলেন - ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ)! এই স্ত্রীলোকটির স্বামী অমুকের পুত্র অমুক। সে ইহাকে মারিয়া ইহার মুখমণ্ডলে দাগ বসাইয়া দিয়াছে।' হুযুর (সাঃ) ফরমাইলেন 'এইরূপ করিবার অধিকার তাহার নাই।' ইহাতে আল্লাহতা'য়ালা এই আয়াত নাযিল করিলেন। অর্থাৎ আদব শিখাইবার ব্যাপারে পুরুষ নারীর নেতা। হুযুর (সাঃ) ফরমাইলেন, 'আমি চাহিয়াছিলাম এক জিনিস, আর আল্লাহতা'য়ালা চাহিয়াছেন অন্য জিনিস।' কাতাদা, ইবনে জারীর ও সুদ্দী উপরোক্ত হাদীস মুরসাল বা বিচ্ছিন্ন সনদের হাদীস হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।"[৪৩]

শানে-নুযূল হিসাবে কথিত ঘটনাটি যে কোন সচেতন ব্যক্তির মনে বিবিধ প্রশ্নের উদ্রেক করে, যেমন:

এক. একজন নারী, যিনি ফরিয়াদী, তাঁর পিতা অথবা ভাইকে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র নিকট আসলেন। অর্থাৎ পিতা অথবা ভাই ফরিয়াদীর

www.pathagar.com

নিকটাত্মীয় এবং অপ্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী। এ ধরনের সাক্ষী, ইসলামের দৃষ্টিতে দুর্বল সাক্ষী। ইসলামের নবী (সাঃ) এমন দুর্বল সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করে বিচারের ফায়সালা করবেন, তা কি আদৌ সম্ভব?

দুই. রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে যদি মানুষের মধ্যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক বলা হয়, তাহলে একটুও অত্যুক্তি করা হবে না। আমরা দেখি, কোন মামলার রায় ঘোষণার পর তিনি বলেন, উপস্থিত সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে মামলার রায় ঘোষণা মানে সত্যের পক্ষে নিশ্চিত রায় প্রদান নয়। বরং প্রকৃত সত্য রোজ কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ প্রকাশ করে দেবেন। আমরা এও দেখি, উপস্থিত সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একজন ইহুদীর বিপক্ষে মামলার রায় ঘোষণা করতে যাচ্ছিলেন, যা ছিল প্রকৃত সত্যের বিপরীত। কিন্তু মহান আল্লাহ কুরআনের আয়াত নাযিল করে (আন-নিসা:১০৫-১১৩) নবীজীর কাছে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করে দেন।[৪৪] কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে তিনি বিবাদীকে অর্থাৎ প্রহারকারী স্বামীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ না দিয়ে, ঘটনার পূর্বাপর বিশ্লেষণ না করে, কেবল বাদীর অভিযোগ এবং তার পক্ষের সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় দিয়ে দিলেন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারকের পক্ষে এমন বিচার কি কখনও সম্ভব?

তিন. স্বামী যত জোরে চড় মেরেছিলেন, স্ত্রীকে ঠিক তত জোরে চড় মারার নির্দেশ দান প্রমাণ করে, যেভাবেই হোক রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বুঝতে পেরেছিলেন যে, স্বামী বিনা অপরাধেই স্ত্রীকে প্রহার করেছিল। কিন্তু আয়াত নাযিলের পর নির্দেশ প্রত্যাহারের অর্থ দাঁড়ায় যে, অতঃপর স্বামীরা বিনা অপরাধে স্ত্রীদেরকে প্রহারের ক্ষমতা অর্জন করলো। কিন্তু এ কি সেই একই কুরআনের, একই ইসলামের শিক্ষা হতে পারে, যে ইসলাম এবং যে কুরআন স্ত্রীর প্রতি সদাচরণের (মা'রূফ) পৌনঃপুনিক তাগাদা দেয়; যে ইসলামে ন্যায়, ভালো ও সৎকর্মের (মারূফ) নির্দেশ দান এবং অন্যায়, মন্দ ও অসৎকর্মে (মুনকার) বাধা প্রদান উম্মাতের প্রত্যেকের জন্য ফরয সাব্যস্ত করা হয়েছে?

চার. আল্লাহর বাণী সূরা আন-নিসার ৩৪ আয়াতে আমরা দেখি, স্ত্রীর 'নুশূজ' আচরণের আশংকায় গৃহীতব্য পর্যায়ক্রমিক তিনটি ব্যবস্থার শেষটি হচ্ছে স্ত্রীকে মৃদু প্রহার। অথচ যে হাদীসটিকে ঐ আয়াতের শানে-নুযূল বলা হচ্ছে, সেটিতে আমরা দেখতে পাই, স্ত্রীকে বিনা কারণে বেধড়ক প্রহার করে মুখমণ্ডল ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলাও বৈধ। এমনকি সারা শরীরও যদি ক্ষতবিক্ষত করে ফেলা

www.pathagar.com

হয়, তাতেও কোন ক্ষতি নেই। এতে স্বামীর কোন অপরাধ হবে না এবং তাকে কোন শাস্তি দেয়া যাবে না। কারণ হাদীসটি থেকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী *'আদব-কায়দা শেখানোর ব্যাপারে পুরুষ নারীর নেতা'*। অর্থাৎ যে কোন নারীর তুলনায়, যে কোন পুরুষ সকল বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানী। কী আশ্চর্য! এসব সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে কতগুলো দুর্বল, মুরসাল হাদীসের ভিত্তিতে, যেগুলো আদৌ রাসূলুল্লাহ(সাঃ)র বাণী কিনা তা নিশ্চিত নয়।

পাঁচ. রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রদত্ত নির্দেশ প্রত্যাহার করে নিলেন। অর্থাৎ আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে স্ত্রীদের প্রতি যে কোন অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার অধিকার রহিত হয়ে গেল। এ ঘটনাসূত্রে প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা আবু বকর আল জাসসাস (র:) বলেন, "স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোন কিসাস হতে পারে না, যতক্ষণ হত্যাকাণ্ড পর্যায়ের ঘটনা না ঘটছে।"[৪৫] তিনি হয়তো ধরেই নিয়েছেন, সাধারণ শারীরিক দুর্বলতাহেতু স্ত্রীরাই স্বামী কর্তৃক প্রহৃত হবেন। কিন্তু কখনো শারীরিকভাবে শক্তিশালী স্ত্রী যদি স্বামীকে প্রহার করে বসেন, তাহলে সে ক্ষেত্রে কিসাস হবে কিনা, তা তিনি উল্লেখ করেন নি।

এ প্রসংগে মানুষ নয়, পশুর প্রতি আচরণ সম্বন্ধে দুটি হাদীস উল্লেখ করা যায়। (১) *আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 'এক স্ত্রীলোক একটি বিড়ালের কারণে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়। সে বিড়ালটিকে একাধারে বেঁধে রাখায় মারা গিয়েছিল, আর এ অপরাধে সে দোযখে গিয়েছিল। বেঁধে রাখা অবস্থায় সে বিড়ালটিকে খাদ্য-পানীয়ও দেয় নি, কিংবা পোকা-মাকড় খাওয়ার জন্য ছেড়েও দেয় নি।'* সহীহ আল-বুখারী[৪৬] ও সহীহ মুসলিম[৪৭]। (২) *আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: নবীর (সাঃ) সামনে দিয়ে একটি গাধা যাচ্ছিল। গাধাটির মুখে দাগানোর চিহ্ন ছিল। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি এটিকে দাগ দিয়েছে, তার প্রতি আল্লাহর লা'নত।'* সহীহ মুসলিম[৪৮]। এই যদি হয় পশুর প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি, তবে কি নারীরা, বিশেষ করে স্বামীদের স্ত্রীরা কি পশুর চাইতেও নিকৃষ্টতর কোন প্রাণী যে, তারা কোন কিসাস দাবি করতে পারবে না; তাদের প্রতি অত্যাচার-নির্যাতনের বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার দাবি করতে পারবে না?

ছয়. এ ঘটনা স্বামীর নিজের বিবেচনায় তার প্রতি অবাধ্যতার আশংকা, তথা স্ত্রীর যে কোন কল্পিত অপরাধের বিচারের দায়িত্ব স্বামীর উপরই ন্যস্ত করেছে।

www.pathagar.com

অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ স্বগৃহে এক একজন শাসক এবং বিচারক; প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ দ্বীনের সকল বিষয়ে, শরয়ী বিধি-বিধানে, ফিকাহ আর উসুল শাস্ত্রে এবং সংশ্লিষ্ট অপরাপর বিষয়ে এক একজন সুপণ্ডিত। আর তা যদি না হয়, তাহলে নারী প্রয়শঃই বিনা অপরাধে শাস্তি অথবা লঘুপাপে গুরুদণ্ড অথবা গুরুপাপে লঘুদণ্ড ভোগ করবে। কিন্তু তার অভিযোগ করার কোন সুযোগ থাকবে না। অথচ আল্লাহ বলেন, *"আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি। যাতে অল্লাহ যা জানিয়েছেন, তুমি তদনুযায়ী মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা কর"* আন- নিসা:১০৫। কিতাব এবং হিকমাতের বিস্তারিত এবং সম্পূর্ণ জ্ঞানার্জন ব্যতিরেকেই আল্লাহ নিশ্চয়ই সব পুরুষের হাতে বিচারের দণ্ড তুলে দিয়ে নিজের ইচ্ছামত স্ত্রীদের বিচার করতে বলেন নি তাঁর কিতাবে।

সাত. হাদীসটিকে সূরা আন-নিসার ৩৪ আয়াতের শানে-নুযূল বলে বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ আমাদের জানাচ্ছে। কিন্তু প্রহারের পূর্বে প্রহৃতা নারীটিকে স্বামী নসিহত করেছিলেন কিনা, অতঃপর দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসেবে স্বামী তাঁর শয্যা পৃথক করে দিয়েছিলেন কিনা, এতদসংক্রান্ত কোন তথ্য হাদীসটিতে নেই। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রহৃতা নারীটিকে এমন কোন প্রশ্ন করেছিলেন কিনা তা আমরা হাদীসটি থেকে জানতে পারছি না। অথচ হাদীসটি থেকে সিদ্ধান্ত দেয়া হচ্ছে, *'আদব-কায়দা শেখানোর ব্যাপারে পুরুষ নারীর নেতা', 'স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন কিসাস হতে পারে না।'* হাদীস থেকে প্রদত্ত এ সিদ্ধান্ত যদি যথার্থ হয়ে থাকে তাহলে কুরআনে আল্লাহতা'য়ালা প্রদত্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা দ্বিধায় পড়ে যাই (নাউযুবিল্লাহ)। কারণ 'নুশূজ' আচরণের আশংকায়, সূরা আন-নিসার ৩৪ আয়াতে প্রথমে স্ত্রীদেরকে ভুল আচরণ সম্পর্কে নসিহত করা এবং তাতে ফলোদয় না হলে শয্যা পৃথক করে দেয়ার দুটি পর্যায়ক্রমিক বিধান স্বয়ং আল্লাহতা'য়ালা দিয়েছেন। এ দু'টি বিধান অকার্যকর প্রমাণিত হলেই কেবল তৃতীয় অর্থাৎ চূড়ান্ত বিধান হিসেবে মৃদু প্রহারের অনুমিত দেয়া হয়েছে। তাছাড়া কুরআনের অন্যত্র নারীর সাথে আচরণের ব্যাপারে আল্লাহতা'য়ালা কঠোরতর নির্দেশ প্রদান করেছেন।

আট. এবার আমরা কুরআনের আলোকে সূরা আন-নিসার ৩৪ আয়াতের শান-নুযূল বলে কথিত হাদীসটি পর্যালোচনা করি। সূরা আন-নিসার ১৯ আয়াতে আল্লাহতা'য়ালা বলছেন, *"হে ঈমানদারগণ! নারীদের জবরদস্তি তোমাদের উত্তরাধিকার গণ্য করা বৈধ (হালাল) নয়; তোমরা তাদের যা দিয়েছ, তা থেকে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদের উৎপীড়ন করোনা। যদি না তারা প্রকাশ্য*

www.pathagar.com

অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়, তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন কর। তোমরা যদি তাদের ঘৃণা কর, তবে এমন হতে পারে যে আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন, তোমরা তাকেই ঘৃণা করছ।" আন-নিসা: ১৯। কুরআন আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে নারী অর্থাৎ স্ত্রীকে অকল্যাণ বা ঘৃণার পাত্র হিসেবে নয়, বরং কল্যাণের আধার হিসেবে বিবেচনা করতে; শুধু বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে নারীর স্বাধীন ব্যক্তিসত্তা বিলুপ্ত হয়ে যায় না এবং স্ত্রীর অর্জিত ধন-সম্পদের উপর স্বামীর কোন অধিকার বা মালিকানা সৃষ্টি হয় না।

আয়াতটি আমাদের জানাচ্ছে, সম্পদের প্রতি লোভ সৃষ্টিগতভাবে পুরুষের মজ্জাগত। সম্পদ আহরণের জন্য সে পরিশ্রমের পাশাপাশি নানান কৌশল অবলম্বন করতেও পিছপা হয় না। এমনকি তার অধীনস্থ, কিংবা উত্তরাধিকারীদের উপর নির্যাতন-উৎপীড়ন চালিয়ে তাদের সম্পদ হস্তগত করতে দ্বিধা বোধ করে না। কিন্তু স্ত্রীকে জোর করে নিজের উত্তরাধিকার বিবেচনা করার কোন অবকাশ আল্লাহতা'য়ালা এক্ষেত্রে রাখেন নি এবং স্ত্রীর ব্যক্তিগতভাবে অর্জিত, পৈতৃকসূত্রে কিংবা বিবাহসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ আত্মসাৎ না করার জন্য স্বামীর প্রতি কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছেন।

আয়াতটিতে সবশেষে প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হওয়ার প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত স্ত্রীর সাথে সৎ-সুন্দরভাবে জীবনযাপনের জন্য আল্লাহতা'য়ালা স্বামীকে কঠোর নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এখানেই স্ত্রীর সাথে আচরণের ব্যাপারে সুস্পষ্ট সীমারেখা চিহ্নিত করে দেয়া হচ্ছে। স্ত্রীর সাথে সৎ-সুন্দরভাবে জীবন-যাপন করতে হবে, এটাই আল্লাহর হুকুম। কেবল প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হওয়ার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেলেই স্ত্রীর সাথে সৎভাবে জীবন-যাপনের ব্যত্যয় ঘটতে পারে, তার পূর্বে নয়। সূরা আন-নিসার ১৯ আয়াতে এটাই যদি আল্লাহর নির্দেশনা হয়ে থাকে, তাহলে একই সূরার ৩৪ আয়াতে কী আল্লাহতা'য়ালা স্ত্রীদের বেধড়ক প্রহারের অনুমতি স্বামীদের দিতে পারেন? একটি মুরসাল হাদীসকে আন-নিসার ৩৪ আয়াতের শানে-নুযূল হিসাবে আখ্যা দিয়ে এ সিদ্ধান্ত নেয়া আদৌ কী যৌক্তিক যে, *'স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন কিসাস হতে পারেনা'; 'আদব-কায়দা শেখানোর ব্যাপারে পুরুষ নারীর নেতা'*? বাস্তবতা হচ্ছে এ ধরনের সিদ্ধান্ত আল্লাহর কালাম কুর'আনের মধ্যেই স্ববিরোধিতা আরোপ করবে, অথচ স্বয়ং আল্লাহতায়া'লা এ সূরা আন-নিসার ৮২ আয়াতে ঘোষণা করছেন, *'এ গ্রন্থ যদি আল্লাহ ব্যতীত আর কারো নিকট থেকে আসত, তবে এতে অনেক বৈপরীত্য পাওয়া যেত'*।

www.pathagar.com

লক্ষণীয়, হাদীসে উল্লিখিত একটি ঘটনাকে আন-নিসার ৩৪ আয়াতের শানে-ছুযূল অর্থাৎ আয়াত নাযিলের উপলক্ষ বলা হচ্ছে। অতঃপর ঘটনাটির উপর ভিত্তি করে অনেক শরয়ী সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। অথচ হাদীসটির বিশুদ্ধতাই সন্দেহাতীত নয়। সৌভাগ্যক্রমে তাফসীর ইবনে কাসীর সূত্রে আমরা জানতে পারি, প্রথমোক্ত হাদীসটির বর্ণনাকারী হাসান বসরী (রহঃ) একজন তাবেয়ী। অর্থাৎ কোন সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেননি। অপরদিকে দ্বিতীয় হাদীসটির ব্যাপারে স্বয়ং ইবেন কাছীরই বলছেন যে এটি মুরসাল অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন সনদের হাদীস, এটি বর্ণনাকারীদের ধারা পরম্পরা রক্ষা করা হয় নি। শানে-নুযূল হিসাবে কথিত এবং বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে গুরুত্ব সহকারে বর্ণিত হাদীসটির এই হচ্ছে গুণগত মর্যাদা। এটি কোনভাবেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পর্যন্ত পৌঁছায়নি। অথচ এটাই নাকি কুরআনের একটি আয়াতের শানে-নুযূল। একদিকে হাদীসটির ইতিহাস এটির দুর্বলতার সাক্ষ্য দিচ্ছে; অন্যদিকে কুরআনের মানদণ্ডে বিশ্লেষণ করা হলে অত্যন্ত বিব্রতকরভাবে হাদীসটির দুর্বলতার প্রমাণ মিলছে এবং একই সাথে কুরআনের বিভিন্ন বাণীর মধ্যে পারস্পরিক বৈপরীত্য সৃষ্টি করছে।

সূরা আন-নিসার ৩৪ আয়াতের প্রকৃতই যদি কোন শানে নুযূল থেকে থাকে, সেটি নিঃসন্দেহে উপরোল্লেখিত ঘটনাগুলির কোনটিই নয়। তাছাড়া যে ঘটনা অনেক বিব্রতকর প্রশ্নের জন্ম দিতে পারে, সেটি কুরআনের কোন বাণীর শানে নুযূল হওয়াটা অসম্ভব প্রায়। ঘটনাটির সত্যাসত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন না তুলে কেবল এটুকুই বলা যায় যে, এটি প্রকৃত এবং সম্পূর্ণ ঘটনা নয়। প্রকৃত এবং সম্পূর্ণ ঘটনা মহাকালের গর্ভে চাপা পড়ে আছে, যার বিশুদ্ধ এবং সম্পূর্ণ জ্ঞান শুধু আল্লাহতা'য়ালার নিকট সংরক্ষিত আছে।

৭.২. *একটি বহুল আলোচিত হাদীস*

বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে (মারেফুল কোরআন ও তাফহীমুল কুরআন) সূরা আন-নিসার ৩৪ আয়াতের ব্যাখ্যা স্বরূপ নিম্নোক্ত হাদীসটি পেশ করা হয়ে থাকে। বলা হয়, আয়াতের ব্যাখ্যা স্বরূপ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: তোমার সর্বোত্তম স্ত্রী সে-ই, যখন তাকে দেখবে তোমার মন পুলকে ভরে যাবে, তাকে যখন কোন কাজ করতে বলবে, সে তা মানবে; আর যখন তুমি ঘরে অনুপস্থিত থাকবে, তখন তোমার অবর্তমানে সে তোমার ধন-মালের ও নিজের সত্তার হিফাজত করবে।[৪৯]

www.pathagar.com

হাদীসটি নিঃসন্দেহে অতি সুন্দর। স্ত্রীকে দেখলে স্বামীর মন পুলকে ভরে উঠে যখন, তখন বুঝতেই হবে যে দম্পতিটির মধ্যে সুমধুর সম্পর্ক বিরাজমান। সেক্ষেত্রে স্ত্রী যে কেবল তৎক্ষণাৎ স্বামীর নির্দেশ পালনে তৎপর হবে তা নয়, স্বামীও স্ত্রীর নির্দেশ পালনে, স্ত্রীর মনোরঞ্জনে সদা তৎপর থাকবে। খোদ নবীজীর (সাঃ) জীবনেই এমন অনেক উদাহরণ আমরা দেখতে পাই। যে নারীর জীবন স্বামীর ভালবাসায় ভরপুর, সে নারী নিজের সতীত্ব কখনো স্বেচ্ছায় বিসর্জন দেবে, এমন ভাবাও তো অন্যায়। কিন্তু হাদীসটিতে আয়াতের সার্বিক বক্তব্যের ব্যাখ্যা দেখতে পাওয়া যায় না। স্বামীর অভিভাবকত্ব, স্ত্রীর তথাকথিত আনুগত্য, স্ত্রীর নুশূজ ইত্যাদির কোন ব্যাখ্যা বা সংজ্ঞা হাদীসটিতে নেই।

সুতরাং এ হাদীসটি আলাচ্য আয়াতের সার্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করে, এমন দাবি কোনমতেই করা যায় না। বিশেষতঃ যদি এমন কোন হাদীস বর্তমান থাকে, যেটি বর্তমান হাদীসের চাইতে আরো বেশি বিস্তারিত এবং আরো বেশি ব্যাখ্যা প্রদানে সহায়ক। বর্তমান হাদীসটি কখন, কোন্ পরিস্থিতিতে, কার উদ্দেশ্যে বর্ণিত হয়েছিল, ইত্যাদি কোন তথ্য জানার উপায় এখন নেই। হতে পারে, কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে, কোন বিশেষ ব্যক্তির নিকট আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যার জন্য এ হাদীসের বক্তব্যই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু সর্বকালের, সমস্ত লোকের জন্য এটা নিশ্চয় যথেষ্ট নয়।

৭.৩. *অভিভাবকত্বের ব্যাখ্যায় হাদীস*

একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে যৌথ উদ্যোগে যখন কোন কার্য সম্পাদিত হয়, তখন দলের মধ্য থেকে একজনকে নেতা বা ইমাম বানিয়ে নিতে হবে। ইসলামের এটাই নির্দেশ। মাত্র দুজন মিলে সালাত কায়েমের জন্য দাঁড়ালেও একজনকে ইমাম বানিয়ে নিতে হয়। এ ইমামত বা নেতৃত্ব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন নয় কোনমতেই। বরং সুশৃঙ্খলভাবে দায়িত্ব সম্পাদন এবং অশান্তি, গোলযোগ, বিদ্রোহ, ইত্যাদি পরিহারের লক্ষ্যে নেতৃত্ব প্রদানের গুণসম্পন্ন একজনকে নেতা করে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন রাখাল বা অভিভাবক এবং আপন অধীনস্থ লোকদের ব্যাপারে দায়ী। শাসক বা রাষ্ট্রপ্রধান একজন

www.pathagar.com

অভিভাবক। একজন ব্যক্তি তার পরিবারের লোকদের অভিভাবক (ও দায়িত্বশীল) এবং একজন নারী তার স্বামী-গৃহের অভিভাবক (রক্ষক) ও সে শিশুদের রক্ষক। এ ব্যাপারে তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং অধীনস্থ লোকদের ব্যাপারে তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে।' সহীহ আল-বুখারী।[৫০]

সূরা আন-নিসার ৩৪ আয়াতের প্রথম অংশের ব্যাখ্যায় এ হাদীসটিই যথেষ্ট। হাদীসটি থেকে আমরা জানতে পারি, শাসক বা রাষ্ট্রপ্রধান কেবল একজন অভিভাবক মাত্র। সকল গুণের আধার বা সকল বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ বলে একজন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপ্রধান মনোনীত করা হয় না। অর্থাৎ একজন রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিটি নিশ্চয় নন। বরং রাষ্ট্রের অভিভাবকত্ব করতে পারার নির্দিষ্ট কিছু গুণ-বৈশিষ্ট্যের কারণে একজনকে রাষ্ট্রপ্রধান বা শাসক মনোনীত করা হয়।

অনুরূপভাবে পুরুষকে পরিবারের অভিভাবকত্ব প্রদান করা হয়েছে নারীর তুলনায় পুরুষ শ্রেষ্ঠ বলে নয়। বরং বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পরিবারের ভরণপোষণের বিশেষ দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে বলেই পুরুষকে পরিবারের অভিভাবকত্ব দেয়া হয়েছে। লক্ষণীয় যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আপন আপন পরিমণ্ডলে সবাই অভিভাবক এবং সবাইকে দায়িত্বের ব্যাপারে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে।

একজন মানুষ নিজেকে কখনো অন্য একজন মানুষের চেয়ে শ্রেয়তর বলে দাবি করতে পারে না। আপাতঃদৃষ্টিতে সবচেয়ে ধনী বা সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিটিও দাবি করতে পারে না যে, সে দীন-হীন অক্ষম ব্যক্তিটির চেয়ে শ্রেয়তর। কারণ, দীন-হীন অক্ষম ব্যক্তিটির মধ্যে এমন এক বা একাধিক গুণ-বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে, যা বিত্তবান বা ক্ষমতাশালী লোকটির মধ্যে নেই। পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই তাকে পরিবারের ভরণপোষণ এবং অভিভাবকত্বের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, এমন ধারণা সর্বাংশেই ভ্রান্ত। এর মধ্যে ন্যূনতম সত্যও যদি থাকতো, তাহলে নারীর উপর কোন দায়িত্ব অর্পিত হতো না। অথচ উপরের হাদীসটি থেকে এবং বাস্তবতা থেকেও আমরা জানতে পারি যে, নারীরও নির্দিষ্ট একটি পরিমণ্ডল রয়েছে, তারও আছে কিছু গুণ-বৈশিষ্ট্য; অতএব তার উপরও আছে সুনির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব। আপন পরিমণ্ডলে সে একজন দায়িত্বশীল অভিভাবক।

www.pathagar.com

৭.৪. বিদায়-হজ্জের ভাষণের আলোকে নারী

এখন রাসূললুল্লাহ(সাঃ)র বিদায়-হজ্জের ভাষণ সম্বলিত একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ দেখা যাক:

আবু বকর ইবনে আবূ শায়বা ও ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম (রহ:) ..... জাফর ইবনে মুহাম্মাদ (রহ:) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমরা জাবির ইবনে আবদুল্লাহর (রাঃ) কাছে গেলাম। তিনি সকলের পরিচয় জানতে চাইলেন। আমি বললাম, 'আমি মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হুসায়ন। অতএব তিনি আমার দিকে হাত বাড়িয়ে আমার মাথার উপর হাত রাখলেন। তিনি আমার জামার উপর দিকের বোতাম খুললেন, তারপর নিচের বোতাম খুললেন। তারপর তিনি আমার বুকের মাঝে তার হাত রাখলেন। আমি তখন ছিলাম যুবক। তিনি বললেন, 'হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তোমাকে স্বাগত জানাই। তুমি যা জানতে চাও জিজ্ঞেস কর। ..... অতঃপর আমি বললাম, 'আপনি আমাদের রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র বিদায় হজ্জ সম্পর্কে অবহিত করুন।' জাবির (রাঃ) স্বহস্তে নয় সংখ্যার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, '..... তোমাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালেমার মাধ্যমে তাদের লজ্জাস্থান নিজেদের জন্য হালাল করেছ। তাদের উপর তোমাদের অধিকার এই যে, তারা যেন তোমাদের শয্যায় এমন কাউকে স্থান না দেয় যাকে তোমরা অপছন্দ কর। যদি তারা এরূপ করে, তবে তাদেরকে মৃদু প্রহার কর। আর তোমাদের উপর তাদের ন্যায়সঙ্গত ভরণ-পোষণ ও পোশাক-পরিচ্ছদের হক রয়েছে। .....' সহীহ মুসলিম[৫১]

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র বিদায়-হজ্জের ভাষণের উল্লিখিত অংশের সামান্য ভিন্ন একটি বর্ণনা লক্ষ্য করা যায় রিয়াদুস সালেহীন গ্রন্থে। তিরমিযী শরীফ সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি নিম্নে উদ্ধৃত হলো।

আমর ইবনে আহওয়াশ আল জোসামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবীর (সাঃ) কাছে শুনেছেন। নবী (সাঃ) বিদায়-হজ্জের খুৎবায় আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন। লোকদেরকে ওয়াজ নসিহত করলেন এবং বললেন, 'তোমরা মেয়েদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর। কেননা তারা তোমাদের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। তোমরা তাদের কাছে সুযোগ-সুবিধা লাভ করা ছাড়া অন্য কিছুর মালিক নও। কিন্তু হ্যাঁ, তারা যদি প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়; যদি তারা এরূপ করে,

www.pathagar.com

তবে তোমাদের বিছানা থেকে তাদের বিছানা পৃথক করে দাও এবং তাদেরকে মারধোর কর, কিন্তু কঠোরভাবে নয়। যদি তারা অনুগত হয়ে যায়, তবে তাদের জন্য বিকল্প পথ অনুসন্ধান করো না। সাবধান! তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার রয়েছে এবং তোমাদের উপরও তাদের অধিকার রয়েছে। তাদের উপর তোমাদের যে অধিকার তা হল: তারা তোমাদের অপছন্দনীয় ব্যক্তি দ্বারা তোমাদের বিছানা কলুষিত করবে না এবং তাদেরকে তোমাদের বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি দেবে না। তোমাদের উপর তাদের যে অধিকার রয়েছে, তা হল- তাদের খাওয়া-পরার ব্যাপারে ইহসান করবে, ভাল ব্যবহার করবে। তিরমিযী (হাসান সহীহ)[৫২]

হাদীস কখনো পড়েনি, এমন সব ব্যক্তিও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র বিদায়-হজ্জের ভাষণ পড়ে থাকেন। বিদায়-হজ্জের ভাষণের নারী বিষয়ক এ অংশটুকু বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়। তবে প্রায় সব বর্ণনাতেই মূল বক্তব্য অভিন্ন। লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, হাদীসটি সূরা আন-নিসার ১৯ এবং ৩৪ আয়াতের বক্তব্যসমূহের নির্ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করে। অথচ কোন কোন ব্যাখ্যাকার আন-নিসার ৩৪ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাদীসটি উল্লেখ করলেও এটিকে কিন্তু মোটেই যথাযথ গুরুত্ব সহকারে ব্যাখ্যা করা হয় না। এ হাদীস থেকে আমরা জানতে পাই (১) আল্লাহ্পাক পুরুষকে নারীর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছেন, অর্থাৎ নারীরা পুরুষের তত্ত্বাবধানে থাকে। কিন্তু তাই বলে পুরুষ নারীর মালিক অথবা প্রভু হয়ে যায় না (আন-নিসা: ৩৪), (২) নারীর সাথে সৎ-সুন্দরভাবে জীবন-যাপন করতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা প্রকাশ্য অশ্লীল আচরণে লিপ্ত হচ্ছে (আন-নিসা: ১৯), (৩) অশ্লীল আচরণে লিপ্ত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেলে (আশংকা দেখা দিলে) নারীর শয্যা পৃথক করে দিতে হবে, এবং সবশেষে তাকে মৃদু প্রহার করে সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে (আন-নিসা: ৩৪), (৪) নারীর কর্তব্য তথা আল্লাহর হিফাজতে অদৃশ্যের হিফাজতের ব্যাখ্যায় আমরা জানতে পাই, নারী অন্য কোন পুরুষ দ্বারা স্বামীর বিছানা কলুষিত করবে না এবং অপছন্দনীয় পুরুষদের স্বামীর বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি দেবে না (আন-নিসা: ৩৪), (৫) 'নুশূজ' আচরণের আশংকার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা অশ্লীল আচরণ দ্বারা করা হয়েছে এবং আন-নিসার ৩৪ আয়াতে 'নুশূজ' আচরণের আশংকায় সংশোধনের যে বিধান দেয়া হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নারীর অশ্লীল আচরণে সংশোধনের নিমিত্তে হুবহু সেই বিধানই ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ 'নুশূজ' আচরণের আশংকা আর অশ্লীল আচরণ সমার্থক।

www.pathagar.com

(৬) আনুগত্য বলতে এখানে স্পষ্টত: স্বামীর প্রতি সকল বিষয়ে সার্বিক আনুগত্য বুঝানো হয় নি। অশ্লীল কার্য থেকে বিরত থাকাকেই এক্ষেত্রে স্বামীর প্রতি আনুগত্য বুঝানো হয়েছে (আন-নিসা:৩৪)। হাদীসটি সূরা আন-নিসার ৩৪ আয়াতের তিনটি অংশকেই সার্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করে।

কুরআনে আল্লাহর বাণীর ব্যাখ্যার প্রধান মূলনীতি হচ্ছে, কুরআনের একটি বাণীকে সর্বপ্রথম কুরআনেরই অন্য বাণী দ্বারা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতে হবে। এতে করে আল্লাহর বাণীর নির্ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করা সম্ভব হবে। লক্ষণীয়, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিদায়-হজ্জের উল্লিখিত বাণীতে নারীর সাথে আচরণের ব্যাপারে বলতে গিয়ে সূরা আন-নিসার ১৯ আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন সূরা আন-নিসার ৩৪ আয়াতের সাহায্যে। অথচ কী দুর্ভাগ্যজনক, কোন তাফসীর গ্রন্থে সূরা আন-নিসার ১৯ আয়াত কিংবা ৩৪ আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র বিদায়-হজ্জের উপরোক্ত বাণীর কোন উল্লেখ দেখা যায় না।

শুধু তাই নয়, এ হাদীসটি কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে কোন বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে, কোন বিশেষ ব্যক্তির জন্য বর্ণিত নয়। এটি সর্বকালের, সকল মানুষের, সার্বিক এবং সার্বক্ষণিক কল্যাণের লক্ষ্যে নবীজী (সাঃ) প্রদত্ত বিদায়-হজ্জের সর্বশেষ ভাষণের অংশবিশেষ। বিদায়-হজ্জের ভাষণের নারী সম্পর্কিত এ অংশটি শুধু যে কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করে তা নয়, এটি নারী-পুরুষ সম্পর্কের একটি মজবুত ভিত্তিও রচনা করে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র কাছ থেকে নারী বিষয়ক অপরাপর যত হাদীস পাওয়া যায়, সেগুলিকে বিদায়-হজ্জের ভাষণের সর্বকালীনতা ও সার্বজনীনতার নিরিখে যাচাই করে দেখা অবশ্যই উচিত। এমনকি কখনও স্থান-কাল-পাত্র উত্তীর্ণ বিদায়-হজ্জের ভাষণের সাথে কোন হাদীসের বিরোধ, বৈপরীত্য বা অসংলগ্নতা দেখা গেলে সংশ্লিষ্ট হাদীসটিকে মানসুখ বা বাতিল ঘোষণা করা উচিত।

সূরা আন-নিসার ৩৪ আয়াতের কোন না কোন অংশের ব্যাখ্যা প্রদান করে, এমন আরও অনেক হাদীস পেশ করা সম্ভব। কিন্তু কোনটিই বিদায়-হজ্জের ভাষণের নারী বিষয়ক অংশটির মতো স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আন-নিসার ৩৪ আয়াতের ব্যাখ্যায় এ হাদীসের বক্তব্যকে গ্রহণ না করে, কতগুলি দুর্বল, মুরসাল এবং বিচ্ছিন্ন সনদের হাদীসকে অযৌক্তিকভাবে তুলে ধরা হয়।

www.pathagar.com

৮

শেষ কথা

আমরা গ্রন্থের শুরুতেই কুরআনের আলোকে বলেছি, ইসলাম মানুষের স্বভাব ধর্ম; প্রতিটি শিশু ইসলাম ধর্মেই জন্মগ্রহণ করে থাকে। অতঃপর তার পরিবেশ তার ধর্ম, তার স্বভাব সবকিছু পরিবর্তন করে দেয়; তাকে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান অথবা অন্য যে কোন ধর্মাবলম্বীতে পরিণত করে। এ সিদ্ধান্তটি কী নারী-পুরুষ সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য বলে আমরা বিবেচনা করতে পারি? যে নারীটি স্বয়ং নবীর (সাঃ) কাছে স্বামীর প্রহারের প্রতিবাদে অভিযোগ করতে গিয়ে জানতে পারলেন, স্বামীর প্রহারের কোন প্রতিশোধ নেই, তখন তিনি কী ইসলাম ধর্মকে মানুষের স্বভাব-ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করবেন? তিনি কী ইসলামকে মানবতার ধর্ম হিসাবে মেনে নেবেন? কারণে-অকারণে প্রহার করাটা স্বামীর স্বভাব এবং প্রহৃত হওয়া, নির্যাতিত হওয়া, লাঞ্ছিত হওয়া নারীর জন্মগত অধিকার হিসাবে তিনি কি মাথা পেতে নেবেন?

ইসলাম দাসকেও প্রহারের অনুমতি দেয় না। ইসলাম দাসকে প্রহারের কাফ্ফারা স্বরূপ দাসেরই মুক্তির নির্দেশ দেয়। ইসলাম একজন দাসকে দিনে সত্তরবার পর্যন্ত ক্ষমা করার নির্দেশ দেয়। একই ইসলাম পারিবারিক জীবন-যাপনে, সাংসারিক দায়-দায়িত্ব পালনে স্ত্রীর সার্বিক আনুগত্য অর্জনের জন্য স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে যথেচ্ছা প্রহারের অনুমতি দেবে, এটা কল্পনাই করা যায় না। এটা প্রায় নিশ্চিত বলা যায়, যে কোন দিনের, যে কোন মুহূর্তে, কোন না কোন নারী, বিশ্বের কোথাও না কোথাও স্বামী কর্তৃক প্রহৃত হচ্ছে। যে সব স্বামী স্ত্রীদের প্রহার করছে, তারা সবাই যে সূরা আন-নিসার ৩৪ আয়াতের প্রচলিত ব্যাখ্যার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, বা ইসলামের দোহাই দিয়েই প্রহার করছে, তা নিশ্চয় নয়। ব্যক্তি থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পর্যন্ত সকল পর্যায়ে সবল কর্তৃক দুর্বলের উপর আধিপত্য বিস্তারের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা সর্বত্রই স্পষ্ট। কিন্তু একজন অত্যন্ত খ্যাতিমান মুফাসসির যদি সূরা আন-নিসার ৩৪ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যতক্ষণ না হত্যাকাণ্ড পর্যায়ের কোন ঘটনা ঘটছে, ততক্ষণ

www.pathagar.com

পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন কিসস হতে পারে না, তাহলে স্ত্রী-নির্যাতনতো একটি বৈধ বিষয় বলে পরিগণিত হতেই পারে।

পক্ষান্তরে আবু বকর আল-জাসসাস প্রণীত 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) সূত্রে উদ্ধৃত করা হচ্ছে, 'ওয়াদরিবূহুন্না- শব্দটির ব্যাখ্যায় *ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, শয্যায় স্ত্রী যদি স্বামীর কথা শোনে, আনুগত্য করে, তাহলে স্ত্রীকে মারার কোন অধিকার স্বামীর নেই।*'[৫৩] ইবনে আব্বাস রাসূলুল্লাহর (সাঃ) ঘনিষ্ঠতম সাহাবীবৃন্দের অন্যতম এবং নবীজীর (সাঃ) চাচাত ভাই। ইসলামের প্রথম যুগের পবিত্র কুরআনের প্রধান ব্যাখ্যাকারগণের (মুফাসসির) মধ্যে ইবনে আব্বাসকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। এত উচ্চ মর্যাদার একজন সাহাবী আল্লাহর বাণীর ব্যাখ্যায় বলেন, শয্যায় আনুগত্য ছাড়া স্ত্রীর নিকট অন্য কোন আনুগত্যের দাবি করার অধিকার স্বামীর নেই। অন্য কোন আনুগত্য দাবি করে স্ত্রীর উপর কোন জোর-জবরদস্তি করা বা প্রহার করার অধিকারও স্বামীর নেই। অথচ আমরা দেখি, নারী যুগে যুগে শতকের পর শতক ধরে অন্যায়ভাবে জোর-যুলুম, নির্যাতন, অত্যাচারের শিকার হচ্ছে।

কিন্তু স্বামীদের এ অন্যায় নির্যাতনের-নিপীড়নের শিকার অসহায় দুর্বল নারীদের রক্ষার জন্য ইসলামের করণীয় কি কিছুই নেই? আপাতঃদৃষ্টিতে এ বিষয়ে কারো কোন মাথা ব্যথা আছে বলে মনে হয় না। দায়িত্বশীল সকল মহল এ ব্যাপারে বরাবরই সম্পূর্ণ নির্বিকার, নিস্পৃহ। যেন এই সমস্যার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই, অথবা যেন এটি তুচ্ছ নারীদের তুচ্ছতর একটি বিষয় মাত্র। এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা শুধু অকারণ কালক্ষেপণ বৈতো নয়।

কিন্তু আদতেই কি এটি তুচ্ছ নারীদের তুচ্ছতর সমস্যা? সমাজে এই স্ত্রী নির্যাতনের আর কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব কি নেই? প্রতিটি গৃহ, প্রতিটি পরিবার শুধু যে একটি সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্র তা নিশ্চয় নয়। প্রতিটি গৃহ এক একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, এক একটি প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র। এ প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে নবজাতক শিশু শুধু হাঁটতে বা কথা বলতে শেখে তা নয়, এখানে পিতা-মাতা-শিশু প্রত্যেকেই প্রতিনিয়ত নতুন নতুন জ্ঞান আহরণ করছে এবং কর্মক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করছে। এখানে একজন মুমিন পিতা নেয়, সুশাসক হওয়ার, ন্যায়পরায়ণতার, তত্ত্বাবধায়নের, মিতাচারিতার, মধ্যপন্থা এবং সর্বোপরি তাকওয়া অবলম্বনের প্রশিক্ষণ। কিন্তু যে পিতা মানুষকে প্রদত্ত আল্লাহর

www.pathagar.com

অনুগ্রহকে শ্রেষ্ঠত্ব বলে ভ্রম করে, সে নেয় নিরাপরাধকে শাস্তি প্রদানের, প্রভুত্বের, কর্তৃত্বপরায়ণতার, ক্ষমতালিপ্সার, অন্যের নেতৃত্ব না মানার, আলস্যপ্রিয়তার, কর্মবিমুখতার এবং সর্বোপরি আল্লাহদ্রোহী অহংকারী হওয়ার প্রশিক্ষণ।

শ্রেষ্ঠত্ববোধের অহংকারে নিমজ্জিত আজকের মুসলমানদের দিকে তাকালে এসব প্রশিক্ষণের কুফল সহজেই গোচরীভূত হবে। আজকের মুসলিম সমাজ পৃথিবীর সবচেয়ে বিশৃঙ্খল জাতিগুলির একটি। মুসলিম রাষ্ট্র নামে পরিচিত প্রায় প্রতিটি ভূখণ্ড অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, জুলুম, দুর্নীতি ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। এসবের অনেক উপাদান গবেষণার মাধ্যমে পণ্ডিতেরা প্রায়শঃই আবিষ্কার করে থাকেন। কিন্তু গৃহ নামক প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রটি এসবে কি পরিমাণ অবদান রাখে তা কখনই তাঁদের নজরে পড়েনা। কারণ তাঁদের কর্মক্ষেত্র স্বভাবতঃই গৃহের বাইরে, অতএব দৃষ্টিও তাঁদের গৃহের বাইরে বিশ্বমানবতার দিকে।

পুরুষ মাত্রই নারীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ, এ বোধটি আমাদের মধ্যে কতখানি সুদৃঢ় হয়ে বাসা বেঁধেছে, তা লক্ষ্য করা যাবে কুরআন বা হাদীসের যে কোন অনুবাদ গ্রন্থের পৃষ্ঠা উল্টালে। কুরআনের যে সকল বাণীতে নারী-পুরুষের কথোপকথন আছে, সেগুলির অনুবাদে দেখা যাবে, পুরুষ নারীটিকে 'তুমি' সম্বোধন করে কথা বলছে। আবার নারী যখন পুরুষকে সম্বোধন করে তখন 'আপনি' সম্বোধন করে কথা বলছে (দ্রষ্টব্যঃ সূরা আয-যারিয়াহ:২৮-৩০, আন-নমল:৪২-৪৪, আল-কাসাস:২৩-২৭, মারইয়াম:২৭-৩৩)। অনুরূপভাবে যে সব হাদীসে নারী-পুরুষের কথোপকথন আছে, সেগুলির বঙ্গানুবাদেও একই ব্যাপার লক্ষ্য করা যাবে। মনে হবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং তাঁর সমস্ত সাহাবী (রাঃ) নারীদেরকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করতেন এবং নারীরা তাঁদের 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন। এসব অনুবাদ থেকে একজন পাঠকের মনে হতে পারে হয়তো আরবী ভাষাতেও বুঝি বাংলার 'আপনি-তুমি-তুই'র মতো ভিন্ন ভিন্ন শব্দ রয়েছে। কুরআন-হাদীসের অনুবাদক পণ্ডিতেরা শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকাবোধে এমনই আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন যে, আরবী ভাষায় যে 'আপনি' এবং 'তুমি'র জন্য আলাদা কোন শব্দ নেই সেটি তাঁদের নজরেই পড়ে না। প্রসঙ্গক্রমে সহীহ বুখারীর নিম্নোক্ত হাদীসটি লক্ষণীয়ঃ

www.pathagar.com

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, 'আয়েশা! আমি আপনার রাগ ও আপনার সন্তুষ্টি (গাদাবাকি ওয়া রিদাকি) উভয়টা চিনতে পারি।' আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ)! তা কিভাবে চিনতে পারেন?' হুযুর (সাঃ) বললেন, 'যখন আপনি আমার উপর সন্তুষ্ট থাকেন, তখন বলেন, 'বালা! ওয়া রাব্বি মুহাম্মাদিন' - হ্যাঁ, মুহাম্মাদের (সাঃ) রব-এর শপথ!', আর যখন আপনি রেগে থাকেন, তখন বলেন, 'লা! ওয়া রাব্বি ইবরাহীমা', - 'না, ইবরাহীমের রব-এর কসম!' আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'জ্বী হ্যাঁ, আমি (রাগ হলে) কেবল আপনার নামটি (ইসমিকা) বাদ দেই।'[৫৪]

মূল আরবীতে নবী (সাঃ) উদ্ধৃত শব্দ 'গাদাবাকি' অর্থ 'তোমার বা আপনার রাগ'। এ বাক্যাংশটিতে আরবী 'কি' শব্দের অর্থ 'তোমার বা আপনার-স্ত্রীলিঙ্গ'। অনুরূপভাবে আয়েশা (রাঃ) উদ্ধৃত শব্দ 'ইসমিকা' অর্থ 'তোমার বা আপনার নাম'। বাক্যাংশটিতে 'কা' শব্দের অর্থ 'তোমার বা আপনার-পুংলিঙ্গ'। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন আয়েশাকে (রাঃ) সম্বোধন করেছেন, তখন 'কি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অপরদিকে আয়েশা (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে সম্বোধন করেছেন, তখন 'কা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এই 'কি' এবং 'কা'-এর পার্থক্য 'আপনি' বা 'তুমি'-র জন্য নয় বরং যথাক্রমে স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গের জন্য। আরবীতে কথোপকথনের সময় সবাই পরস্পরকে কার্যত 'আপনি' বলেই সম্বোধন করে থাকে। অথচ উল্লিখিত হাদীসটি পাঠে এমন মনে হতে পারে, নবী (সাঃ) আয়েশাকে (রাঃ) 'তুমি' বলে সম্বোধন করেছিলেন এবং আয়েশা (রাঃ) নবী (সাঃ)কে 'আপনি' বলে সম্বোধন করেছিলেন।

হাদীসটিতে আরো লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, আয়েশা (রাঃ) অবলীলাক্রমে স্বামীর নাম মুখে আনছেন। তিনি যখন নবীজীর (সাঃ) উপর সন্তুষ্ট থাকেন, তখনই স্বামীর নাম উচ্চারণ করেন, স্বামীর নাম ধরে সম্বোধন করেন। আর আল্লাহর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এটি উপভোগ করেন, আনন্দ পান। পক্ষান্তরে এতদঞ্চলের একজন শিক্ষিত নারীও স্বামীর নাম মুখে আনতে রীতিমতো কুণ্ঠা বোধ করে থাকেন। এটি কার্যত ভিন্ন আঞ্চলিক এবং ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রভাবের কারণেই হয়ে থাকে। অথচ আয়েশা (রাঃ) নির্দ্বিধায় স্বামীর নাম মুখে উচ্চারণ করতেন। আরব অঞ্চলের সংস্কৃতি এবং ইসলামের যুগপৎ প্রভাবে এখন থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে নারীরা নিজেদেরকে তাদের স্বামীদের তুলনায় মোটেই নিকৃষ্ট বা তুচ্ছ মনে করতেন না, উপরের হাদীসটিই তার প্রমাণ। এমনকি পুরুষদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠত্ববোধের কোন অহংকার ক্রিয়া করতো না। বরং উপরের হাদীসটি

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ(সাঃ)র মধুরতর দাম্পত্য সম্পর্কের একটি প্রতিচ্ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরে।

পক্ষান্তরে আমাদের মুসলিম দম্পতিদের মধ্যে ঠিক এর বিপরীত আদর্শ আমরা প্রতিষ্ঠা করে চলেছি। স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে সার্বক্ষণিক সেবাদাসীতে পরিণত করা, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক 'আপনি-তুমি' অথবা 'আপনি-তুই'এ পরিণত করা, স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে আদেশ-করিবা-মাত্র-পালন ইত্যাদিই তথাকথিত আনুগত্যের প্রতিষ্ঠিত আদর্শ। আমরা আমাদের নারীদের পরামর্শ দিয়ে থাকি যেন তারা কখনোই স্বামী বা শ্বশুরের নাম মুখে না আনেন। অথচ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র জীবনে আমরা এমন একটি ঘটনাও দেখি না যে, কোন উম্মুল মুমিনীন তথাকথিত আনুগত্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য উপরোক্ত আচরণগুলির কোনটি করছেন। বরং এর বিপরীত চিত্রই আমরা দেখতে পাই।

ইফ্‌ক্‌এর ঘটনার শেষ পর্যায়ে যখন আয়েশার (রাঃ) নির্দোষিতা প্রমাণ করে কুরআনের আয়াত নাযিল হলো (সূরা আন-নূর:১১-২৫), *তখন তাঁর মা তাঁকে বললেন, 'ওঠো, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র শুকরিয়া আদায় করো।' জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'আমি না রাসূলুল্লাহ(সাঃ)র শুকরিয়া আদায় করবো, না আপনারা দু'জনের (পিতা-মাতা); আমিতো আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আমার নির্দোষিতা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল করেছেন। আপনারাতো এই মিথ্যা অভিযোগকে অসত্য বলেও ঘোষণা দেন নি।'*[৫৫] এক্ষেত্রে আয়েশা (রাঃ) অবাধ্যতা করেছেন,' গুরুজনের মুখে মুখে তর্ক করেছেন, স্বামীর না-শোকর হয়েছেন, এমন কথা কোন তাফসীর-গ্রন্থে বলা হয় নি। কিন্তু অনুরূপ আচরণ বা এর চেয়ে অনেক তুচ্ছ আচরণও আজকের তথাকথিত আনুগত্যের মানদণ্ডে যে কোন নারীর ক্ষেত্রে রীতিমতো গুরু অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। আজকের দিনের যে কোন প্রহৃতা নারীর প্রহৃত হওয়ার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করলে এ সত্যটাই প্রকট হয়ে উঠবে। অপরদিকে স্বামীর ভালবাসায় বিশ্বাস হারিয়ে, অন্য পুরুষের মধ্যে ভালবাসা খোঁজা, অর্থাৎ অশ্লীলতার দিকে ঝুঁকে পড়া, তথা কুরআন পাক-এ বর্ণিত প্রকৃত 'নুশূজ' আচরণ করার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, স্বামীর অকারণ অত্যাচার-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে নারী অন্য পুরুষের সাথে অশ্লীল আচরণে লিপ্ত হয়ে 'নুশূয' আচরণ করছে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র পারিবারিক জীবনে টানাপোড়েনের যে তিনটি ঘটনাকে উপলক্ষ করে কুরআনের বাণী নাযিল হয়েছে, সেগুলো আমরা বিস্তারিত

www.pathagar.com

আলোচনা করেছি। তিনটি ঘটনাতেই নবীজী(সাঃ)র সুন্দরতম জীবনের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য দৃশ্যমান হয়। সেটি তাঁর শান্ত, স্নিগ্ধ, সৌম্য, মহিমান্বিত রূপ। মধু-সংক্রান্ত ঘটনায় যখন কয়েকজন স্ত্রী তাঁর (সাঃ) মুখে মাগাফিরের গন্ধের কথা বললেন, তখন সরলমনে তিনি সেটি বিশ্বাস করলেন এবং নিজের জন্য মধু নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। অতঃপর এ প্রসঙ্গে কুরআনের বাণী নাযিল হলে নবীজী (সাঃ)র মধ্যে আমরা বিরূপ কোন প্রতিক্রিয়া দেখিনি।

'ইখতিয়ার' এর আয়াত নাযিলের সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীস থেকে জানা যায়, স্ত্রীগণ কর্তৃক পার্থিব ভোগসামগ্রী দাবির এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঘোষণা দিয়ে একমাসের নির্জনবাসের লক্ষ্যে বাড়ির চিলেকোঠার একটি ঘরে অবস্থান নেন। এ প্রসঙ্গে অন্য একটি হাদীস থেকে জানা যায়, প্রথম পর্যায়ে স্ত্রীগণ তাঁর (সাঃ) চারপাশে অবস্থান নিয়ে দাবি পেশ করছিলেন এবং নবীজী (সাঃ) বরাবরই নীরব ছিলেন। তবে তাঁর মুখাবয়বে কিছুটা অসন্তোষ বা হতাশার ছাপ পরিলক্ষিত হচ্ছিল। কিন্তু তাঁকে (সাঃ) একটুও ক্ষুব্ধ বা রাগান্বিত হয়ে কোনকিছু বলতে দেখা যায় নি। এ ঘটনা প্রসঙ্গে 'ইখতিয়ার' এর বাণী নাযিল এটিই প্রতিষ্ঠিত করে যে, স্ত্রীগণ কর্তৃক যুক্তিসঙ্গতভাবে পার্থিব ভোগসামগ্রী দাবি সম্পূর্ণ বৈধ এবং স্বয়ং আল্লাহতা'য়ালাও এতে অসন্তুষ্ট হন নি, যেমনটি হয়েছিলেন মধুসংক্রান্ত ঘটনায়। তাছাড়া আল্লাহর আনুগত্য এবং আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য ফরয, এটি জানার পরও উম্মুল মুমিনীনগণ অসংগত কোন দাবি করবেন, এটি কল্পনাতেও স্থান দেয়া যায় না।

'ইফক' এর ঘটনার ফলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র সে কী নিদারুণ অন্তর্দহন, কী নিদারুণ মর্মযাতনা। দিন যায়, মাস যায়; কিন্তু উদ্ভূত সমস্যার কোন সমাধান হচ্ছে না। এতদসত্ত্বেও নবীজী (সাঃ) ধীর-স্থির, শান্ত-সৌম্য। প্রতিদিন একবার করে অসুস্থ স্ত্রীর কাছে যাচ্ছেন, কুশল জানতে চাইছেন; অন্তর্জ্বালার কোন প্রতিফলন নেই চেহারায়; নেই কোন ক্ষোভ-রাগের বহিঃপ্রকাশ। এমনকি তালাক দেয়ার বিষয় যখন বিবেচনা করলেন, তখনও তাঁকে (সাঃ) দেখা যায় নিরুত্তাপ, উত্তেজনা-রহিত। সবশেষে যখন আয়েশা (রাঃ)কে উপদেশ-নসিহত দানের লক্ষ্যে তাঁর পিতৃগৃহে গেলেন, তখনও তিনি (সাঃ) শান্ত, স্নিগ্ধ, সম্পূর্ণ উত্তেজনা-রহিত। উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ অতি কোমল, সুমধুর এবং ভালবাসাপূর্ণ। তাঁর (সাঃ) প্রতিটি আচরণ অনুকরণীয়, অনুসরণীয়।

www.pathagar.com

উল্লিখিত তিনটি ঘটনার প্রথমটিতে আল্লাহর পক্ষ থেকে বাণী নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হন। ফলে এক্ষেত্রে ঘটনা সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে হাদীসসূত্রে কিছু জানা যায় না। পরবর্তী দু'টি ঘটনা রাসূলুল্লাহ(সাঃ)র সম্মুখেই ঘটেছে। দুটি ঘটনাতেই তাঁর প্রতিক্রিয়া, গৃহীত ব্যবস্থা, কথা-কর্ম সবকিছুই হাদীসসূত্রে জানা যায়। দ্বিতীয় ঘটনার কারণে আল্লাহর নিকট থেকে নাযিল হওয়া বাণী থেকে জানা যায়, সাধারণ নারীদের ক্ষেত্রে স্বামীর সামর্থ্যের মধ্যে স্ত্রী কর্তৃক ভোগসামগ্রী দাবি বৈধ; তবে উম্মুল মুমিনীনদের ক্ষেত্রে তা বৈধ নয়। তাছাড়া স্ত্রীগণ কর্তৃক দাবি পেশের পর তিনি (সাঃ) নীরব থেকেছেন। কিন্তু তাঁদের বুঝিয়েছেন বা উপদেশ-নসিহত করেছেন এমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তাঁর (সাঃ) মুখাবয়বে ভাবাবেগের পরিলক্ষিত পরিবর্তন অসন্তোষহেতু হলে অনুমান করতে হয় যে, স্ত্রীদের দাবির অবৈধতা সম্পর্কে তিনি পূর্বাহ্নে তাঁদের উপদেশ-নসিহত করেছেন। কিন্তু নাযিল হওয়া আয়াতদ্বয় প্রতিষ্ঠিত করে যে, ভোগসামগ্রী দাবি এবং 'ইখতিয়ার' বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পূর্বাহ্নে কিছু জানতেন না। অতএব রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র মুখাবয়বে ভাবাবেগের যে পরিবর্তন তা স্ত্রীদের উপর অসন্তুষ্টির কারণে নয়, সেটি ছিল অন্য কোন কারণে।

'ইফক' এর ঘটনাটিকে তাঁর জীবনের কঠিনতম দুর্যোগ বললে অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু জীবনের এহেন দুরূহ পরিস্থিতিতেও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কখনো কোন উম্মুল মুমিনীনকে প্রহার করেছিলেন বা প্রহার করার সামান্যতম চিন্তাও মনে স্থান দিয়েছিলেন এমন কোন দলিল আমরা কুরআন বা হাদীসের কোথাও দেখতে পাই না। স্বয়ং নবীজী (সাঃ) তাঁর জীবনে কোনদিন কোন কারণে উম্মুল মুমিনীনদের প্রহার করার কোন নজির রেখে যান নি; বরং উম্মাহর কল্যাণের জন্য এর বিপরীত আদর্শ স্থাপন করে গেছেন।

আয়েশা (রাঃ)র পিতৃগৃহে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) স্ত্রীকে উপদেশ-নসিহত প্রদানের লক্ষ্যে সাক্ষাৎকালে প্রদর্শিত সৌজন্য সাড়ে চৌদ্দশত বছর পরেও অচিন্তনীয় মনে হয়। উপদেশ-নসিহতের যে ভাষা তিনি ব্যবহার করেছেন, সেখানে কোন রূঢ়তা নেই, আছে অনুপম কোমলতা। জবাবে আয়েশা (রাঃ) অনমনীয় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন প্রকার চাঞ্চল্য বা বিরূপতা প্রকাশ করলেন না। 'ইফক' সংক্রান্ত ভয়ংকর এ বিপর্যয়কালে তিনি কেবল স্ত্রীকে একটু উপদেশ-নসিহত করার পূর্বে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে

www.pathagar.com

একমাসের বেশি সময় ব্যয় করেছেন। স্ত্রীদের মর্যাদার উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করার অনুপম দৃষ্টান্ত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উম্মাহর জন্য রেখে গেছেন।

পারিবারিক টানাপোড়েনের ঘটনাগুলোর প্রতিটিতেই তিনি (সাঃ) তাঁদের উচ্চ মর্যাদায় ন্যূনতম আঘাত যেন না লাগে সেদিকে প্রখর দৃষ্টি দিয়েছেন। এটিই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র সুন্নাহ; উম্মাহর অনুসরণীয়, অনুকরণীয়। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র জীবনের এ মহান আদর্শটাই হওয়া উচিত প্রতিটি মুমিন-মুত্তাকী মুসলিমের জীবনের অন্যতম আদর্শ, তথা সুন্নাহ। একই সাথে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র মহান জীবনের অনুসরণে স্ত্রীকে প্রহার না করাটা সুন্নাতের অনুসরণ এবং স্ত্রীর প্রতি কঠোর অমানবিক আচরণ, স্ত্রী-প্রহার সুন্নাতের খেলাপ বলে বিবেচিত হওয়া উচিত।

মহানবী (সাঃ) বিদায়-হজ্জের ভাষণে অশ্লীলতার মতো জঘন্য অপরাধের জন্য প্রথমে শয্যা পৃথক এবং পরে মৃদু প্রহারের অনুমোদন দিয়েছেন, এবং আশংকা দূরীভূত হয়ে গেলে অন্য কোন পথ অনুসন্ধানের ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা উচ্চারণ করেছেন। পক্ষান্তরে সূরা আন-নিসার ৩৪ আয়াতে আল্লাহতা'য়ালা স্ত্রীর 'নুশূয' তথা স্বামী ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার আশংকায় স্ত্রীকে প্রথমে উত্তমরূপে বুঝানোর নির্দেশ দিয়েছেন; তাতে আশংকা দূরীভূত না হলে স্ত্রীর শয্যা পৃথক করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এতেও যদি আশংকা বিদূরিত না হয়, স্ত্রীকে মৃদু প্রহারের নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর নিজের জীবনে পারিবারিক বিপর্যয় মুকাবিলায় কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, তার বিস্তারিত বিবরণ আমাদের সামনে বিদ্যমান। এমন অবস্থায় আজকের দিনে একটি নারীও যদি অকারণে স্বামী কর্তৃক নির্যাতিত-প্রহৃত হয়, তাহলে এ আশংকা করা মোটেই অমূলক হবে না যে, ইসলামের সঠিক দাওয়াত এবং প্রকৃত স্বরূপ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার ব্যর্থতার জন্য, ইসলামের সার্বিক অবনতির জন্য, ঘরে ঘরে, দেশে দেশে, অন্যায়-অত্যাচার-অবিচার-জুলুম-নির্যাতন ছড়িয়ে দেয়ার দায় মাথায় নিয়ে, আমাদের একদল ইসলামী চিন্তাবিদ-পণ্ডিতদের আল্লাহর নিকট কঠোর জবাবদিহি করতে হবে।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ, International Institute of Islamic Thoughtএর চেয়ারম্যান, আবদুল হামিদ আবুসুলাইমানের[৫৬], MARITAL DISCORD: Recapturing Human Dignity Through the Higher Objectives of Islamic Law' শীর্ষক পুস্তিকার উল্লেখযোগ্য অংশ:

CHASTISEMENT

As we approach the issue of the "chastisement" of women and the injury, pain, and disgrace that this entails, we need to bear in mind that suffering, fear, and anxiety result in hate, isolation, and apathy. Meanwhile, love, respect, and trust result in charity, dedication, and enthusiasm. For a long time, the Ummah has been enduring severe suppression and humiliation, and a culture of despotism and patronage. In many societies, such tyranny is no longer a monopoly of the state police or security apparatus. In fact, these abuses have become a part of the common culture, and occur amongst different classes of society, in particular, between the "strong" and the "weak." The implications of this situation are important since it is contrary to the Islamic spirit of kinship and solidarity, which depicts the Muslims, as mentioned in the Sunnah traditions, as "one structure whose parts support one another"[4] and furthermoresets "the example of believers in their mutual sympathy and compassion as one body that collectively cares for any ailing organ until it recovers."[5] The Sunnah provides many examples of this and by doing so sets the foundations of such a united spirit:

- Each Muslim is a brother of his fellow Muslim and should not oppress, disdain or abandon him; it is sufficient evil for a Muslim to demean his brother [in faith]; a Muslim is his whole sanctuary, property and character.
- God does not bestow mercy on someone who does not show mercy to others.
- God but bestows mercy on His merciful servants.
- A believer can never be a slanderer, a blasphemer, or an obscene or vulgar person.

www.pathagar.com

- The most faithful among the believers are the ones with the best morals and the best of you are the best for their wives.

Bearing this in mind and more specifically in relation to wives, the Sunnah traditions report that the Messenger strongly rebuked a husband who beat his wife: "One of you continues to beat his wife as a slave and is not ashamed to keep cuddling her."[6] He also said, "so many women who come to Muhammad's family bemoan [the abuse by] their husbands, and those are not the best of you."[7] The Prophet himself set the highest example of kindness, compassion, dignity, and benevolence: "He never extended his hand to hurt a woman, or a servant or anyone else..."[8]

Thus in light o f these general premises, we should examine the issue of "chastisement" carefully, and its place in familial, marital, and paternal relations, so as to identify the real notion of what "chastisement" actually means, and the authentic Islamic familial organization that sustains the structure of the Muslim family, particularly in the contemporary world. Such a system needs to achieve a relationship based on "repose, affection and compassion"so as to create a strong and solid family that provides a safe, spiritual, emotional, and psychological environment where the Muslim child can grow up strong, honest, and competent, responsive to the challenges of time and space.

The issue of "chastisement" is therefore closely linked to the structures of the family and human relations and receives particular attention because it is mentioned in the Qur'an and because its historical and traditional interpretations were purported by most people to denote a physical act such as slapping, hitting, beating, striking, punching, etc. This would definitely produce a strong sense of pain and humiliation, regardless of the extent of the physical suffering itself. Furthermore, the instrument of the action was seen to vary; according to some fatwa, it could consist of a few strokes with a siwak (a light twig used to clean the teeth) to something similar, such as a "toothbrush" or "pencil" as interpreted by AbdAllah ibn Abbas in responding to an enquiry regarding the interpretation of the "mild chastisement," according to a narrative related by Ata ibn Abbas. Such a "chastisement" was therefore seen more in the way of a reproach or an expression of discontent and annoyance, rather than an expression of humiliation and pain. On the other hand, we find that some fatwa employed an extreme definition of "chastisement" as that which "must not exceed forty strokes," and, in addition, with "no retribution between the man and his wife..."[9]

www.pathagar.com

Let us now examine the Qur'anicverse referring to the issue of "chastisement" which reads as follows:

> *Men are the protectors and maintainers of women, [10] because God has given the one more than the other, and because of the sustenance they provide from their own means. And the righteous women are the truly devout ones, who guard the intimacy which God has [ordained to be] guarded. And as for those women whose ill-will you have reason to fear, caution them [first]; then leave them alone in bed; then chastise [idribuhunna] them; and if thereupon they pay you heed, do not seek to harm them. Behold, God is indeed Most High, Great! If you fear a rift between the two of them, appoint two arbiters: one from his family and another from hers; if they wish for peace, God will bring about their reconciliation: for God has full knowledge, and is [thoroughly] acquainted with all things. (4: 34-35)*

Firstly, to understand this verse correctly, it is necessary to place it in the general framework of family structure and relations in Islam, so as to grasp its true implications within the higher aims, objectives and purposes of the Revelation. Secondly the verse must be interpreted in the light of other related Qur'anic verses:

> *O mankind! Reverence your Guardian-Lord, Who created you from a single person, created [of a similar nature] his mate, and from the two of them scattered countless men and women; reverence God through Whom you demand [your mutual rights], and reverence the wombs [that bore and delivered you]: for God ever watches over you. (4: 1)*

> *And among His signs is that He created for you mates from among yourselves, that you may dwell in repose with them, and He has rendered affection and compassion between you: verily in that are signs for those who ponder. (30: 21)*

> *When you divorce women, and they fulfill the term of their iddah [waiting period] either take them back on equitable terms or release them on equitable terms; but do not take them back to injure them, or to take undue advantage; if anyone does that, he wrongs his own soul. Do not take God's signs as mockery, but solemnly celebrate God's bounties to you, and that He sent down to you the Book [of Revelation] and Wisdom [of the Messenger] for your instruction, and fear God, and know that God is All Knowledgeable and [thoroughly] acquainted with all things. (2:231)*

www.pathagar.com

O you who attain to faith! When you marry believing women, and then divorce them before you have touched them [in a due intercourse], they owe you no iddah that you have to count in respect of them; so give them a present, and release them in a dignified manner. (33:49)

The divorce is [permissible only] twice, after that the parties should either hold together on equitable terms or separate with dignity. It is unlawful for you [men] to take back any of your gifts [from your wives], save when both parties fear that they would be unable to maintain the limits ordained by God [for example, to treat each other fairly]. If you [judges] do indeed fear that they would be unable to maintain the limits ordained by God, there is no blame on either of them if she gives up something in return for her release. These are the limits ordained by God; so do not breach them. If any do breach the limits ordained by God, such persons wrong [themselves as well as others]. (2:229)

If we read the above verses in the light of the collective injunctions of the Shari'ahand the overall Prophetic ideals and traditions, we find that the real spirit of the marital relationship is shaped by the sentiments of "affection" and "compassion" and the obligations of "patronage," so that the governing factors in such a relationship are "affection, compassion, and benevolence."

We come thereby to realize the real reason for and meaning of "chastisement," its implied consequences of humiliation and pain, and the position of this issue in regards to marital relations in Islam, especially the ideal of a system designed to promote mutual respect and love between spouses and to solve their problems. The conclusions are highly significant considering the reality of social relations in contemporary Muslim societies, where sadly women are often exposed to mental and physical cruelty as well as oppression. Indeed the perpetrators of such practices attempt to find justifications in the misreading of certain antiquated fatwa granting the husband, as the head of the family, an extensive mandate in family matters. Such a perception of family relations ignores the established foundations of this institution that is, compassion, solidarity, cooperation, and integration. If we are to avoid women and the family being deemed to be the mere property of men, the meaning of such texts must not be misinterpreted, taken out of context, or exploited.

www.pathagar.com

Typical living conditions in the past restricted the capacity and role of women to the family spheres, burdened men with extra obligations, and delegated extra powers to them in managing their family matters, especially in the cities. Muscular capability was the major means of earning a living and keeping the family secure. However, housekeeping and family needs exhausted the woman's energy and time. It is likely that such restrictions would have limited women's sophistication, curtailed their interests, weakened their perception, isolated them from the world beyond their family realms, and imbued them with a particularly naïve mentality. Although society then did not question man's excessive authority in the family structure, the situation of today's world differs substantially in its means, capabilities, as well as opportunities. Today's educational, technological, cultural, and global perspectives offer women better productivity, the opportunity of economic independence, and an intellectual and technical capability that transcends the small sphere of the family matters of yesterday. Thus, the historical portrait of the family, with its structural limitations of the past, seems unable to exemplify the aspirations of the family members or to represent their roles and potentials today. In order to avoid tensions and conflicts in family relations and to re-establish the concepts and the values that enable each member of the family to pursue her/his prospective roles, whilst complementing the roles of other members, we have to re-examine our own perception of the family structure within the context of today's reality.

Whilst examining the issue of "chastisement" more deeply, I could see that the kernel of the debate, and a foreseeable inherent problem, lay in the interpretation of the Arabic root verb daraba (to chastise) in the Qur'an as to imply "suffering," "humiliation," and physical "pain," as a means to force the wife to acquiesce to her husband's will, or to coerce her into obedience and loyalty, regardless of the extent of the pain and suffering she may thus undergo. The underlying assumption governing this situation stipulates that the Muslim wife, as in certain religions and cultures, has no means of exit from the marriage, no matter what the circumstances, and can never obtain a dignified release, or an equitable divorce, without her husband's consent. Accordingly, the reasoning goes, she should be subjugated or compelled to tolerate her husband's acrimonious behavior and to comply with his dictates. If this were the case, chastisement as "suffering," "humiliation," and physical "pain,"

www.pathagar.com

would seem to be an effective means to resolve, or rather to subdue, marital problems!

However, we have established that the above representation does not subscribe to the principles of the Shari'ah which base the family structure on "affection" and "compassion," support its cohesion, and maintain its identity. Thus, family membership in Islam is by choice: coercion, repression or abuse is not tolerated, and each spouse has the right to leave the family and terminate the marital bond, especially when it becomes harmful. At least, separation is less detrimental to family members than a relationship based on hate, discord, and acrimony. In these circumstances, the Shari'ah grants the husband the right to seek Talaq (divorce) and grants the wife the right to seek khula (disengagement or release). In the latter case, the wife has the choice of being released from the marriage contract by agreeing to return the dowry that she received from her husband in the contract or part of it (as a limit), so that the husband's greed for her personal wealth or that of her family does not provide an excuse for abuse or result in the disintegration of the family.[11]

Hence, compulsion or physical "chastisement" can never be a means of maintaining the spirit of affection between spouses, or to promote intimacy and trust between them. Besides, the study of the steps put forward in the relevant Qur'anic verses (4:34-35) will reveal two routes to a remedy which aim to resolve marital problems and to seek reconciliation, especially when the wife shows a tendency to rebellion and unjust rejection of the marital bond.

The first step is to resolve disputes between spouses without the intervention or mediation of a third party. This step is to be initiated and pursued by the husband and should proceed through three stages: (1) to caution; (2) to refuse to share the marital bed; and (3) to eventually "chastise." Second, when such efforts fail to bring about peace and reconciliation, both spouses should seek arbiters from their respective families to help them heal the rift, to advise them, and to prescribe remedies for the various problems afflicting them, in accordance with the following verse:

> *If you fear a rift between the two of them, appoint two arbiters: one from his family and another from hers; if they wish for peace, God will bring about their reconciliation: for God has full knowledge, and is [thoroughly] acquainted with all things. (4:35)*

www.pathagar.com

All in all, the Qur'anic recommendations seek to effect reconciliation and to make peace between spouses, based on the right facts, using positive initiatives, and in an effective manner. So when the wife shows signs of disaffection and defiance, the Qur'an ordains the husband to counsel, plead and perhaps remonstrance with her. This will give him ample opportunity to communicate his concerns, to clarify differences, to explore possible solutions, to demonstrate his keen interest in maintaining their marriage on equitable terms, and eventually to make clear the potentially unpleasant outcome of divorce. Therefore, to resolve any marital discord, the initial effort emphasizes dialog, exchange, and advice during which time the wife must not fall into the trap of complacency feeling that issues can remain as they are because at the end of the day her sexual appeal and/or the husband's affection or desire for her will prevail. Thus communication and dialog are the first steps which shouldbe undertaken toward resolving any marital discord, rather than the wife resorting to her feminine appeal and the sexual needs of her husband. Yet, if she does not heed such counsel out of ignorance or arrogance, it is then deemed necessary for the husband to proceed further along this route, that is, to take a different action, rather than merely to counsel or remonstrance with her. At this point, he should "refuse to share the marital bed," which will confirm that she cannot count on his weakness, impatience, or desire for her. Taking note of his lack of interest in her, she will intuitively realize the gravity of the situation and the seriousness of the consequences. This will, in turn, offer her a window of opportunity to rethink the whole situation, to realize that she has reached a crossroads, and to work to help find a way out of the discord so as to re-establish the state of "affection" and "compassion" between both spouses. On the other hand, if the wife stubbornly maintains her position of rejection despite the above attempts at a remedy by the husband, then there should be no doubt that the marriage is in jeopardy, and the threat of disintegration looming on the horizon; as such both parties should realize the seriousness of the situation and take positive action immediately.

At this critical point, the inevitable question arises: what can be done to make spouses who have reached such a precarious stage appreciate the real danger to their marriage, namely the threat of divorce, and to stop the rift passing into the private realm of mediation or arbitration by a third party such as members of their respective families?

www.pathagar.com

It is at this critical juncture, that the next step to resolve the dispute, before seeking the intervention of arbiters, can be taken and that is to "chastise" (Arabic root verb: daraba) as in the above-cited verse (4:34). The cornerstone of my study and for me the heart of the matter lies in the interpretation of the verb daraba, particularly in the context of seeking reconciliation between estranged spouses, after the husband has attempted to restore peace and accord verbally, by cautioning the wife, and physically by refusing to share the marital bed, thereby expressing his displeasure."

Is darb here construed to mean to slap, to hit, to flog, to strike, or any other related manner of physical castigation (which inflicts suffering, pain, and disgrace) to force a woman to maintain marital ties against her own will? If this is true, what is the purpose of this subjugation? Does subjugation of women by means of pain and disgrace help to reinstate affection and fidelity, or succeed in protecting the family structure from collapse and disintegration? Can this measure subdue wives, who are well versed in their rights and force them to stay oppressed by abusive husbands, or condone such a hostile and violent relationship? Or will they resort to what they are entitled to in Islam, to exit by a dignified release (khula)? And if this is the case, can there be any room for repression or subjugation in the marital relationship, which is far more likely to undermine the family structure and to expedite its collapse?

THE VERB *DARABA*

If it can be shown that the verb daraba does not denote the infliction of physical or psychological pain, and that this Qur'anic idiom might be misunderstood by some husbands to justify their cruelty towards their wives, who are, in turn, obliged to endure such abuses owing to their concern for their children, or their social or financial insecurity, how, then, should this "idiom" be construed?[12]

This matter should be examined comprehensively and with true knowledge of its various dimensions and connotations without jumping to quick conclusions. The Qur'anicsteps that deal with the idiom daraba/darb are focused on how to reconcile spouses in a way that promotes affection, compassion, and intimacy, restoring the objective of marriage. These steps do not yet seek the last resort: the arbitration by referees from the spouses' families. Therefore, if the purpose and steps of the Qur'an do not allow any excuse for violence, injury or pain in resolving marital problems, what, then, is the true interpretation of this verb? Does

www.pathagar.com

it mean pain in the allegorical or metaphorical sense? For daraba is used as a transitive verb in the Qur'an, for example "God propounds [to you] the parable..." (16:75 and 76), and as an intransitive verb, for example "when you travel through the earth ..."(4:101), where an auxiliary preposition is added to the verb.

If we are to accept the interpretation of this verb as a few gentle light strokes or taps with a siwak or something similar, such as a "toothbrush" or a "pencil," as rendered by Ibn Abbas, then this meaning does not include punishment, injury, or pain. Rather, it implies a gentle physical expression of gravity, frustration, or disinterest in the wife by a husband who no longer shares the marital bed. Such an expression is the opposite of touching or cuddling which implies warmth and intimacy. This interpretation is reasonable since it does not entail any damage to human dignity and due respect between spouses who are virtually bound by marital ties, of nuptial association. The above perception does not associate "chastisement" with disgrace, injury or pain. In contrast, the view of some other jurists, as shown in their fatwa, does not necessarily follow this line of thinking, especially when they stipulate that darbshould "not exceed twenty or forty strokes," regardless of the extent and application of these strokes, that is, "whether they are applied to different parts of her body or not, injure organs or not, cause a bone fracture or not, and whether she will survive them or not!"[13]

However, in spite of the moderate interpretation of Ibn Abbas, it still provides a loophole for misunderstanding which has been manipulated in the past to justify abusive and violent conduct, and can still be exploited today to inflict pain on women under the auspices of the fatwa of gentle strokes. Therefore, both the perception and resolution should leave no chance of misreading the real concept of daraba and should allow no misconduct or abuse of that concept. Such precautions certainly fit the true purposes of the Shari'ah in establishing the family on the basis of affection, compassion, and dignity.

As a result, I have committed myself to reevaluating the whole question in terms of its methodological framework, (presented earlier in this study), regarding the eternity of the Revelation and the Message, the necessity to grasp the relevant Divine norms, the peculiarity of time and space, and the imperative of an objective and disciplined analysis of the matter under consideration. I have, therefore, endeavored to examine the different connotations of the verb daraba and its various derivations in

www.pathagar.com

the Qur'an, since it is a sound approach to use the Qur'an to interpret the Qur'an. The best exegesis of the Glorious Qur'an can be produced by the Revelation itself and fine-tuned by the higher objectives and intents (maqasid) of the Shari'ah.

The compilation of the various connotations of daraba and its derivatives in the Qur'an produces approximately seventeen distinct nuances as shown in the following verses:

God propounds [to you] the parable... (16:75,76,112; 66:11)

When [Jesus] the son of Mary is held up as an example, behold, your people raise a clamor thereat [in ridicule]! (43:57)

See what similes they strike for thee: but they have gone astray, and never can they find a way. (17:48)

Do not invent similitudes for God: for God knows, and you know not. (16:74)

When you travel through the earth ... (4:101)

Then We covered their ears, for a number of years, in the Cave, [so that they did not hear]. (18:11)

Shall We then take away the Revelation from you and repel [you], because you are a people transgressing beyond bounds? (43:5)

... they should draw their veils over their bosoms ... and that they should not strike their feet so as to draw attention to their hidden ornaments ... (24:31)

... Travel by night with My servants, and strike a dry [solid] path for them ... (20:77)

Then We told Moses: Strike the sea with your staff. So it divided and each separate part resembled the huge firm mass of a mountain. (26:63)

God does not disdain to use the similitude of things, lowest as well as highest ... (2:26)

And remember Moses prayed for water for his people; We said: "Strike the rock with your staff." Then there gushed forth from it twelve springs ... (2:60)

www.pathagar.com

... they were covered with humiliation and misery; they drew on themselves the wrath of God ... (2:61)

Disgrace covers them [like a tent] ... (3:112)

But how [will it be] when the angels take their souls at death, and smite their faces and their backs? (47:27)

... I will instill terror into the hearts of the unbelievers: you smite above their necks and smite all their finger-tips off them. (8:12)

And take in your hand a raceme [bunch][14] of soft leaves and stroke therewith: and break not your oath ... (38:44)

Therefore, when you encounter the unbelievers [in hostility] smite their necks; at length, when you have thoroughly subdued them, bind a bond firmly on them ... (47:4)

O you who attain to faith! When you go abroad in the cause of God, investigate carefully ... (4:94)

... So a wall shall be erected between them, with a gate therein. Within it will be mercy throughout, and outside it, all alongside, will be [wrath] and punishment! (57:13)

Then did he turn upon them [idols] striking them with the right hand. (37:93)

If we examine the above verses, we note that the root verb (idiom) daraba (transitive and intransitive) has several figurative or allegorical connotations. It can mean to isolate, to separate, to depart, to distance, to exclude, to move away, etc. When something is subjected to such action, that means it is to be extracted, distinguished, and presented as a clear example. The verb daraba:"

- in regard to the land denotes to travel or to depart
- in regard to the ear, it means to block it or prevent it from hearing
- in regard to the Qur'an, it means to neglect, ignore and to abandon it
- in regard to truth and falsehood it means to make either of them evident and to distinguish one from the other
- in regard to the veil it means the drawing of the head-covering over the bosoms
- in regard to seas or rivers it means to strike a path through the water pushing it aside
- in regard to erecting a wall it means to partition or separate

www.pathagar.com

- in regard to people it means to be overshadowed by ignominy
- in regard to the feet, necks, faces, backs, it means to cut, to slash, and to strike
- whereas, in the rest of the verses, it means to impel, to shock, to slap, or to damage

Thus, the general connotations of the root verb daraba in the "Qur'anic parlance mean to separate, to distance, to depart, to abandon, and so forth.[15]

SEPARATION AND SECLUSION

What, then, should be the appropriate interpretation of this verb daraba when it is applied to the resolution of marital problems and the restoration of love and harmony between estranged spouses?

> *... And as for those women whose ill-will you have reason to fear, caution them [first]; then leave them alone in bed; then chastise [idribuhunna] them; and if thereupon they pay you heed, do not seek to harm them. Behold, God is indeed Most High, Great! (4:34)*

Considering the context, the purpose of this verse is reconciliation in a dignified manner and without coercion or intimidation as each spouse has the ability and the right to dissolve the relationship.

Therefore, the meaning of darb cannot imply the infliction of injury, pain, or disgrace. The most straightforward interpretation is hence that of departure, separation or seclusion. This arrangement, where the estranged husband deserts his wife altogether for some time, helps to bring the situation to a possible resolution because it is the final step beyond cautioning her and refusing to share her bed. Now, whilst the husband is away, the wife has ample opportunity to rethink the whole situation, to ponder the eventual consequences, and to realize the inevitable outcome of rejection, namely, divorce. At this point she must carefully decide if she would prefer to be separated permanently from her husband or be returned to the marital state. It is the moment of truth and if she is the party in the wrong, she has the choice to see reason and win back her estranged husband before it is too late.

Therefore, darb in the context of improving a difficult marital relationship and restoring harmony should be construed as to "leave" the marital home, to "move away" or "separate" from the wife. This is the last resort which is to be taken before seeking the mediation of arbiters from the

www.pathagar.com

respective families of each spouse. If this attempt, in turn, does not manage to heal the rupture and restore peace, then both parties should face the eventual choice: "...the parties should either hold together on equitable terms or separate with dignity"(2:229)

"The above analysis of the verb daraba is consistent and in tune with the Prophetic tradition and actual practice of the Prophet, as attested in the narrative which related that the Prophet moved away from his wives when they rebelled after their demands for a better standard of living were denied. The Prophet retired to a place in the house known as al-mashrabah for a month and offered them the choice to accept the standard of living he could afford, and so to stay together, or to be released from the marriage contract and separate with dignity. This incident is addressed in the Qur'an:

> *O Prophet! Declare to your consorts: "if it be that you desire the worldly life and its dazzle, then come! I will provide for your delight and release you in a handsome manner. But if you seek God and His Messenger, and the Home of the hereafter, verily God has set up for the doers of good amongst you a great reward." (33:28-29)*

Throughout this experience, the Prophet never inflicted injury, pain or insult on any of them. Therefore, when the consorts of the Prophet realized the seriousness of the situation, sensed the wrath of their own families, and missed his relationship and intimacy, that was enough to inspire them to be content with the lifestyle that the Prophet offered.[16]

The Prophet spent one month in seclusion before advising their families of the matter and before giving them the choice of compliance or separation. Only then did they recognize their error, and, having found themselves on the threshold of divorce, returned to the dignity of acceptance. As a result, the interpretation of daraba in the actual practice of the Prophet was to seclude, to move away, and to distance himself from them. That is consistent, on the one hand, with the psychological nature of the matter, and on the other, with the common understanding of the various Qur'anic usages of the root verb daraba and its abstractions, derivatives, and figuratives. Also, this perception does not contradict the exegesis of Ibn Abbas because he cautions husbands that their expression of anger should not exceed a few light touches with a siwak, or the like. Evidently, this very gentle expression would probably be adequate to express the husband's discontent. Yet, it is not clear how such light touches, as interpreted by Ibn Abbas, in this latter stage of

www.pathagar.com

marital discord, would be sufficient to convey the true gravity of the deadlock and its consequences, without going a decisive step further by refusing to share the marital bed, in order to reach reconciliation or seek separation!"

CONCLUSION

IN CONCLUSION, according to the Qur'anic recommendations to restore the marital relationship after the eruption of ill-will and conflict, I have proposed that the true reading of the Qur'anic idiom daraba directs the husband to "move away" from the wife, to "distance" himself from the wife and to "depart" from the marital home as a last attempt to restore her to reason and help her realize the gravity of recalcitrance and its potential consequences for her and their children. The connotations of departure and seclusion are more readily acceptable and more compatible with the Qur'anic parlance than the association of physical injury, psychological pain, and disgrace. The latter does not result in a dignified marital relationship, or promote human dignity, nor does it create "affection" and "compassion," which are the foundations of a lasting marriage, especially in the light of the values, prospects, and views of the present era. The analysis outlined in this paper is well supported by the actual practice of the Prophet. It is an effective emotional remedy that accomplishes the purposes and objectives of Islam in establishing the family structure on a basis of affection, and compassion, and maintains the family as a wholesome environment that nourishes the children spiritually, morally, emotionally, and intellectually.

Obviously, many of our Ummah's present notions are inadequate and erroneous. This is caused by a history of conflicts between its factions as well as the influence of some non-Islamic cultures and philosophies which cloud the Ummah's present vision. Moreover, the understanding of Revelation and its objectives and application as they relate to everyday life is affected by prevailing human knowledge in accordance with the time and place in which it is set. It is necessary, therefore, for the scholars of our time to pursue wisely and relentlessly their critical investigation of such issues liberating the Ummah'snotions and realizing the Shari'ah's intents. Finally, the conclusions that I have drawn in this paper and also in others dealing with similar issues are within the framework of ijtihad using a holistic approach to Islamic law. I hope that such will always be the attitude and approach of students and scholars of Islam.

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র

১. *মুসলিম শরীফ*, ৮ম খণ্ড; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ; জুন, ১৯৯৪; হাদীস: ৬৫১৪; পৃ: ১৭৬।

২. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রথম খণ্ড; মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়; ডিসেম্বর ১৯৮৮; কিতাবুল জানায়েয, হাদীস নম্বর: ১২৬৯; পৃ: ৫৫২।

৩. Web address of Articlet : Violence Against Women Prevalence Datat Surveys by Country, Compiled UN Women as of March 2011.
httpt//www.endvawnow.org/uploads/browser/files/vaw_prevalence_matrix_15april_2011.pdf

৪. Web address of Articlet the Facts: Violence Against Women & Millennium Development Goals, published by UNIFEM (United Nations Fund for Development of Women), in 2010, httpt//www.endvawnow.org/uploads/browser/files/EVAW_Fact Sheet_KM_2010EN.pdf

৫. httpt//en.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Savile#television; httpt//www.bbc.co.uk/news/uk-20981611

৬. Web address of Articlet Violence against Woment Facts and Figures, 2010 (?), published by UN Women (United Nation's Gender Equality and the Empowerment of Women), httpt//saynotoviolence.org/sites/default/files/Say_NO_VAW_Factsheet.pdf

৭. Odhikar Report: Annual Human Rights Report 2012 Eng; httpt//odhikar.org/wp-content/uploads/2013/01/report-Annual-Human-Rights-Report-2012-eng.pdf

৮. Violence Against Women Survey 2011; Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics and Informatics Division, Ministry of Planning, Government of People's Republic of Bangladesh.

৯. Raped before they reach 14; Zyma Islam, *Daily Star;* 29 December 2013; httpt//www.thedailystar.net/business/raped-before-they-reach-14-8423?archive=2013-12-29

১০. India's Code of Silence Over Sexual Abuse, by Rupa Jha, BBC News, New Delhi, 14 September 2013, httpt/ /www.bbc.co.uk/ news/ magazine-24081841

www.pathagar.com

১১. *সহীহ মুসলিম শরীফ*, ষষ্ঠ খণ্ড; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ; ডিসেম্বর ১৯৯৪; হুদূদ অধ্যায়' হাদীসঃ ৪৩১৪, পৃঃ ১৫১।

১২. *সহীহ আল-বুখারী*, ষষ্ঠ খণ্ড; মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়; জুন ১৯৯১; হাদীস ৬৮৯৯; পৃঃ ৪৭৪।

১৩. *তাফসীরে ইবনে কাছীর*, ৩য় খণ্ড; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ; সেপ্টেম্বর ১৯৯১; পৃঃ ৪৭।

১৪. মোহাম্মদ আকরম খাঁ; *তাফছীরুল কোরআন*; ১ম খণ্ড; প্রথম সংস্করণ; মোহাম্মদ বাদরুল আনাম খাঁ ও মোহাম্মদ কামরুল আনাম খাঁ; ঢাকা ১৩৭৮ হিঃ; পৃঃ ৬৮৫।

১৫. *তাফহীমুল কুরআন*; ২য় খণ্ড; পৃঃ ১৩৩।

১৬. *The Holy Quran*; Abdullah Yususf Ali; Kutab Khana. Ishaat-ul-Islam (Regd); 5th Edition; Delhi 1979; P 190.

১৭. *তফসীরে আশরাফি, 'বয়ানুল কোরআন'*– হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী; প্রথম খণ্ড; এমদাদিয়া লাইব্রেরি, চকবাজার, ঢাকা-১১; ডিসেম্বর, ১৯৭৭; পঞ্চম পারা, পৃঃ ১৬-১৭।

১৮. *মা'রেফুল কুরআন*; হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী; ২য় খণ্ড; ২য় সংস্করণ; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ; ঢাকা ১৯৮৩; পৃঃ ৪৪৩।

১৯. *The Noble Qur'an*; মুহাম্মাদ তকী উদ-দ্বীন আল হিলালী ও মুহাম্মাদ মুহসীন খান; কিং ফাহ্‌দ কমপ্লেক্স, মদীনা; পৃঃ ১১৩।

২০. *The Vocabulary of the Holy Quran*; Arabic to English; Compiled byt Dr. Abdullah Abbas Al-Nadwi; Dar Al-Shorouq; 1983 CE, ১৪০৩ ঐ; পৃঃ ৫৪৭।

২১. *আহকামুল কুরআন*, হযরত আবু বকর আহমদ ইবনে আলী আর-রাযী আল জাসসাস আল হানাফী; ২য় খণ্ড; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ; ঢাকা ১৯৮৮; পৃঃ ৭০৬।

২২. *তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন*; মূলঃ সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ (অনুবাদঃ হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমদ), চতুর্থ খণ্ড; খাদীজা আখতার রেজায়ী; আল-কোরআন একাডেমি, লন্ডন; জানুয়ারি, ২০০৬; পৃঃ ৯৯।

২৩. *কুরআনুল করীম*, প্রথম খণ্ড; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ; পঞ্চম মুদ্রণ; মে ১৯৭৯; পৃঃ ৬৮।

২৪. *সহীহ আল-বুখারী*, তৃতীয় খণ্ড; মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়; এপ্রিল ১৯৮২; কিতাবুল আম্বিয়া, হাদীসঃ ৩১২২-৩২৩০ (মোট ১৬টি হাদীস); পৃঃ ৩৫০-৪১৯।

২৫. *সহীহ আল-বুখারী*, তৃতীয় খণ্ড; মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়; এপ্রিল ১৯৮২; কিতাবুল আম্বিয়া, হাদীস নম্বরঃ ৩১৬৩; পৃঃ ৩৭৮।

২৬. *কুরআনুল করীম*, প্রথম খণ্ড; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ; পঞ্চম মুদ্রণ; মে ১৯৭৯; পৃঃ ১৪৫।

২৭. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রথম খণ্ড; মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়; কিতাবুল ইমান, হাদীস ১১৫; পৃঃ ৯২।

www.pathagar.com

২৮. *রিয়াদুস সালেহীন*, ২য় খণ্ড; বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার; জুন ১৮৮৬; হাদীস ৬৬৬; পৃঃ ১৫৪ ।

২৯. *আবু দাউদ শরীফ*, তৃতীয় খণ্ড; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ; সেপ্টেম্বর, ১৯৯২; হাদীস ২৭০০ ও ২৭০১; পৃঃ ৪৭১ ।

৩০. *সহীহ আল-বুখারী*; মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়; নভেম্বর ১৯৯০; ২য় খণ্ড; পৃঃ ৪৫; হাদীসঃ ১৩৭২ ।

৩১. *মুসলিম শরীফ*, ৩য় খণ্ড; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ; জুন, ১৯৯১; হাদীস ২১৮৬ পৃঃ ৪০০ ।

৩২. *আহকামুল কুরআন*, ২য় খণ্ড; হযরত আবু বকর আহমদ ইবনে আলী আর-রাযী আল জাসসাস আল হানাফী; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ; ঢাকা ১৯৮৮; পৃঃ ৭০৬ ।

৩৩. *আহকামুল কুরআন*, ২য় খণ্ড; হযরত আবু বকর আহমদ ইবনে আলী আর-রাযী আল জাসসাস আল হানাফী; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ; ঢাকা ১৯৮৮; পৃঃ ৭০৬ ।

৩৪. *তাফসীরে ইবনে কাছীর*; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ; ১ম খণ্ড; মে ১৯৮৮; পৃঃ ৪৮৫ ।

৩৫. *আহকামুল কুরআন*, ১ম খণ্ড; হযরত আবু বকর আহমদ ইবনে আলী আর-রাযী আল জাসসাস আল হানাফী; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ; জুন ১৯৮৮; পৃঃ ৭৯৩ ।

৩৬. *মুসলিম শরীফ*, ৩য় খণ্ড, কিতাবুস সালত; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ; জুন ১৯৯১; হাদীস ১৬০৯; পৃঃ ৭১-৭২ ।

৩৭. *সহীহ আল-বুখারী*, পঞ্চম খণ্ড; কিতাবুত তালাক; মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়; নভেম্বর ১৯৯০; হাদীস ৪৮৮১;পৃষ্ঠাঃ ১১৬ ।

৩৮. *মুসলিম শরীফ*, পঞ্চম খণ্ড, কিতাবুত তালাক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, সেপ্টেম্বর ১৯৯২, হাদীস ৩৫৪২, পৃঃ ২২২-২২৩ ।

৩৯. *মুসলিম শরীফ*, পঞ্চম খণ্ড, কিতাবুত তালাক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, সেপ্টেম্বর ১৯৯২, হাদীস ৩৫৫৮, পৃঃ ২৪৪ ।

৪০. *মুসলিম শরীফ*, কিতাবুত তাওবা, অষ্টম খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৪ হাদীসঃ ৬৭৬৩ পৃঃ ২৯৪-২৯৮ ।

৪১. *সহীহ আল বুখারী*, চতুর্থ খণ্ড, কিতাবুল মাগাযী; মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়; মে ১৯৮৮; হাদীসঃ ৩৮২৯; পৃঃ ১২৬-১২৯ ।

৪২. *তফসীরে মাআ'রেফুল কোরআন*, ২য় খণ্ড; মূলঃ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী; অনুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ; ১ম সংস্করণ, অক্টোবর, ১৯৮০; পৃঃ ৪৫১ ।

৪৩. *তাফসীরে ইবনে কাছীর*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সেপ্টেম্বর ১৯৯১, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৮-৪৯ ।

৪৪. *তাফহীমুল কুরআন*, ২য় খণ্ড;পৃষ্ঠা ১৭৯ ।

www.pathagar.com

৪৫. *আহকামুল কুরআন*, হযরত আবু বকর আহমদ ইবনে আলী আর-রাযী আল জাসসাস আল হানাফী; ২য় খণ্ড; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ; নভেম্বর, ১৯৮৮; পৃঃ ৭০৮ ।

৪৬. *সহীহ আল-বুখারী*, তৃতীয় খণ্ড; কিতাবুল বাদউল খালক; মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়; এপ্রিল, ১৯৮২; হাদীসঃ ৩০৭২; পৃঃ ৩০৯ ।

৪৭. *মুসলিম শরীফ*, সপ্তম খণ্ড; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ; ডিসেম্বর, ১৯৯৩; হাদীস ৫৬৫৭; পৃঃ ২৫৬ ।

৪৮. *মুসলিম শরীফ*, সপ্তম খণ্ড; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ; ডিসেম্বর, ১৯৯৩; হাদীস ৫৩৭০; পৃঃ ১৪৫ ।

৪৯. *তফসীরে মাআ'রেফুল কোরআন*,·২য় খণ্ড; মূলঃ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী; অনুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ; ১ম সংস্করণ, অক্টোবর, ১৯৮০; পৃঃ ৪৪৯ এবং *তাফহীমুল কুরআন*, পৃঃ ১২৯ ।

৫০. *সহীহ আল-বুখারী*, ৫ম খণ্ড; কিতাবুন নিকাহ; মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়; ২য় প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৯০; হাদীস ৪৮১৮; পৃঃ ৮৪ ।

৫১. *মুসলিম শরীফ*, ৪র্থ খণ্ড; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ; জুন ১৯৯২; হাদীস ২৮১৭; পৃঃ ২৪৯-৫৪ ।

৫২. *রিয়াদুস সালেহীন*, ১ম খণ্ড; আবদুল মান্নান তালিব সম্পাদিত; বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার; জুন ১৯৮৫; হাদীস ২৭৬; পৃঃ ১৯৮ ।

৫৩. *আহকামুল কুরআন*, হযরত আবু বকর আহমদ ইবনে আলী আর-রাযী আল জাসসাস আল হানাফী; ২য় খণ্ড; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ; নভেম্বর, ১৯৮৮; পৃঃ ৭০৮ ।

৫৪. *সহীহ আল-বুখারী*; ৫ম খণ্ড; কিতাবুল আদাব; মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়; ২য় প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৯০; হাদীস ৫৬৪০; পৃঃ ৪৭৪ ।

৫৫. *তাফহীমুল কুরআন* পৃঃ ১৩০ ।

৫৬. Abu Sulayman, AbdulHamid A., *MARITAL DISCORD: Recapturing Human Dignity Through the Higher Objectives of Islamic Law*; New Revised Edition, The International Institute of Islamic Thought, London-Washington, New Revised Edition, 2008.

www.pathagar.com

কুরআনের আলোয় নারী